PROFESSOR MAX MÜLLER'S

HIBBERT LECTURES

THE ORIGIN AND GROWTH

OF

RELIGION

AS ILLUSTRATED BY

THE RELIGIONS OF INDIA.

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

RAJANIKANTA GUPTA.

Author of "History of the Great Sepoy War," "Studies in Indian History," &c., &c.

PUBLISHED BY

BEHRAMJI M. MALABARI.

CALCUTTA:

PRINTED BY G. C. BOSE & CO., BOSE PRESS,
33, BECHOO CHATTERJEE STREET.

188[illegible].
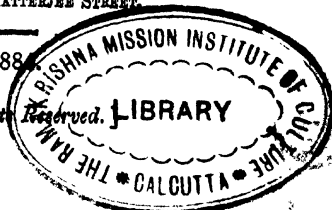
অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি।

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীবেহেরামজী মেহেরবানজী মলবারিকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানি দ্বারা ৩৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট,

বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১২৯০

To

THE MAHARANI SHURNOMOYE, C. I.,

KOSSIMBAZAR,

BENGAL.

MADAM,

I cannot offer this Bengali translation of Max Müller's Hibbert lectures to a worthier friend of literature than yourself. But for your generous contribution of Rs. 1,000 my tour through parts of Bengal, the North-West Provinces and Rajputana would have proved a costly failure.

It may appear not a little curious that over an extent of territory occupied by the wealthiest aristocracy in India and some of the foremost Hindu princes, an undertaking like this should have been reserved for the exclusive patronage of a widow lady. But to me this circumstance is of the happiest augury. It is another proof of your now proverbial liberality and devotion to the cause of advancement. So long as India is blessed with daughters like the Maharani Shurnomoye there is hope for female education and for general enlightenment, leading perhaps to a revival of the past, when the high and inspiring thoughts, now placed before us by the most facile interpreter between nations, were first thought out by your Indo-Aryan ancestors and mine.

Yours faithfully,

BEHRAMJI M. MALABARI.

BOMBAY,
February, 29, 1884.

মাননীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই,

মহোদয়াসু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি সাহিত্যের সুপরিচিত বন্ধু। ভট্ট মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতার বাঙ্গালা অনুবাদ আপনা অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইতে পারে না। আপনি উদারতাগুণে হাজার টাকা দান না করিলে, আমার বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় বহুব্যয়-সাধ্য পরিভ্রমণের কোন ফল হইত না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারতবর্ষের প্রধান হিন্দুরাজগণ ও ধনকুবেরগণের বাসভূমির ন্যায় বিস্তৃত স্থানে একটী বিধবা রমণীর একমাত্র অনুগ্রহ, এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ের অবলম্বস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহা পরম মঙ্গলের পূর্ব্ব-সূচনা বলিয়া মনে করি। উন্নতির উদ্দেশে আপনার সর্ব্বজন-বিদিত আগ্রহ ও হিতৈষিতার ইহা অন্যতম পরিচয়। জননী ভারতভূমি যত দিন মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় দুহিতা পাইয়া আনন্দিত থাকিবেন, তত দিন স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ উন্নতির সম্পূর্ণ আশা আছে। আশা আছে, হয় ত সেই উন্নতিতে ভারতবাসী আপনাদের অতীত ইতিহাসের মর্য্যাদা বুঝিবে এবং ইহাও আশা আছে যে, বহুভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর আমাদের সম্মুখে আপনার ও আমার আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের যে গভীর চিন্তাপ্রসূত ভাব উপস্থিত করিতেছেন, ভারতবাসী তাহা জানিয়া, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞান-গরিমা উপলব্ধি করিবে।

বোম্বাই।
২৯এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪।

বশংবদ
শ্রীবেহেরামজী মেহেরবানজী মলবারী।

NOTICE.

I AM much obliged to Babu Rajanikanta Gupta for his patience and diligence in the preparation of this Bengali translation. My best thanks are also due to Dr. Rajendralala Mitra for revision of proofs often in the midst of other engagements and even when indisposed.

B. M. MALABARI.

BOMBAY.

ভূমিকা।

প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি আমার রচিত কয়েকখানি ইংরেজী কবিতা-পুস্তক আমার শুভানুধ্যায়িনী লণ্ডনস্থ কুমারী ম্যানিঙের দ্বারা তথাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দি। সকলেই প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক মোক্ষমূলরও একজন। তিনি এই বলিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখেন যে,"আমরা ইংরেজী কবিতাই লিখি—আর গদ্যই লিখি, ভারতের ও জর্ম্মনীর ভাবগুলি যাহাতে ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি, তাহাতে বিস্মৃত থাকা উচিত নহে।" গুরুর উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ ছিল। যাঁহাদিগের নিকট আমি পুস্তক পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্লাড্ষ্টোনের প্রবন্ধ, সাফ্টস্বেরীর বক্তৃতা এবং মোক্ষমূলরের হিবার্ট লেক্চার আমার নিকট পাঠায়াছিলেন। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি আমার অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিয়াছে। এই পুস্তকের প্রশংসা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, ইহা অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে, শেষে পাঠ করিয়া তত্তোঽধিক উৎকৃষ্ট বোধ হইল। মোক্ষমূলরের অনেক কথা আমার হৃদয়ে লাগিয়াছে। মহাযশা আর্য্যগণসম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত অনুমিতি। তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সংস্কৃত ভাষার প্রতি উদ্দীপনা-পূর্ণ উক্তিতে এবং আর্য্য জাতির ভাষা ও ক্ষমতায় তাঁহার প্রশংসার উচ্ছ্বাসে আমার মন একান্ত আকৃষ্ট করিয়া তুলিযাছে। মোক্ষমূলর যেরূপ গভীর বিষয়ের তত্ত্বানুরত, সাহিত্য-জগতে সেরূপ বিষয়ে আর অল্প লোকই গৌরব করিতে পারেন। ফলতঃ তিনি একটী প্রধান ও অতি দুরূহ বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আমরা জানি, অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন; এ ভারত-খণ্ডেও অল্প নাই। ইউরোপ-ক্ষেত্রে কয় জন আছেন কিরূপে বলিব?—আর কেইবা তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ করিবে? এমন কি তাঁহাদের পারদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা যে কতদূর, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। আমরা জ্ঞানধনের উপাসনা করিতে সচরাচর ঐশ্ব-

রিক জ্যোতি টুকু হারাইয়া বসি। মোক্ষমূলরের জ্ঞান, সুশিক্ষা-প্রভাবে যত না আলোকিত হইয়াছে, সেই পবিত্র জ্যোতিতে উহা ততোঽধিক উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতগণ জ্ঞানরাজ্যে ক্রয়ের ব্যাপারী; কিন্তু ভট্ট মোক্ষমূলর অবিশ্রান্ত দাতা, এবং ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই কেবল কিছু বুঝিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, উহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার তাঁহার যেমন প্রবৃত্তি, তেমনই ক্ষমতা আছে। এই সদ্‌গুণ তাঁহার প্রতিভার শিরশোভা স্বরূপ। উহাতে মানবাতীত এমন কিছু সুখ অবশ্যই থাকিবে, যদ্দ্বারা তিনি এই সমস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন যে, অদৃশ্য ও সর্ব্বদর্শী বিশ্বাত্মার জ্ঞান মানবাত্মায় কিরূপে পাইল।

হিবার্ট বক্তৃতা পাঠ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তার তরঙ্গ আমার মনে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার আবেশে আমি গ্রন্থকারকে একখানি পত্র লিখি। পত্রখানির মর্ম্ম এই।—"আপনার যে বক্তৃতা ইউরোপের সর্ব্ব প্রদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় ছাত্রদলের মধ্যেও পঠিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি বিদেশী ভাষায় অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ আর্য্যবংশীয়গণের অপাঠ্য রহিবে?" ইহাতে তিনি এই স্নেহপূর্ণ উত্তর দেন—"যখন এই পুস্তক লিখি, তখন আমি আমার ওয়েষ্টমিনৃষ্টরের শ্রোতৃগণ অপেক্ষা আপনাদের দেশের বন্ধুবর্গের কথাই অধিক মনে করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, এগুলি সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়। ইহা পাঠে ভারতের উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমি আহ্লাদিত হইব''। আমি এ বিষয় কোন কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই এই ভার গ্রহণ করেন নাই। আমি আবার মোক্ষমূলরকে লিখি "এখন বরং সংস্কৃত অনুবাদ থাকুক, ইহার গুজরাটী অনুবাদ প্রথমে আরম্ভ করিলে কেমন হয়''? গ্রন্থকার আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুনরায় উৎসাহ-পূর্ণ পত্র লিখিয়া সাহস দিয়াছিলেন যে, আমি এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট এবং সাধারণে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। তাঁহার এত অনুগ্রহ যে, এই অনুবাদিত গ্রন্থের স্বত্বও আমাকে দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া আমি যে ব্যয়েই হউক, উল্লিখিত গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কেবল গুজরাটী কেন, যেমন করিয়া পারি, ইহার সংস্কৃত অনুবাদও

অবশ্য করিব। অতঃপর আমার এরূপ ইচ্ছাও আছে যে, ক্রমে ইহার মরহাট্টি, বাঙ্গালা, হিন্দি, এবং তামিল ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করি।

পাঠকগণের নিকট যদি অনুবাদের ভাষা কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দেখা উচিত যে, যে গুরুতর বিষয় লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজ ভাষায় হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যখন গুজরাটী ভাষায় উপযুক্ত শব্দের অভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ভাব সম্বন্ধেও ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ফলতঃ এই কঠিন বিষয়টীকে সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে আমাকে প্রায় বর্ষকালব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে এক একটী পৃষ্ঠার জন্য সপ্তাহ-কাল লাগিয়াছে। আবার এমনও হইয়াছে যে, এক একটী শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ না পাইয়া ভাষাবিদ্‌গণের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ফলতঃ মোক্ষমূলর ভট্টের গ্রন্থের ভাব সাধারণের জন্য ব্যক্ত করিতে আমাদের শরীরের রক্তকে জল করিতে হইয়াছে।

আমাদের গুণগ্রাহী তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন "রাস্ত গোফ্‌তর"-সম্পাদকের মতে মোক্ষমূলর একজন "ভবিষ্যৎ বক্তা"। যথার্থই যেন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাদের সমস্ত জীবনের গভীর রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার বাক্য ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ লোকের বাক্যের ন্যায় বোধ হয়। সমালোচক বিশেষেই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন যে, ইহার মূলদেশে কি প্রকার সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি যে, কোন কোন চিন্তাশীল তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহেন। তথাপি কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, তাঁহার ভাব-ব্যক্তির ক্ষমতা অসাধারণ এবং অমানুষিক। তাঁহার মীমাংসিত সুন্দর মতগুলি আর্য্য ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই মূলগ্রন্থের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে বলিতে গেলে গ্রন্থকারের প্রতিভা যেন সূর্য্যের তুল্য দীপ্ত। তাহার সহিত অনুবাদকের প্রতিভা তুলনা করিতে গেলে ক্ষীণালোক বর্ত্তিকার তুল্য বোধ হইবে। ভাব ব্যক্ত করিবার সময় গ্রন্থকারের চিন্তার প্রবাহ যেন সাগরের তুল্য, আর অনুবাদকের সঙ্কীর্ণ কূপ-তুল্য। মোক্ষমূলরের অসাধারণ ভাব এবং ভাষা গুজরাটীতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা পাওয়া, আর সুবিস্তৃত সাগরকে অপ্রশস্ত খালে পরিণত করা

একই কথা। ফলতঃ আমার মনোগত ভাব বৃথা অহঙ্কার বলিয়া গণ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেরূপ অনুবাদ করা হইল, তাহা সাধারণের পক্ষে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ না হয়, তবে নিশ্চই জানিব যে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমি যে অসংসাহসিক কার্য্য করিয়াছি, ইহা তাহারই শাস্তি। আমার এই অসাধারণ গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা, ঠিক যেন পণ্ডিতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বালকের মুখদ্বারা নির্গত করার ন্যায়।

যাহাই হউক, আমি মনে মনে এই ভাবিয়া রাখিয়াছি যে, আমার যেন সত্য সত্যই এই গ্রন্থানুবাদের সামর্থ্য আছে। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ এবং ইহার পরে ক্রমে ক্রমে যে 'সংস্কৃত, মারহাট্টি, হিন্দি, তামিল গ্রন্থ বাহির হইবে আমার মনে তাহা যেন "সমর্পণ'' তুল্য। সংসারের সকলেরই কিছু না কিছু উচ্চাভিলাষ আছে—ইহাই আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ। সংসার-যন্ত্রণার মধ্যে যদি কোন আর্য্যভ্রাতার মনে ইহা পাঠে শান্তির উদয় হয়, যদি কাহারও মনে ইহাতে প্রাচীন আর্য্য-গরিমার কথা আনিয়া দেয়, যদি ইহা পাঠে কোন আর্য্য আত্মচিন্তায় প্রবর্ত্তিত হন, বা পরমানন্দলাভ কি পরমাত্মা ধারণ করিবার উদ্যোগও করেন, আর আর্য্য-জর্ম্মন মোক্ষমূলর মুনি, যিনি সমস্ত জীবন মানব-ইতিহাসের দুইটী প্রধান বিষয়, —"আর্য্য বিশ্বাস' এবং "আর্য্য ভাষা" লইয়া কাটাইয়াছেন, ইহা পাঠে যদি আমাব দেশীয়গণ তাঁহার আন্তরিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে জানিতে সমর্থ হন, তাহাহইলেই আমি সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিব যে, আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও সম্পূর্ণ হইল।

বোম্বাই, ৩১এ ডিসেম্বর, ১৮৮১ } শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কি? কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সেই আলোচিত বিষয়টী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই, সুতরাং এখানে যখন ধর্ম্মের বিষয় আলোচিত হইতে চলিল, তখন "ধর্ম্ম" কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বলা উচিত।

ধর্ম্মশব্দটীকে ব্যুৎপত্তি অনুসারে নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহাই বুঝা যায়, "যাহা অপরকে ধারণ করে, রক্ষা করে, বা পতন হইতে রক্ষা করে"। ধর্ম্মকে ইংরেজীতে "রিলিজিয়ন" (Religion) বলে। এই 'রিলিজিয়ন' শব্দ লাতিন ভাষার "রিলিজিও" (Religeo) শব্দ হইতে প্রসূত।—লাতিনের 'রিলিজিয়র (Religere) প্রকৃত অর্থ বন্ধন, সংস্থান, চিন্তা, এবং ধ্যান প্রভৃতি। ধর্ম্মের এই কয়েকটীই প্রধান অর্থ। কিন্তু আজি কালি এই শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাব সহিত ঐ রূপ অর্থ খাটাইতে গেলে কালানৌচিত্য দোষ ঘটে। কোন শব্দেরই ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থ চির দিন একভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কেন না মানবগণের স্বাভাবিক উন্নতি, বৃদ্ধি এবং অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও অর্থ ও ভাবমূলক উন্নতি, বৃদ্ধি ও অবনতি ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মশব্দ সর্ব্বপ্রথমে "যাহা ধাবণ করে," এবং পবে "যাহা রক্ষা করে" এইরূপ বুঝাইত, ইহাদেব মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। কিন্তু আধুনিক, Religion এবং Religere শব্দেব, "চিন্তা, জপ, বা ভাবা ও বিশ্বাস প্রভৃতি অর্থের সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। অথচ, ইহারা সকলে এক মানসিক উদ্ভবনী শক্তির বিভিন্ন প্রবাহ। "চিন্তা করা" এই শব্দটি যেন প্রথমতঃ একটী সূক্ষ্ম স্রোতের ন্যায় এক কোণে বহিয়া যাইতেছিল, পরে 'ভাবনায়' পরিণত হইয়া উহা বর্দ্ধিতকলেবর প্রবহমান নদীর আকার ধাবণ করিল। তাহার পর "'জ্ঞান ও "বিশ্বাসে" মিলিত হইয়া উহার আকার অধিকতর বিস্তৃত ও স্রোত অধিক খরতব হইল। এইরূপ উন্নতি সহকাবে উহা অবশেষে সাগর এবং মহাসাগররূপে পরিণত হইয়া গেল। কিন্তু এখন যদি এই প্রবল মহাসাগবেব উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাহইলে আমাদের, সেই কোণ-বাহি ক্ষুদ্র স্রোতের কথা স্মরণ হইবে। পণ্ডিতগণ এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম "প্রসারণ" বা "প্রকাশন" রাখিয়াছেন।

গ্রন্থকার ইহাকে "পরিণামবাদ" নামে অভিহিত করেন, কেননা এই শব্দটী বহু অর্থ জ্ঞাপক। ধর্ম্ম শব্দের আদিম বা ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা করা উচিত যে, এখন এই শব্দটী কি ভাব প্রকাশ করিতেছে। যদিও এই শব্দটি একই ভাবে গ্রহণ করা সকল লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য এক প্রকার সাধিত হইবে। ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, "ধর্ম্ম" বলিলেই বিশ্বাস, পূজা, সুনীতি, আনন্দপ্রদর্শন, আশা বা ভীতি, অজ্ঞেয়কে পাইবার জন্য জ্ঞান-পিপাসার অনুভূতি প্রভৃতি কতগুলি অবস্থাকে বুঝায়। অথচ এই সকল শব্দ যে পরস্পর এক প্রকার তাহাও নহে। এমন কতগুলি জাতি আছে যে, ধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের কোন শব্দ নাই। অথচ তাহারা সেই অজ্ঞেয়ের পূজা করিয়া থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কাহারও বিষয়ে চিন্তা করা পণ্ডশ্রম ও নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই পণ্ডিত নারীর পূজা করিতেন। তিনি মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবকে পূজার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর তুল্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কথার কথা মাত্র। তাঁহার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়াও আমরা বলিতে পারি না যে, তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার নিশ্চয়ই একটি ধর্ম্ম ছিল। যদি তাঁহার ধর্ম্মই না থাকিবে, তবে নারীর পূজাকে কি বলা যাইবে? ব্রাহ্মণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাই বলিয়া কি বৌদ্ধের ধর্ম্ম নাই? যথার্থ কথা বলিতে কি, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও বোধ হয় এমন লোক পাওয়া যায় না, যাহার কোন না কোন ধর্ম্মই নাই। সকল শাস্ত্রদর্শী মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অনন্ত শক্তির ধ্যান করিয়া ধর্ম্ম অভ্যাস করিতেছেন, সেইরূপ বানরতুল্য নিরক্ষর এক হীনবুদ্ধি ব্যক্তির উপল-খণ্ড পূজার নামও ধর্ম্ম।

জর্ম্মণ দার্শনিক কাণ্ট বলেন যে, ধর্ম্মের অর্থ সুনীতি। যাহারা কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মানে, তাহারাই ধর্ম্মে বিশ্বাসী। (অনেক পারশী সংস্কারকদের এ সম্বন্ধে এই মত)।

ফিস্‌তে নামা অন্য এক জন পণ্ডিত বলেন, পার্থিব ব্যাপারে ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। পবিত্র নীতিই এ বিষয়ে প্রশস্ত। অজ্ঞান এবং দূষিত ব্যক্তিদেরই কেবল ধর্ম্মের আবশ্যকতা হইতে পারে। (বৈষ্ণবেরা এ কথা ভাল বলিবেন না)। ফিস্‌তে আরও বলেন, ধর্ম্মের অর্থ জ্ঞান (বৈদান্তিকগণ! তোমরা আনন্দিত হও)। যাহা হউক, এই দুই পণ্ডিতের এইরূপ পরস্পর বিভিন্ন মত। এখন কাহার মত সত্য? কাণ্টের না ফিস্‌তের? গ্রন্থকার বলেন যে, উভয়ের মতই সত্য এবং উভয়ের মতই মিথ্যা। যদি উভয়েই বলিতেন, যিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, তবেই ভাল হইত। ধর্ম্মের অর্থ সুনীতি, আর যে নীতি ঈশ্বরের আদিষ্ট তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই ঠিক, এবং তাহাই হওয়াও উচিত। কিন্তু তাহা যে, ইহার কিছুই নহে, ইহা মনে রাখা উচিত।

স্লারমশর নামা আর এক জন প্রসিদ্ধ লোক বলেন, ধর্ম্ম বলিলে সম্পূর্ণ অধীনতা বুঝায়। ফিউএরবাক্ নামা জর্ম্মনীর আর এক পণ্ডিত বলেন, ধর্ম্ম শব্দে শুদ্ধ অধীনতা বুঝায় না। ইহাতে অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে লোভও বুঝায়। অর্থাৎ যে দেবতায় বিশ্বাস করে, সে তাহাতে দেহ ও মন সমর্পণ করিয়া একবারে অধীন হইয়া পড়ে, অবশেষে কোন স্বার্থের জন্য পূজা ও যাগ যজ্ঞ করে। পূজা শেষ হইলে দেবতার নিকট ভিক্ষা বা বর চাহিয়া থাকে। আপনার স্বার্থ-সিদ্ধিই উপাসনার উদ্দেশ্য। ফলেও তাহাই।

হেজেল নামা আর এক জন সুপ্রসিদ্ধ লোক কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন যে, "স্লারমশর যে বলেন ধর্ম্ম বলিলেই পরাধীনতা বুঝায়, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে কুকুর অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ আর কেহই হইতে পারে না। মনুষ্য যেমন দেবের অধীন, কুকুরও তেমনি তাহার প্রভুর বাধ্য ও অধীন। তাহার পর হেজেল বলেন যে, না তাহা নয়, ধর্ম্মের অর্থ—পরাধীনতা কখন হইতে পারে না, বরং ইহার অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে। এই দুই জনের কি আশ্চর্য্য মত-ভেদ। তথাচ উভয়ের কথাই ঠিক।

ফিউএরবাক্ এবং কাণ্ট উভয়েই বলেন যে, মানব-প্রকৃতির অতীত বিষয় মানবে ধারণা করিতে অসমর্থ। তবেই ধর্ম্ম অর্থে—লোক বিশেষের নহে, সমগ্র মানব জাতির পূজা—এই দুই বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে মনুষ্যত্ব-সমষ্টিই

পূজক ও পরমেশ্বর। ফিউএরবাক্ আরও বলেন যে, আত্মপ্রেম ছাড়া ধর্ম্ম হইতে পারে না, এ কথাও ঠিক।

হরডার বলেন, মনের প্রকৃতির সৎ শিক্ষার প্রথম বিকাশ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাহিনী এবং পুরাণে দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ফিউএর বাক্ বলেন যে, ধর্ম্ম প্রথমে রোগ বিশেষ বলিয়া গণ্য ছিল। মানবের পীড়িত হৃদয়ই তাহার ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ। কেবল পীড়া নহে, তাহার সমস্ত আপদ বিপদই ধর্ম্ম-বিকাশের কারণ। হিরাক্লিতাসও কহেন যে, ধর্ম্ম বাস্তবিকই রোগ, কিন্তু ইহা পবিত্র বা ঐশ্বরিক পীড়া।

সিলার বলেন যে, তিনি মূলেই কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। কেননা তাঁহার ধর্ম্মের জন্যই কোন ধর্ম্ম নাই। ইহার অর্থ এই যে, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম জানেন, প্রচলিত ধর্ম্ম স্বীকারে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। এ কথাও ঠিক।

একজন বলেন, মানব হৃদয়ের গুহ্য উপাসনাই ধর্ম্ম। একথায় আর এক জন জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম্মকাণ্ড-বিবর্জ্জিত এরূপ উপাসনায় কি প্রয়োজন? তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, হৃদয়ের গুহ্য উপাসনাই বল, আর কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি কুসংস্কারই বল, কিছুই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে।

এখন দেখা যাইতেছে ধর্ম্ম কি, মীমাংসা হইল না, অথচ ইহা বুঝাইবার জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ফলতঃ কথা এই, ধর্ম্ম কি, ইহার মীমাংসা সহজ নহে, বা এক কথায় ইহা বুঝাইতে পারা যায় না। ধর্ম্মের অর্থ "সকলই," অথবা ধর্ম্মের অর্থ "কিছুই নয়"। পাঠক বলিবেন, তবে এসম্বন্ধে এত বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? যাহা বলা হইল, তাহা এ বিষয়ের বাদানুবাদ নহে, এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত উদ্ধৃত করা গিয়াছে মাত্র। উহাতে ধর্ম্ম কি? অনেকটা বুঝাও যাইতে পারে। ধর্ম্ম কি, এ প্রশ্নটী বাস্তবিকই বড় কঠিন। আমাদিগকে এইটী বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকারের নির্দ্দিষ্ট অন্তর ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস কি? অন্তর ধর্ম্মে ইহাই বুঝায় যে, সকল মনুষ্যেরই অন্তরে এমন একটী তেজ আছে যে, যদ্দ্বারা তাহারা অসীমের ধারণা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম কি? ইহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় ইহা হইতে অধিকতর সহজ, বোধগম্য ও উৎকৃষ্ট সূত্র নাই।

এখন এই তেজ এবং ইহার অর্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই অনুভূত হইবে যে, ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি কিরূপে সূচিত হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর জ্ঞানী লোকেরাই ইহা স্বীকার করিবেন যে, মানবের বুদ্ধি ও বিবেক আছে এবং এই দুই বৃত্তি আপনাপনি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাও সকলকে স্বীকার কবিতে হইবে যে, ঐ বুদ্ধি স্বাভাবিক (উহা আমাদের সঙ্গে জাত হয়) এবং উহার প্রসারণই বিবেক। সুতরাং বিবেকের কার্য্য জ্ঞানের ক্রিয়াফল হেতু সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ দর্শন এবং শ্রবণে আমাদের মনে যে রেখাপাত হয়, তদ্দ্বারা আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, বুঝিতে পারি। এই রেখাপাতের নাম অনুভূতি, এবং উহার কার্য্যফলের নাম ধারণা।

কিন্তু ইহা ত হইল সীমাবিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে। অসীমের ধারণা কিরূপ হইতে পারে? গ্রন্থকার বলেন, এই তৃতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহোপযোগী একটী তৃতীয় উপকরণ আছে। এই তৃতীয় উপকরণের নাম "বিশ্বাস"। ইহার কার্য্যফল অসীমের ধারণা। এই ক্রিয়া-ফলটী অতিসুন্দর। প্রথমতঃ বুদ্ধি দ্বারা সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমারা জানিতে পারি। তাহার পর বিবেক দ্বারা উহার ধারণা জন্মে। এই দুইটী ক্রিয়ার পর জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে বিশ্বাসের উদয় হয় এবং তাহাতেই আমরা সীমাবিশিষ্ট হইতে অসীমের ধারণা করিতে শিখি। ১ম বুদ্ধি, ২য় বিবেক, ৩য় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস, বুদ্ধি ও বিবেকের অতিপ্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"বিশ্বাস" কি অসাধারণ রহস্য? আর এই রহস্য কিরূপেই বা মানবের অনুভূত হয়? গ্রন্থকার বলেন "এ একটী রহস্য বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই অসাধারণ নহে। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। পার্থিব সকলই রহস্যময়। বুদ্ধি ও বিবেকের রহস্য কি কম? আমরা শ্রবণ ও দর্শন করি, কিরূপে ইহা হয়? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা হয়? কি আশ্চর্য্য রহস্য! রহস্যের উপর রহস্য এই, এই প্রক্রিয়া কি কৌশলে চলিতেছে? চিন্তা করিতে কাহারই বা বিরাম আছে? ইহা প্রতিদিন আমাদের চক্ষু কর্ণের উপর ঘটিতেছে। ইহাতে কি নূতনত্ব আছে, বল। সকলই স্বাভাবিক, সুতরাং আমরা এইরূপ জ্ঞানে বাধ্য হইয়া সন্তুষ্ট। যখন অবস্থাই এই, তখন

২

বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কি প্রয়োজন? বিশ্বাস বলিবারই বা কি প্রয়োজন? উহা ত বুদ্ধি ও বিবেকের প্রসারণ ব্যতীত আর কিছু নহে। অনেক বিজ্ঞ লোকে বিবেককে বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করেন। আবার তাঁহারা ইহাতে বলিয়া থাকেন যে, বিবেক অননুভূত। যদি আমরা বিবেককে সাধারণভাবে ব্যবহার করি, তাহাহইলে বুদ্ধির সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাকে যদি আর কোনরূপে ব্যবহার করা যায়, তবে তাহা হয় না। বিশ্বাস সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, অন্তবান্ কাহাকে বলে এবং অনন্তই বা কি? যাহা বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা জানিতে ও অনুভব করিতে পারা যায় তাহাই—"অন্তবান"। সুতরাং ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, "অনন্ত" সীমা ও শেষ শূন্য—ইহা কেবল শেষ সীমার অতীত। এই প্রয়োজনীয় বৈলক্ষণ্য মনে রাখা কর্ত্তব্য। পারিভাষিক শব্দার্থে প্রবিষ্ট না হইলে এই সকল জটিল বিষয় ধারণা করা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, অথবা তাহার প্রয়োজনও নাই, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই, যে, আমাদের বুদ্ধি ও বিবেক আপনাপন কর্ম্ম করিয়া থাকে; এই দুই বৃত্তির সহায়তায় মানবগণ আপন উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। সুতরাং এই দুই বৃত্তির জন্য তাঁহাদের "বিশ্বাসের" ও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। আর ইহাও সম্ভব নহে যে, বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারাই কেবল মানব "বিশ্বাস" লাভ করিতে পারে—এই তর্কের প্রতিবাদে গ্রন্থকার বলেন,—তোমাদের কথাই স্বীকার করিয়া এই প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, যদি বুদ্ধি ও বিবেক প্রভৃতি আপন আপন কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে বিশ্বাস কেবল উহার সম্ভাব্য ফল নহে; বিশ্বাস এ অবস্থায় আমাদিগের নিকট অনিবার্য্য হইয়া দাড়ায়। যদি আমাদের বুদ্ধি বিবেক থাকে, তবে আমাদের বিশ্বাসও অবশ্যই থাকিবে। আমরা বিশ্বাসের হাত ছাড়াইতে পারিব না। যদি "বিশ্বাসের" প্রমাণ জন্য কিছু থাকে, তবে তাহাই বুদ্ধি। এই বুদ্ধির অস্তিত্ব উভয় দলের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেখানে বুদ্ধি সেখানে বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি প্রথমটীর ফল। এই বিশ্বাসের মূল অন্বেষণ করিবার জন্য কোন অভিনব বৃত্তি বা গূঢ় কারণের প্রয়োজন

দেখা যায় না। অথবা এস্থলে কোনরূপ প্রকটীকরণেরও প্রয়োজন নাই। যখন বুদ্ধি গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন বিশ্বাসও কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্ব-বলে অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে।

গ্রন্থকার বলেন যে, ধর্ম্মের জন্য লোকের কোন স্বতন্ত্র বা বিশেষ একটী প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান নাই। ঈশ্বরও কোন নবনির্ম্মিত ধর্ম্ম কোন জাতি কি ব্যক্তিবিশেষের জন্য দেন নাই। "ধর্ম্ম" শুদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের ফল মাত্র। এই বৃত্তি বা জ্ঞান আমাদিগকে কি শিখাইয়া থাকে? শিখাইয়া থাকে—"অন্তবান্"। এই "অন্তবান" বুদ্ধি এবং বিবেকে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। উহা অন্তবানের অতীত অনন্তকে জানিতেও আমা-দিগকে শিখায়, ইহারই নাম ধর্ম্ম, এবং ইহাই ধর্ম্মভাবোৎপত্তির মূল।

যাহা আমরা দেখি এবং শুনি, তাহা সকলই কি কেবল অন্তবান্? না, আমরা চক্ষু কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা দেখি বটে; কিন্তু ঐ অন্তবানের অতীত অনন্ত অবশ্যই আছে। প্রত্যেক বিন্দুর অতীত আর এক বিন্দু থাকিবেই, ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। যথার্থই শেষ বা অন্ত, এইরূপ একটী ভাব মনে উদয় হইলেই তৎক্ষণাৎ আর একটী ভাবও ঐ সঙ্গে উদিত হইবে যে, ঐ অন্তের অতীত অনন্ত বা অসীম কিছু থাকিবেই। তাহা না হইলে কিরূপে এ ভাব ও এ শব্দের উৎপত্তি হইল?

তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, মানব পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যদি অন্তবান্ পদার্থ জানিতে পারিল, তবে আর কি দিয়া "অনন্ত" জানিতে পারিবে?—এরূপ প্রশ্নে কি সার আছে? যখন মানব পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তবান্ জানিতে পারিল, তখন সেই জ্ঞান তাহাকে তৎক্ষণাৎ অনন্তের ধারণা আনিয়া দিবে। যে কোন পদার্থের অন্ত না দেখিতে পাইয়া মানব ভাবে, আমি উহা দেখিতে পারি না, তখন উহাই তাহার নিকট অনন্ত। পদার্থের অন্ত না দেখিতে পাইয়া যদিও আমরা উহার গণনা, তুলনা, পরিমাণ, বা কোন নামকরণ করিতে পারি না, তথাপি আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, উহা অনন্ত তুল্য কিছু হইবে। আমরা কেবল যে, অনন্ত বলিয়া কিছু জানিতে পারি, তাহা নহে, আমরা উহা অনুভবও করিয়া থাকি। আমাদের অনন্ত-বেষ্টিত চারি দিকে দৃষ্টি করিলে ওরূপ একটা ভাব মনে হয়। যথার্থ বলিতে হইলে

আমরা অদৃশ্যও দেখিয়া থাকি, ইহারই নামান্তর অনন্ত। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অদৃশ্য কিরূপে দেখা যাইবে? বাস্তবই অদৃশ্য দেখা যায়। অদৃশ্য দেখা যায়, একথা যদি সাধারণ-সম্মতির বিরুদ্ধ কথা হয়—তবে যে অদৃশ্য আসিয়া আমাদের চক্ষু কর্ণে আঘাত করে এবং উচ্চরবে বলি "এই আমি অদৃশ্য এখানে উপস্থিত''। ইহা চক্ষু, কর্ণ এবং দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ও অন্তবান্ ইত্যাদির ন্যায়। এইভাবে সকলেই অনন্তও দর্শন করিয়া থাকে।

অনন্ত সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট হইল না। মনে কর এক ব্যক্তি পর্ব্বতোপরি, কিংবা বিস্তৃত সমধরাতলে, অথবা সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত নীল আকাশ। এরূপ অবস্থায় তিনি কি এই গম্ভীর অনন্ত দৃশ্যে একবার,—আর বার পরক্ষণেই অন্তবান্ পদার্থ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না? তাঁহার অন্তরস্থ অনুজ্জ্বল রেখার ন্যায় অন্তবানের পশ্চাৎ দেশে যে বিশাল বিস্তৃতি অনন্তের স্থূলভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নাম বিপুল অনন্ত।

আমরা এখন অনন্তরূপে ক্ষুদ্র কি, তাহাই বলিব। অনন্ত যে কেবল অন্তবানের বাহিরে পাওয়া যায়, তাহা নহে। অন্তবানের অভ্যন্তরেও উহা প্রাপ্তব্য। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন সূক্ষ্ম কোন পদার্থ নাই, যাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে পারে না। আমরা কাল, সাদা ও আরও কতগুলি বর্ণ চিনি। এবং তন্মধ্যে এটা সাদা, ওটা কাল তাহাও চিনিতে পারি। কিন্তু কালোর কাল ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া কোথায় যাইয়া শেষে ধূসর হয়, এবং ঐ ধূসরের ধূসরতাই বা ক্রমে ক্ষয়িতহইয়া কোথায় যাইয়া পরিশেষে সাদা হয়, বল, কোন্ চক্ষে কোন্ যন্ত্রে এবং কোন উপায়ে এই ঘটনা দেখিতে পাওয়া-যায়। আদৌ এই সকল নানা সুরঞ্জিত বর্ণ ছিল না। প্রথমে মাত্র দুইটী ছিল। অবশেষ একে আর মিলিয়া এতগুলি হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় আমরা জানি যে, যদিও প্রাচীন মহাত্মারা নিয়ত আকাশ-পট দৃষ্টি করিতেন, তথাপি নীল (আকাশ) বর্ণের কথা বেদে, আবেস্তায়, বা মিশর-দেশীয়দের ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। এইখানেই প্রকাশন বা প্রসারণ সম্বন্ধীয় উপপত্তি গোচরীভূত হয়।

এখন আমাদের ইহা বলায় কোন বাধা নাই যে, অন্তবান্ অনন্ত ছাড়া হইতে পারে না। এই অনন্তের ধারণা করিতে যাইয়া আমরা মানব জাতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঐতিহাসিক প্রসারণের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

আমরা সচরাচর পণ্ডিতদিগকেও বলিতে শুনি যে, অন্তবান্ মন কদাপি অনন্তের ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং যাহা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রতিপাদিত, তাহাই বিশ্বাস করা ভাল। কিন্তু এরূপ মত এবং সংস্কারের জন্য আমরা আমাদের বুদ্ধির এবং আমাদের ধর্ম্মপুস্তকের প্রশংসা করিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে গবেষণার ন্যায় আর কোন্ বিষয় সুবিধাজনক হইতে পারে?

আমরা গবেষণাপরম্পরায় এরূপ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, এখানে মানবের ঐরূপ বিশ্বাস নিতান্ত আবশ্যক, যে বিশ্বাস জ্ঞানলব্ধ এবং যে জ্ঞান মানবের সঙ্গে জাত। যে তেজোবলে অন্তবানের অন্তর্বাহী এবং অতীত অনন্তকে জানিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসের অর্থ সেই তেজ।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্তবানের আগেই অনন্তের দর্শন পাইয়া থাকিবেন। পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, সূর্য্য, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ বা বজ্র প্রভৃতিতে তাঁহারা অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই অনন্তের কোন নাম রাখেন নাই। এই নাম দিবার পূর্ব্বে তাঁহারা উহাকে অবশ্যই বজ্রধর, বর্ষক, তড়িদানয়নকারী, জীবনদাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। তাহার পর যখন উহার সহিত আরও কিছু নিকট সম্বন্ধ বোধ করিয়াছিলেন, তখনই বোধ হয় বিধাতা, সম্রাট্, রক্ষাকর্ত্তা, রাজা, পিতা, প্রভু, কর্ত্তা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, এবং কারণের কারণ, প্রভৃতি নামে উহা বিশেষিত করিয়াছেন। এই রূপে তাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি প্রখর এবং বহুদর্শন ক্রমে প্রসারিত হইলে অবশেষে অনন্তকে তাঁহারা "অবিনাশী" "অজ্ঞাত" এবং "অজ্ঞেয়" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত নাম দিয়াছিলেন।

ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়?—এই বুঝিতে পারা যায় যে, মানব একযোগেই অনন্তকে জানিতে পারেন না, বুদ্ধি, বিবেক এবং বিশ্বাসের ক্রমিক বিকাশে তিনি উহা জানিতে পারেন। অনন্তকে জানিবার এই কয়ে-

কটী বৃত্তি হঠাৎ বা ক্রমে জাত হয় না। ইহা ক্রমিক এবং কালব্যাপি কর্ম্ম-ফল মাত্র। প্রকৃতিতে যেমন সকল দ্রব্যই জন্মিয়া ক্রমে বড় হয়, ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত এবং প্রসারিত হইয়াছে। ফলতঃ সকল জাতিরই ধর্ম্মোৎপত্তির মূল এক—ইহার নাম "অনন্ত জ্ঞানেচ্ছা।" কিন্তু ধর্ম্মভাবোৎপত্তির সম্বন্ধে নানা জাতির নানা মত দৃষ্ট হয়। আর্য্যজাতির ধর্ম্মোৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, গ্রন্থকার স্বয়ংই এ গ্রন্থে তাহা বিবৃত করিবেন। আমাদের যাহা জানিতে হইত, এইখানে তাহা জানিয়াছি যে, ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম সম্ভাব্য, ধর্ম্ম অনিবার্য্য। আরও জানিতে পারিয়াছি ধর্ম্ম একটী ভঙ্গশীল বীজে (অনন্তের ধারণা) অঙ্কুরিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্যাপি কাল ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, এখন এক পরম সুন্দর প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই সমুদয়কে আশাতীত বা দৈবায়ত্ত ঘটনা বলা যাইতে পারে না। যাহাহউক্ বেদ বা জুরথোস্তের সৃষ্টির পূর্ব্বে বা জগৎ-পরিচিত মোজেসের কালেরও আগে ঈশ্বর আর্য্য পিতৃপুরুষগণকে প্রস্তুতীকৃত ধর্ম্ম স্বয়ং উপহার দিয়াছিলেন, গ্রন্থকারের মতে ইহা কবিকল্পনাসুলভ অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এই কাব্যসুলভ অতিরঞ্জন অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। প্রয়োজন ব্যতীত কিছুই হয় না। সুতরাং এই অতিসুখপ্রদ অতিরঞ্জিত বর্ণনাকেও মন্দ বলা উচিত নহে। এই কবি-চিত্র মানবজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা না বলিয়া মানবজাতির শুদ্ধির উপায়ভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে কি না, ইহার উপর ইহজীবনের মুক্তির আশা স্থাপন করা উচিত কি না, অথবা জগতের ভ্রাতৃভাব ভগ্ন করিয়া প্রতিবেশীর প্রতিকূল ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে স্থাপন করা সুবিবেচিত হইবে কি না, এ সকল প্রশ্ন স্বতন্ত্র কথা। পাঠকগণ আপনাপন জ্ঞান ও বহুদর্শিতা-বলেই ইহার সমুচিত উত্তর বুঝিয়া লইবেন।

শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী।

মোক্ষমূলরের মতের সারাংশ।

গ্রন্থকার ভাষা এবং ধর্ম্মোৎপত্তিবিষয়ে অতি অসাধারণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মত বিশুদ্ধ কি সঙ্গত এ বিষয়ের বিচার-ভার পাঠকগণের হস্তে ন্যস্ত রহিল। কিন্তু তদীয় অনুমিতি যে অতীব প্রতিভা-পূর্ণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বৃক্ষজীবনের উৎপত্তি (যাহাকে আদি কারণ বলা যায়) ক্ষুদ্র বীজ হইতেই হইয়া থাকে। তাহার পরে এই বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব এবং ফল ফুলে সুশোভিত হয়। আমাদের বহুদর্শন-গুণে ইহা আমরা জানি। পদার্থবিদ্যানুশীলনে আমরা আর এই জানিতে পারি যে, ভৌতিক পদার্থ মাত্রই পরমাণু সংগঠিত। গ্রন্থকার বলেন যে, ভাষাও ঠিক এইরূপ ৪।৫ শত কি ততোঽধিক মূল ধাতুযোগে গঠিত। সুতরাং মানবে যাহা কিছু বলে—যাহা কিছু ভাবে, সকলই মুষ্টিমেয় কতিপয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুই সকল ভাষার মূল বা বীজস্বরূপ। এই সকল ধাতু মাত্রেরই যে পৃথক পৃথক ভাব আছে, তাহা নহে। ইহারা সাধারণতঃ এক শ্রেণীর বা এক বিষয়ের বহুভাব-বাচক। এই প্রাথমিক ভিত্তিমূলেই ভাষার গঠন বা সংস্থান হইয়াছে। গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করেন, ইংরেজী ভাষার (man) ম্যান ও সংস্কৃত মনুষ্য শব্দের উৎপত্তি মন বা মনু শব্দ হইতে হইয়াছে। মনুর অর্থ—চিন্তাকারী বা যে মনন করে। তিনি বলেন, মানবেই কেবল চিন্তা করিতে পারে। জন্তু চিন্তা করিতে পারে না। এইখানে ডারউইনের সহিত গ্রন্থকারের মতদ্বৈধ দেখা যায়। সদ্বিদ্বান্ ডারউইন বলেন, মানব নিকৃষ্ট জীবের প্রসারণ মাত্র। বানর মানবাকারে উন্নত হইয়াছে। মোক্ষমূলর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এখন এই চারি পাঁচ শত মূল ধাতুর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন যে, মানবের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও জন্ম হয়। সাধারণ জীবজন্তু অপেক্ষা মানব বহুতর প্রকৃতিদত্ত গুণ সহকারে জন্মিয়াছে। উহা ইহারই অন্যতম। মানবভাষার যতই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ততই মূল ধাতুগুলি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাষার প্রারম্ভ-কালেই কেবল তাহাদের প্রয়োজন ছিল।

আবার গ্রন্থকারের মতে ইহাও অসম্ভব বোধ হয় না যে, সকল দেশের

ভাষারই সাধারণ উৎপত্তিস্থান এক। কেননা ইহা দেখা যায় যে,আর্য্য তুরেণীয় ও সৈমিতিকগণের ভাষার মূলধাতু পরস্পর সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন। এই তিনটী জাতি হইতেই মানবজাতির বৃহৎ তিন শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। মনু (চিন্তাকারী) সর্ব্বপ্রথমে এই সকল মূল ধাতু ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা বলা দুষ্কর যে, কখন সংস্কৃত, জেন্দ, হিব্রু ও লাতিন ভাষার সৃষ্টি হয়, এবং উহারা ঐ সকল মূলধাতু যোগেই গঠিত কি না। প্রতীচ্য এবং পাশ্চাত্যগণের অনেকগুলি আধুনিক ভাষা এই কয়েকটি প্রধান ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ আদি ভাষা কয়েকটীর উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

ভাষা সম্বন্ধে যে মত, গ্রন্থকারের, ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ মত। ধর্ম্মেরও উৎপত্তি অতি ক্ষুদ্র একটী মূল হইতে হইয়াছে। ঐ মূলই—' মানবের সতেজ উদ্দীপনা'' । ইহারই বলেই মানব অনন্ত কি তাহা জানিতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

পাঠকগণের ইহা জানা উচিত যে, গ্রন্থকার, বলেন, জড়োপাসনা ধর্ম্মের প্রথম আকার বা আভাস নহে। এবিষয়ে তিনি অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন (তাঁহার গ্রন্থের ৫৩ হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা পাঠ কর)

গ্রন্থকার সংস্কৃতে তাঁহার নাম "মোক্ষমূলর ভট্ট" লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার মূল নাম "মাক্ষ মূলর" বলিয়া জানি। সংস্কৃত অনুসারে মোক্ষমূলর নাম (মক্ষমূলর) স্বাভাবিক এবং মনোমদ হইয়াছে এবং ইহাতে নাম-নির্ম্মাণতার প্রতিভাও বিকাশ পাইয়াছে। আমরা যদি "মক্ষমূলর" শব্দের ব্যাখ্যা করি, তবে এইরূপ হইবে যথা—"মক্ষ" অর্থ মুক্তি বা আত্মার স্বাধীনতা, আর,"মূলর" অর্থ অধিবাসী। গ্রন্থকার যেন ব্রহ্মানন্দ নামে দীক্ষিত হইয়াছেন।

শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী।

মোক্ষমূলরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সুপণ্ডিত মোক্ষমূলর ১৮২৩ খ্রীঃঅব্দে জর্ম্মণীর অন্তর্গত দেশান নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উলহেম্ মূলর। ইনি একজন সুবি-খ্যাত কবি ছিলেন। তাঁহার মাতৃকুলও সাতিশয় সম্ভ্রান্ত। মোক্ষমূলর বাল্যকাল হইতেই অতি শ্রমপটু এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। ১৮৪৩ খ্রীঃঅব্দে অর্থাৎ বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি লিপ্‌জিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডাক্তার অব্ ফিল-জফি" উপাধি পান। এইখানে তিনি হিব্রু, আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পর বৎসর, সিলিং এবং বপ্ নামক বিখ্যাত অধ্যাপকদ্বয়ের উপদেশ পাই-বার আশায় জর্ম্মণীর প্রধান নগর বর্লিনে গমন করেন। এই খানে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হাম্‌বল্‌ডট্ ও বিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মোক্ষমূলর বর্লিনে সুবিজ্ঞ রুক্কের সহিত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহার পর ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক উজিন্ বর্ণুফের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া মোক্ষমূলর ১৮৪৫ খ্রীঃঅব্দ পারী নগরে গমন করেন। বর্ণুফ্ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "ঋগ্বেদ সংহিতা" মুদ্রিত করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে তিনি ১৮৪৬ খ্রীঃঅব্দে ইংলণ্ডে আসিয়া ঋগ্বেদসংহিতা মুদ্রণের সমস্ত আয়োজন করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যয়ে উহা অক্‌স্‌ফোর্ড নগরে মুদ্রিত হইতে লাগিল। গ্রন্থের তত্ত্বাবধান জন্য মোক্ষমূলর নিজেও ঐ স্থানে থাকিলেন। ইংলণ্ড ব্যতীত এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের স্থান আর ছিল না। ধন্য ইংলণ্ড! তুমিই বিদ্যার যথার্থ প্রতিপোষক।

১৮৫৪ খ্রীঃঅব্দে মোক্ষমূলর অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউ-রোপীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃঅব্দে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার একটী নূতন শ্রেণী স্থাপিত হইল, তিনি উহার অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলেন।

মোক্ষমূলর ১৮৪০ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার সংস্কৃত ভাষার প্রথম অনুবাদ-গ্রন্থ হিতো-পদেশ মুদ্রিত করেন। পরে ১৮৪৩ অব্দে জর্ম্মন ভাষায় কালিদাসের মেঘদূত

অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে মূল সংস্কৃত ছন্দ জর্ম্মন ছন্দে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাতে যে, তাঁহার প্রতিভার কেবল যশোগৌরব ঘোষিত হইয়াছিল তাহা নহে, জর্ম্মন ও সংস্কৃত ভাষায় কত দূর সম্বন্ধ, তাহা এই উপলক্ষে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

১৮৬১ খৃঃঅব্দে মোক্ষমূলর "ভাষা-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ" নামে একখানি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই পুস্তকে নয়টী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত ছিল। তৎসঙ্গে আর দ্বাদশটী প্রবন্ধ যোগ হইলে গ্রন্থখানি পরিসমাপ্ত হয়। ১৮৬৪ অব্দে উহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ জর্ম্মন, ফরাসী, ইতালীয় ও রুষীয় প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহামতি মোক্ষমূলরের স্বরচিত এত গ্রন্থ আছে যে, এস্থলে তৎসমুদয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে না।

মোক্ষমূলর "ঋগ্বেদ সংহিতা" ছয় খণ্ড প্রচার করেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য বলিতে হইবে। এই ছয় খণ্ড পুস্তক ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুপণ্ডিত ডাক্তার মার্টিন হৌগ্ এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার পর ১৮৬২ অব্দে পুনার প্রায় ৭০০ ব্রাহ্মণ সভা করিয়া এই গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার সুখ্যাতি করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকট যে হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে, ইহা তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ। এমন কি তাঁহারা এই অভিনব গ্রন্থের সাহায্যে আপনাপন হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

এই ঋগ্বেদ সংহিতার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অল্পকাল মধ্যে দুই সহস্র পৃষ্ঠা পরিমিত আর একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখেন। ইহার নাম "চিপস্ ফ্রম জর্ম্মণ ওয়ার্ক্ সপ্"। সাধারণ পাঠকবর্গ এই অসাধারণ শ্রমের বিষয় ভাবিলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

মোক্ষমূলর এখন আর একটী প্রধান কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এখন প্রাচ্য পবিত্র গ্রন্থাবলী নামে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, পারসিক, চিন এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহার এক এক খণ্ড এক এক জন অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক

লিখিত হইলে, মোক্ষমূলর স্বয়ং সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ খণ্ডে ইহা পরিসমাপ্ত হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার কবির পুত্র। তিনি স্বয়ংও এক জন কবি। যদিও তিনি কোন স্বতন্ত্র কবিতা-গ্রন্থ লিখেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রতি গ্রন্থে সুধাময় কবিত্বের আভাস দেখা যায়। তিনি অতি গুরুতর বিষয় লইয়া গ্রন্থাদি লিখেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা যেমন, সুন্দর, তেমনি সরল ও কবিত্বময়। অন্যান্য লেখকদের ন্যায় সত্য বিনির্ণয় সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানাভাব, সুবিন্যস্ত ভাষায় কখনও প্রচ্ছন্ন রাখিতে তাঁহার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারের প্রকৃতি এমন সহিষ্ণু এবং সহানুভূতিপর যে, তিনি বৃথা বাদানুবাদ ভালবাসেন না। তিনি বলেন, যত নিকৃষ্ট ধর্ম্মই হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ সত্যের ভাব অবশ্য থাকিবে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি। কিন্তু যদি কখন তাঁহাকে কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখন তিনি যত বড় লোকই প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না কেন, কাহাকেও ভয় করেন না। অথবা কখন তাঁহাকে আক্রমণ-ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায় না।

ইউরোপ প্রদেশে যত পণ্ডিত-সমিতি আছে, মোক্ষমূলর তৎসমুদয়েরই একজন সদস্য। তিনি প্রুশিয়ার নাইট। তিনি ইংলণ্ডের প্রিয়তম পুত্র-রত্ন। তথাকার প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত দলের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইংলণ্ডের সুবিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্তগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে আপনাদিগকে সম্মানিত এবং সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। তিনি ইংলণ্ডে না জন্মিলেও এরূপ সুন্দর ইংরেজী লিখেন ও বলেন যে, তাহাতে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের আর বিস্ময়ের সীমা নাই। সহস্র সহস্র পণ্ডিত এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাঁহার স্তুতিগায়ক।

মোক্ষমূলরকে দার্শনিক বিজ্ঞানের নেতা বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না। এই নূতন মহোপকারক বৈজ্ঞানিক তর্কে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। ভাষা-বিজ্ঞানে এবং ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে তিনি যে, প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

তাঁহার "হিবার্ট বক্তৃতায়" (যাহার বিবরণ পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে) গভীর পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে। এই বক্তৃতা তিনি তাঁহার পরলোকগতা কন্যার নামে নিম্নলিখিত করুণরসোদ্দীপক কথায় উৎসর্গ করিয়াছেন :—

"যাঁহার স্নেহ-স্মৃতি আমাকে এই বক্তৃতা লিখনে উৎসাহিত, চালিত এবং আশ্রয়দান করিয়াছে, তাঁহারই নামে, পিতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ এই বক্তৃতা-নিচয় উৎসর্গীকৃত হইল"

শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী

সূচী।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার জন্য উপকরণ যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে।

স্পৃশ্য, ঈষৎ স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য পদার্থের আরাধনা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অসীমত্ব ও বিধির সম্বন্ধে ধারণা।

ইষ্টেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ।

দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহাহইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার জন্য উপকরণ যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে।

আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সৃষ্টির তিন চারি যুগ পরে ঐ সকল দেশে ধর্ম্মের যেরূপ প্রকৃতি ছিল, সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উহার ক্রমোৎকর্ষ কল্পনা করতঃ কোন সম্পূর্ণ গঠিত ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলে ধর্ম্মের সৃষ্টি, উৎপত্তি ও উন্নতি কিরূপে হয়, বুঝা যায় বটে, কিন্তু এরূপ চেষ্টার ফল সহজ-সিদ্ধ নহে। সুতরাং ঐ প্রণালীতে ধর্ম্মের উৎপত্তি জানিবার চেষ্টা না করিয়া, এমন কোন দেশের বিষয়ে ঐ চেষ্টা করা ভাল—যে দেশে ধর্ম্মের কেবল যে আদি, অন্ত ও ক্ষয় উপলব্ধি হয়, তাহা নহে। যেখানে অন্ততঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বস্তর কয়েকটীও দেখা যায়।

অসভ্য জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন করা যেরূপ কঠিন কার্য্য, উপস্থিত বিষয়ের অনুশীলন করাও যে সেইরূপ কঠিন, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং আমরা যে ক্ষেত্রে ব্রতী হইতেছি, তাহাতে শ্রম অগাধ হইলেও মূল্যবান ফল লাভের আশা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিলেও সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। পদে পদে বাধা বিঘ্ন। যেখানে কিছু কাযের কথা, সেই খানেই গোল, যেখানে আসিলে মূলদেশ পাইবার ভরসা জন্মে, সেই খানেই নৈরাশ্য। ইহা একপ্রকার অনিবার্য্য।

কোন ধর্ম্মই প্রারম্ভ-কালে এককালে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জন-সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। ঐ অভিনব ধর্ম্ম যতদিন কেবল

প্রবর্ত্তকের হৃদয়ে অথবা তদীয় ক্ষুদ্র শিষ্য-দলমধ্যে আবদ্ধ হইয়া, অতি সংকীর্ণ অবস্থায় থাকে, ততদিন কেহই তাহার মহিমা গ্রাহ্য করে না। একথা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম অপেক্ষা জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নামই ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। আর যাহা সমস্ত লোকের চেষ্টায় ও একতায় গঠিত এবং উন্নত, তাহাকেই জাতীয় ধর্ম্ম কহে। জাতীয় ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়া বাচ্য হইতে এবং তাহার বিধান সকল ধর্ম্মান্তর্গত ক্রিয়া কাণ্ড রূপে গৃহীত হইতে বহুকাল লাগে। ইহার সংজ্ঞা কি নাম কিছুই থাকে না। যখন কোন ধর্ম্ম সাধারণ্যে সংগত ও প্রয়োজনীয় বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হইতে থাকে, যখন ভবিষ্যতের জন্য সেই ধর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মে, এবং তাঁহারা যখন উহার উৎপত্তি এবং প্রথম প্রচারের বিবরণ, যাহা কিছু পারেন, লিখিয়া রাখিতে থাকেন, তখনই তাহাকে প্রকৃত পক্ষে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পারি। সুতরাং মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রায় সমস্তই কাল্পনিক গল্প পূর্ণ হইয়া উঠে। যাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলা গিয়া থাকে, উহা তাহা নহে।

য়িহুদী এবং পারসিক প্রভৃতির ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি।

নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সর্ব্বাদৌ জীবন্ত ভাব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গেলেও কোন কোন দেশে ধর্ম্মভাবের ক্রমোন্নতি দেখা যায়। আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে তাহাদের যে ধর্ম্ম কি, অবধারণ করা সুকঠিন। তাহা আদিম অবস্থায় অথবা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বা কেমন ছিল, তাহা এক প্রকার আমাদের ধারণার অতীত।

এইরূপ গ্রন্থভুক্ত ধর্ম্ম মাত্রেই ঠিক এইরূপ অবধারণ-কাঠিন্য লক্ষিত হইয়া থাকে। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি ও অবনতির লক্ষণ

দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রণিধান সহ পর্য্যালোচনা করিতে হয়। ঐ সকল লক্ষণ প্রচার না করিয়া বরং গোপনে রাখাই যেন প্রাচীন টেষ্টমেণ্ট-লেখকদিগের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া, বোধ হয়। তাঁহারা য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে এই ভাবে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন যে, তাহা আদি হইতেই সুগঠিত, সম্পূর্ণ, অভ্রান্ত এবং এত উন্নত যে, আর উন্নতি সম্ভব নহে। কেন না স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার প্রচার-কর্ত্তা। য়িহুদীগণ যে একেশ্বরবাদী হইবার পূর্ব্বে বহু দেবতার আরাধনা করিত, তাহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকেই হোমের দুইটী ধারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। একটী লেবিটিকসে আর একটী উদ্‌গাতার কথায়। এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী এবং বিসংবাদিত মত হইতে কি এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ চাই? বলির সম্বন্ধে লেখা আছে, "বলি আপনার প্রীতিকর নহে, নচেৎ তাহাই আমি অর্পণ করিতাম। আপনি হোমেও প্রীত নহেন, সন্তুষ্ট আত্মাই ঈশ্বরের প্রকৃত বলি। হে ঈশ্বর! আপনি সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হৃদয়কে ঘৃণা করিবেন না।"

ধর্ম্ম-পাঠকগণের নিকট ঈশ্বর-প্রচারিত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি অবধারণ করা যত কঠিনই বোধ হউক না কেন, এখানে উন্নতিই লক্ষিত হইতেছে।

মূসার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, জরথুস্ত-প্রণীত ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। ইহা স্বয়ং অসুরমসজদা কর্ত্তৃক প্রচারিত ও জরথুস্ত কর্ত্তৃক উদ্বোধিত এবং প্রথম হইতেই সুসম্পন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া কথিত। সুদক্ষ পণ্ডিতগণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-বলে কেবল গাথা হইতে কিছু পুরাতন সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত অবস্তাতেও প্রকৃত উন্নতির বিশেষ চিহ্ন অতি বিরল।

গ্রীস এবং ইতালির ধর্ম্ম ও পুরাণ আলোচনা করিলেও উহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের প্রভেদ নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া থাকে। হোমরের পরবর্ত্তী লেখকগণের গ্রন্থে এরূপ অনেক ভাব আছে যে, তাহা হোমরে লক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ সকল ভাব যে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, কি তাহা অন্যভাবের অনুসারী, একথা কখনই বলিতে পারা যায় না। কোন

প্রবাদ কোন একটী জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে, কোন দেবতা কোন একটী স্থানে প্রধান বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারেন, এই সকল বিষয় কোন আধুনিক কবির গ্রন্থে পাঠ করিয়া আমরা উহার আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত গ্রীক ও রোমকদিগের ধর্ম্মালোচনার সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা এই যে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম-পুস্তক বলিবার যোগ্য, কোন গ্রন্থ নাই।

ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি।

ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি জানিবার যেমন সুবিধা, তেমন সুবিধা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার মতে এতদ্দেশের ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি জানিবার সুবিধা যত অধিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস জানিবার সুবিধা তত নহে। যেহেতু প্রকৃত ইতিহাস শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা ভারতীয় সাহিত্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। কিরূপে ধর্ম্মচিন্তা এবং ধর্ম্মভাষার বিকাশ প্রাপ্তি হয়, কিরূপে উহা শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে, এবং কিরূপে উহা মুখ হইতে মুখান্তরে, মন হইতে মনান্তরে, গতির সঙ্গে সঙ্গে মূল উৎসের সহিত ঈষৎ সংস্রব রক্ষা করিয়া, ক্রমে আকার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনার গতি প্রসারিত করে, তাহা ভারতে অনুশীলন করিবার এবং জানিবার যেমন সুবিধা, আর কোথাও তেমন নহে।

ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি জানিবার সম্বন্ধে ভারত-ভাষা "সংস্কৃতের" প্রসাদে যেরূপ আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির অনুশীলনেও ভারতের ধর্ম্ম-সংহিতা সকল হইতেও যে সেইরূপ আনুকূল্য পাওয়া যায়, ইহা বলিলে বোধ হয় আমাকে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। সুতরাং ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আমি প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাচিত ও উদ্ধৃত করিয়াছি। জীবিতকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পাঠে এই উপপত্তি আমার মনে উদয় হইয়াছে।

আমার উপপত্তি এখন কেবল ঘটনার উপর অবস্থিত রহিয়াছে, এবং আমি উহার প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য দায়ী রহিয়াছি।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বেদের উপযুক্ত স্থান।

ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি যেরূপে হইয়াছে, আর সকল স্থানেও যে, সেইরূপ হইয়াছে ইহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। ভাষাতত্ত্বের গূঢ় প্রশ্নাবলির মীমাংসা করিতে হইলে, ভাষা-বিজ্ঞান-পাঠকের যে সংস্কৃত ভাষা সুন্দররূপে অধ্যয়ন করা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অপরাপর ভাষায় যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার উপায়গুলির সহিত উহাদিগের তুলনা করা অপেক্ষা আর কিছুই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বপ্ সাহেব যেরূপ মালয়, পোলিনেসীয় ও ককেশীয় প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃতের মূল অন্বেষণ করিয়াছেন, সেইরূপ করা, অথবা আর্য্য ভাষায় যে যে বৈয়াকরণিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কেবল তাহাই যে মানব-ভাষার অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনের এক মাত্র উপায়, তাহা মনে করা বিষম ভ্রম।

মানব জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে যাইয়া, যাহাতে আমাদিগকে ঐরূপ ভ্রম-প্রমাদে পতিত না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। প্রাচীন ভারতবাসিগণ কিরূপে ধর্ম্মভাব সকল লাভ করেন, কিরূপে তাহা উন্নত ও সম্প্রসারিত করিয়া তুলেন, কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও শেষে কলুষিত করেন, তাহা আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। অপরাপর জাতির ধর্ম্মভাব সকলও যে এইরূপ প্রারম্ভ হইতে এইরূপ নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। তাহা বলিয়া, যাঁহারা আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিগণের মধ্যে জড়োপাসনা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অসভ্য জাতি মাত্রেই ঐ জড়োপাসনা হইতে ধর্ম্ম চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের ন্যায় আমি ভ্রমে পতিত হইব না।

এইক্ষণে দেখা যাউক যে, ভারতের আদিম উপনিবেশিদিগের মধ্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে যে যে লিখিত প্রমাণ আবশ্যক, তাহা কি কি?

সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কার অনেকের পক্ষে ইতিহাস না হইয়া উপকথা বলিয়া প্রতীত হইবে। বহুকাল পর্য্যন্ত যে অনেকে এই সাহিত্য অপ্রকৃত বিবেচনা করিতেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সংস্কৃত ভাষায় অন্যূন দশ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে (১)। এই সকলের হস্তলিপিও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেকন্দর শাহ যে ভারত জয় করিতে আসিয়া, আবিষ্কার মাত্র করিয়াছিলেন, গ্রীস হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের কথা। তাৎকালিক গ্রীক-ধুরন্ধর প্লেতো এবং আরিস্ততল, শুনিলে কি বলিতেন, বলিতে পারি না।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তী সীমা।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশোন্মুখ সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন সাহিত্য-অভিনয়ের যবনিকা পাত হইয়াছিল পুরাতন ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পুরাতন ধর্ম্মেরও বিবিধ পরিবর্ত্তনের পর নূতন এক ধর্ম্ম আসিয়া তৎস্থলাভিষিক্ত

---

(১) ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বঙ্গদেশস্থ এসিয়াটিক পুস্তকালয়ের" হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা। ১৮৭৭। মুখবন্ধের ১ম পৃষ্ঠ। কথিত আছে যে, ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়ে ৪০৯৩ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। বোডলিয়নে ৮৫৪ খণ্ড। বর্লিনের গ্রন্থালয়েও প্রায় ঐ পরিমাণ। তাঞ্জোরের মহারাজার পুস্তকালয়ে একাদশবিধ অক্ষরের ১৮,০০০ হস্ত-লিখিত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ২,০০০ খণ্ড। কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে ৩,৭০০ খণ্ড, এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ২,০০০ খণ্ড গ্রন্থ আছে।

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসংহিতা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, সেকন্দর শাহের আক্রমণ কালে, গ্রীক লেখকেরা যে সন্ড্রকোতসকে (১)

(১) আমার ১৮৬৯ সালের মুদ্রিত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক পুস্তকে (২১৪ পৃষ্ঠ) উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের কিংবদন্তীমূলক ঘটনা-কালের সঙ্গে গ্রীকগণের ঐতিহাসিক কালের কথঞ্চিৎ মিল রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। অবশেষে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বে রাজা হন ও ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ২৯১খ্রীঃ পূঃ অব্দে বিন্দুসার তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। বিন্দুসার ২৫ কিংবা ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে (২৬৬ অথবা) ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অশোক তৎস্থলাভিষিক্ত হন। অশোক (২৬২ বা) ২৫৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে যথারীতি রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং (২২৫ বা) ২২১ খ্রীঃ পূঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিলে পর বৌদ্ধ-সমিতি আহূত হয়। সুতরাং এই ঘটনা হয় ২৪৫ নয় ২৪২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হইয়া থাকিবে।

বৌদ্ধকাল বিনির্ণয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটী গণনা করিতে আমাকে বুদ্ধের মৃত্যু এবং তৎপূর্ব্ব ও পরের কতকগুলি সাধারণ প্রবাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে,(১) বুদ্ধের মৃত্যু ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক, এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে আনুমানিক ১৬২ বৎসর গত হইয়াছে। ৩১৫ ও ১৬২ যোগে ৪৭৭ হয়, সুতরাং উক্ত ঘটনার আনুমানিক কাল ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। (২) এখন দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের মৃত্যু এবং অশোকের রাজ্যাভিষেকে আনুমানিক ২১৮ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং ২৫৯ + ২১৮ = ৪৭৭ সম্ভবতঃ ইহাই উক্ত ঘটনার সময় হইবে।

আমি এই কারণে বুদ্ধের মৃত্যু-কাল ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ না বলিয়া, ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ অবধারণ করিয়াছি। এবং এই অবধারণা দৃঢ় করিবার চেষ্টায় তাৎকালিক আয়াস-সাধ্য প্রমাণ সংগ্রহেও চেষ্টা পাইয়াছি।

আমার এই অনুমানের সিদ্ধি-সূচক আর দুইটী প্রমাণ অল্প দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। জেনেরল কনিংহাম সাহেব দুইটী ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং ডাক্তর বুহ্লর উহা "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়রী" নামক সন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন। বুহ্লর তাঁহার এতদ্বিষয়ক দুইটী প্রবন্ধেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ক্ষোদিত লিপি অশোক ব্যতিরিক্ত আর কাহারও হইতে পারে না। অশোকের এই ক্ষোদিত লিপিতে বিবৃত আছে যে, তিনি সাড়ে তেত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল "উপাসক" (অর্থাৎ বুদ্ধের উপাসক) ভাবে দিনযাপন করিয়াছিলেন এবং এক বৎসরেরও অধিক কাল সঙ্ঘশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এইক্ষণ যদি অশোক ২৫৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং ২৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে "উপাসক" হন তাহা হইলে, এই ক্ষোদিত স্তম্ভ ২৫৫ – ৩৩½ = ২২১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অবশ্যই স্থাপিত হইয়া

শিশু এবং সেকন্দর শাহের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর সিলিউকসের সমকালিক পালিবোথ্রার রাজা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনিই যে অশোকের পিতামহ পাটলিপুত্রের রাজা চন্দ্রগুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস্ ইহাঁকে কয়েক বার দেখেন। যশস্বী অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব কালে ২৪৫ বা ২৪২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। তৎকালের প্রথম ক্ষোদিত লিপি অদ্যাপি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পর্ব্বতোপরি অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ সকল ক্ষোদিত লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নহে, উহা যে ভাষায় লিখিত, তাহার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, ইতালীয়ের সহিত লাতিনেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং যে কালে ভারতবাসী সংস্কৃতে কথা বার্ত্তা কহিত, সে কাল খ্রীষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল।

থাকিবে। সুতরাং এই ক্ষোদিত লিপি অনুসারে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইতে ২৫৬ বৎসর গত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। (এস্থলে আমি বুলর সাহেবের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিলাম। বুলর সাহেবের ব্যাখ্যায় যে ঐ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে তাহার ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন প্রণালীর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব)। সুতরাং ২২১ + ২৫৬ = ৪৭৭। অতএব সম্ভবতঃ বুদ্ধের মৃত্যু ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হইয়াছে।

ফলতঃ আমার মতের সহিত ক্ষোদিত লিপির এরূপ ঐক্য অভাবনীয় এবং আশাতীত, সুতরাং এ প্রমাণ অধিকতর প্রয়োজনীয়।

এস্থলে আর একটি প্রমাণের উল্লেখও করা যাইতে পারে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র তাঁহার পিতা ছয় বৎসর রাজত্ব করিলে, অর্থাৎ ২৫৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ভিক্ষু হন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। সুতরাং ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অবশ্যই তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে। তাঁহার জন্ম এবং বুদ্ধের মৃত্যু, এই কালের মধ্যে আনুমানিক ২০৪ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং আবার ২৭৩ ও ২৫৬ যোগ করিয়া দেখ, ফল ৪৭৭ দাঁড়াইবে। সুতরাং বুদ্ধের মৃত্যু যে, ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হইয়াছে, তাহা ইহাতেও দেখা যাইতেছে।

আমি জানিতে পারিয়াছি, বুদ্ধের মৃত্যু কাল বিনির্ণয় সম্বন্ধে কনিংহাম সাহেবের ন্যায় পুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও এই মত। আমি ১৮৫৯ অব্দে যে "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক পুস্তক মুদ্রিত করি, তিনি তাহার পূর্ব্বেই এ মতটী প্রচার এবং প্রশ্নাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যে সকল প্রমাণের উপর বিশ্বাস করিয়া আমার মত স্থাপন করিয়াছি, তিনি তৎসমুদায়ের অনুসরণ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না।

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, ইতালীয়ের সহিত লাতিনের, অথবা প্রোটেস্‌টেন্টদিগের সহিত কাথলিক-দিগের ধর্ম্মের ঠিক সেই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিকূলাচারী বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ভারতবর্ষের সাহিত্যকে নববিকশিত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যাঁহারা আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়কেও দৃষ্টিভ্রম জ্ঞানে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অন্ততঃ এই দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে পারেন যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষারূপে গঠিত হয়, এবং পুরাতন বৈদিক ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মাকারে পরিণত ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে রাজধর্ম্মকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া উঠে।

বেদ ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া উদ্ঘোষিত।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান প্রভেদ এই যে, বেদ পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রতিপাদিত বলিয়া পরিচিত। ভারতের আদি ধর্ম্ম-তত্ত্বের উন্নতির সম্বন্ধে বেদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, বেদ কেন ঈশ্বর-প্রতিপাদিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখন তাহার কারণ অনুসন্ধানে আমাদিগের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। যদিও বৌদ্ধেরা অনেক বিষয়ে প্রচ্ছন্নভাবধারী বৈদিক ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তথাপি তাঁহারা বেদকে ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া স্বীকার না করাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বেদ ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছিল।

কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণেরা বেদকে ঈশ্বর-প্রচারিত ও ভ্রমশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বেদের সম্বন্ধে এইরূপ জল্পনা বোধ হয় ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হইয়া পরিশেষে অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় "ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত" এই উপপত্তিমূলক হইয়াছে। সুতরাং ইহাও যে অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় কাল্পনিক ও কৃত্রিম, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বেদের কবিগণ তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে নানারূপ বলিয়া থাকেন।

তাঁহারা কখন আপনাদিগকে স্তোত্র-নির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দেন, এবং কখনও বা তাঁহারা নিজের কার্য্য সূত্রধরের, তন্তুবায়ের, গোপের এবং পোত-বাহকের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। (১০ম, ১১৬, ৯) (১)

আবার সময়ে সময়ে, বেদে অনেক উচ্চ ও মহোদার ভাব-রাশিও লক্ষিত হইয়া থাকে। এরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তোত্রনিচয় হৃদয়ে নির্ম্মিত হইয়া (১ম, ১৭১, ২; ২য়, ৩৫, ২), মুখ হইতে বিনিসৃত হইয়াছে। (৬ ষ্ঠ, ৩২, ১)। কবি কথনও বলেন, স্তোত্রগুলি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন (১০ম, ৬৭, ১), তিনি নিজে উহার রচনাকর্ত্তা নহেন; আবার কখনও বলেন যে, তিনি সোমপানে দৈবশক্তি-সম্পন্ন হইয়া (৬ষ্ঠ, ৪৭, ৩) অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি এই সকল কবিতা মেঘ-নিসৃত বারিধারা (৭ ম ৯৪, ১). অথবা বায়ু-চালিত মেঘ-মালার (১ম, ১১৬,১) সহিত তুলনা করিয়া থাকেন।

এই সকল হৃদয়োত্থিত এবং স্তোত্রাকারে বিনির্গত ভাব, আবার কিছু কাল পরে ঈশ্বর-দত্ত (১ম, ৩৭, ৪) ও স্বর্গীয় (৩য়, ১৮, ৩) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবতারা যেন কবিদের মনকে উত্তেজিত ও অগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতেন (৬ষ্ঠ, ৪৭, ১০)। তাঁহারা কবিগণের বন্ধু ও সহকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৭ম, ৮৮, ৪ ; ৮ম, ৫২, ৪), এবং পরিশেষে দেবতারাই দ্রষ্টা ও কবি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন (১ম, ৩১, ১)। কবিরা স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগের নিকট যে সকল প্রার্থনা করিতেন, তৎসমুদয় ফলবতী হইলে তাঁহারা সহজেই মনে করিতেন যে, তাঁহাদের স্তোত্র অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট হইয়া থাকিবে। দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত কথোপকথন চলিতেছে, তাঁহারা তাহাতেও বিশ্বাস করিতেন (১ম, ১৭৯, ২ ; ৭ম, ৭৬, ৪)। এইরূপে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ মনে করিতেন যে, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং স্বয়ং দেবতারাই প্রচার করিতেছেন।

প্রথম হইতেই আবার এই সঙ্গে সন্দেহের ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। দেবতারা যদি তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিতেন এবং কোন

(১) এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কবিতা ডাক্তর মুইর সাহেবের "সংস্কৃত মূল" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্ট হইবে।

শক্রপক্ষ যদি অপর দেবতাগণের সহায়তায় জয় লাভে কৃতকার্য্য হইত' (বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ ইহার উদাহরণ-স্থল) তাহা হইলে তাঁহারা আবার সন্দিহান হইয়া উঠিতেন। স্তোত্রের কোন কোন অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, লোক-বিদিত দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষমতাতেও তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন (১)।

দেব-প্রসূত বলিয়া বেদের যে মর্য্যাদা, তাহা কবি-কাল্পনিক বলিয়া পরিগণিত হইলে বোধ হয়, কোন আপত্তিই থাকিত না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যখন সমগ্র বেদকে অভ্রান্ত ও দেব-প্রসূত বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং যখন ব্রাহ্মণ দিব্য জ্ঞানযুক্ত ও ভ্রমশূন্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তখন বৌদ্ধদিগের আপত্তি দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, বেদের সূত্র-ভাগে এই বিরোধ ঘটিয়া থাকিবে। "ব্রাহ্মণে" বেদের দেব-প্রসূত হওয়ার কথা উক্ত হইলেও উহা প্রতিবাদকারীকে পরাস্ত করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এই দুইটী বিষয়েরই অন্তরও অতি অধিক। যদিও ব্রাহ্মণে শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (শ্রুতি শব্দ স্মৃতি শব্দের বৈপরীত্য-ব্যঞ্জক। ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হওয়ার আধুনিক কথা শ্রুতি এবং স্মৃতি শব্দ লোক-প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে), তথাপি শ্রুতি শব্দ অদ্যাপি সন্দেহ-ভঞ্জন বা বিরোধের অপনয়নে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীন উপনিষদে বেদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে বেদের স্তোত্র এবং বলি, নিষ্ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং বনচারী ঋষিগণের জ্ঞান অধিক সমাদৃত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও অভিযোগ করিতে দেখা যায় না।

সূত্রপ্রণয়ন-কালে এই প্রতিবাদ ঘটিতে দেখা যায়। নিরুক্তে (১ম, ১৫) যাস্ক কৌৎসের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, "বেদের অন্তর্গত স্তোত্র-গুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক।" কৌৎস কাহারও প্রকৃত নাম না হইয়া নামের অপভ্রংশ হইয়া থাকিলেও পাণিনির পূর্ব্বে বেদের মর্য্যাদার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। (২) এক বুদ্ধই যে, কেবল সর্ব্ব প্রথমে, বেদের দেব-জনকত্ব ও

(১) এই বিষয় আমার এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

(২) ৪র্থ, ৪, ৬০ সূত্রে দৃষ্ট হইবে যে, পাণিনি অবিশ্বাসী এবং নিরীশ্বরবাদীদের বিষয়

ব্রাহ্মণদিগের স্বত্বাধিকার অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও নাস্তিকতার ইতিহাস পাওয়া সুকঠিন। আধুনিক বিসংবাদমূলক গ্রন্থসমূহে, নাস্তিক-প্রধান বৃহস্পতির কতকগুলি মত উদ্ধৃত দেখা যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতে তৎসমুদায় সংগৃহীত হয় নাই। বৃহস্পতির আবির্ভাব-কাল নিরূপণ করা আমার অভিপ্রেত নহে, তবে তন্নামে আরোপিত কয়েকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, মৃদু-স্বভাব হিন্দুও কেমন নিদারুণ আঘাত করিতে পারিতেন এবং বেদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি লইয়া ব্রাহ্মণদের যে স্পর্দ্ধা, তাহা কেবল অনুমানজনক না হইয়া ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অধ্যাপক কাউএলের অনুবাদিত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক-প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। চার্বাক বৃহস্পতির শিষ্য বা মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা লোকায়ত (জগতে প্রসিদ্ধ) সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইঁহাদের মতে চতুর্ভূত ব্যতিরিক্ত জগতে আর কিছুই নাই। ইঁহারা বলেন, কয়েকটি পদার্থের সমবায়ে যেমন মাদকতা-শক্তি উৎপাদিত হয়, সেইরূপ ঐ চতুর্ভূতের সমবায়ে জীবদেহে মেধার বা বুদ্ধির উদ্ভব হইয়া থাকে। শরীর ব্যতিরেকে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ইঁহারা মেধা-সংশ্লিষ্ট শরীরকে আত্মা কহিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অনুভূতি, জ্ঞানলাভের একমাত্র সাধক, এবং সম্ভোগই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

এ সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতেছে, যদি তাহাই হইবে, তবে জ্ঞানী লোকে কি জন্য বেদের মতানুসারে অগ্নিহোত্র বা অন্যান্য যজ্ঞ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নটির উত্তর চার্বাকেরা এইরূপ দিয়াছেন। যথা—

"তোমার এ প্রতিবাদে আমার মত কিছুই খণ্ডন করিতে পারিতেছে না। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ভূত। কারণ বেদ তিনটী প্রধান দোষে দূষিত। ইহার একটী দোষ অসত্য-প্রবণতা, দ্বিতীয়

অবগত ছিলেন। অবিশ্বাসীদের একটী নাম লোকায়ত; এই লোকায়ত শব্দ হইতে উক্থাদিগণে এবং ৪র্থ, ২, ৬০ সূত্রে লোকায়তিক পদ দৃষ্ট হয়। ৫ম, ১, ১২১ সূত্রে বার্হস্পত্য শব্দের নির্দ্দেশ আছে।

দোষ আত্ম-বিসংবাদিতা, তৃতীয় দোষ এক কথার বা এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উক্তি। যে সকল ধূর্ত্ত আপনাদিগকে বেদের পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পরের মতচ্ছেদী। জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ) বাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের (স্তোত্র এবং ব্রাহ্মণ) প্রতি অনাদর প্রদর্শন করেন; পক্ষান্তরে কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞেরা জ্ঞানকাণ্ডজ্ঞদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিন বেদ, ধূর্ত্তগণের অসংলগ্ন অর্থশূন্য গীতি-রচনা ভিন্ন আর কিছুই নহে," এতৎ-সম্বন্ধে এই একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে—

"বৃহস্পতি বলেন, যাহারা জ্ঞান, ও বুদ্ধি-বিহীন, অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, সন্ন্যাসীর ত্রিযষ্টি ও শরীরে ভস্ম লেপন, এই কয়েকটী কেবল তাহাদের জীবনোপায়।"

বৃহস্পতি আরও বলিয়াছেন—

"জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু বধ করিলে ঐ পশু যদি সশরীরে স্বর্গে যায়, যাজক তবে কি জন্য তাহার পিতাকেও সেই সঙ্গে বলি না দেন? শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির যদি প্রীতি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে পথিকের সহিত খাদ্য সামগ্রী দিবার প্রয়োজন কি?

ইহ লোকে পিণ্ডদান করিলে যদি স্বর্গীয় আত্মারা প্রীত হন, তাহা হইলে যাঁহারা গৃহের উপরিভাগে আছেন, তাঁহাদের আহারীয় বস্তু গৃহের নিম্নে দেওয়া হয় না কেন?

যত দিন জীবন থাকে, সুখে বাস কর; ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর।

শরীর একবার ভস্মসাৎ হইলে উহা কেমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে?

লোকে কলেবর ত্যাগ করিয়া পরলোকে যায়, ইহা হইলে তাহারা আত্মীয় স্বজনের প্রণয়-কাতর হইয়া ইহ জগতে কেন প্রত্যাগত না হয়?

ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জীবনোপায়ের জন্যই মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সকল শ্রাদ্ধ-বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। এতদ্দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না।

বেদ-লেখক তিন জনই ধূর্ত্ত, পিশাচ ও নির্ব্বোধ।

পণ্ডিতগণের গর্ফরী তর্ফরী প্রভৃতি এবং ভয়ঙ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়মাবলি, নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উহাতে পুরোহিতদিগের

বুভুক্ষাও দূর হইয়াছে এবং নিশাচর মাংস-পিশাচদিগের মাংস-লালসাও পরিতৃপ্ত হইয়াছে।"

এই সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই যে বৌদ্ধদিগের সময়ে সৃষ্ট, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

অধ্যাপক বর্ণূফ দেখাইয়াছেন যে, যদি "দেবসমীপে বলিদান করিলে, সেই পশুর আত্মা স্বর্গে যায়, তাহা হইলে লোকে পিতাকে বলি দেয় না কেন?" বৌদ্ধ তার্কিকগণও ঠিক এই তর্কটাই ধরিয়াছেন (১)। যদিও অশোকের যত্নে তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি ইহা যে কতিপয় বংশপরম্পরায় লোকের মনে মনে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধের মৃত্যু ঠিক কোন্ সময় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শকের গণনা আরম্ভ হওয়ায়, আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সময়ের পূর্ব্বের সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা বলিয়া কালিদাসের শকুন্তলার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তা আমার পক্ষে অস্বীকার করা এক প্রকার অসম্ভব। উক্ত কবি-প্রণীত" "মেঘদূত" ও "শকুন্তলা" অতি আদরের সামগ্রী। মেঘদূতের পবিত্রতা আরও অধিক। "নলের" কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইলে উহা একখানি প্রতিভা-পূর্ণ চমৎকার গ্রন্থ হইতে পারে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কয়েকটী গল্প, গল্পকথনের আদর্শ বলিলেই হয়। কিন্তু এই সকল সাহিত্য আধুনিক ও বিষয়ান্তর হইতে পরিগৃহীত। এগুলি আলেকজেণ্ড্রীয় কালের গ্রন্থাদির তুল্য।

এই গ্রন্থসমূহ সাহিত্য-ভাণ্ডারের বিচিত্র বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে, জোন্স্ ও কোলব্রুক যে, অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি এই সকল গ্রন্থ আজীবন আলোচ্য বিষয় নহে।

(১) বর্ণূফকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের উপক্রমণিকা ভাগ, ২০৯ পৃষ্ঠা।

বৈদিক ভাষার ঐতিহাসিক প্রকৃতি।

বেদের ভাষা সচরাচর প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে এরূপ বিবিধ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎসমুদয় কালসহকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ ঐ সমুদয় প্রয়োগ গ্রীক ও অন্যান্য আর্য্য ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সন্দেহার্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃত ভাষায় উক্ত ক্রিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ভাষাবিজ্ঞানালোচনায় অবধারিত হইলে এবং বেদ আবিষ্কৃত ও সমালোচিত হইলে পর, বেদে উহার প্রচুর প্রয়োগ দেখা গিয়াছে।

চলিত সংস্কৃত ভাষায় স্বরগ্রামের নির্দ্ধারণ-প্রণালী নাই। বৈদিক সাহিত্যে উহার ব্যবহারের রীতি আছে এবং এই রীতি দেখিয়া বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় স্বর-প্রয়োগ এক নিয়মানুসারেই হইয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমরা জানি যে গ্রীক *Zeus* এবং সংস্কৃত দ্যৌস্ (আকাশ) একই কথা। কিন্তু দ্যৌস্ কথাটি আধুনিক সংস্কৃতে কেবল স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বেদে উহার পুংলিঙ্গ-প্রয়োগ দেখা যায় এবং গ্রীক ও লাতিনে ঐ শব্দসংযুক্ত পদ প্রধান দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়াথাকে। যুপিতরের ন্যায় বেদে দ্যৌষ্পিতর্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অধিকন্তু গ্রীক ভাষায় *Zeus* শব্দ কর্ত্তৃপদে উদাত্ত ও সম্বোধনে স্বরিত স্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আবার বেদেও দ্যৌস্ শব্দের ঐ সকল পদে ঠিক উক্ত রূপ হইয়া থাকে। গ্রীক বৈয়াকরণিকেরা এইরূপ প্রভেদের কারণ বলিতে পারেন না। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা বলেন, স্বরগ্রামের আরোহ ও অবরোহের নিয়মানুসারেই ঐ প্রকার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে (১)।

---

(১) সাধারণ নিয়মানুসারে সম্বোধন পদের প্রথম শব্দেই বল ক্ষিপ্ত হয়। গ্রীক এবং লাতিনেও অংশতঃ এই নিয়ম আছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃতও এই নিয়ম-বর্জ্জিত নহে। দ্যৌস্ শব্দের সম্বোধন স্বরিত স্বরবিশিষ্ট হওয়ায় আপাততঃ এই নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এই শব্দ দ্বিপদ-বিশিষ্ট। দির উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ঔস্ এর উচ্চারণ হ্রস্ব। এই দীর্ঘ ও হ্রস্ব একত্র হইয়া স্বরিত স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

সংস্কৃতে দ্যৌস্ শব্দের সম্বোধন পদের উচ্চারণ উদাত্ত স্বরে না হইয়া যে, স্বরিত স্বরে হইয়াছে, ইহা আমার নিকট ভাষার একটী মনোহর এবং অমূল্য রত্ন বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তর শ্লিমান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গ্রীক শিল্পবিশিষ্ট দেখিয়া কে না চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন? আমি উহাদিগকে গ্রীক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণের সোপানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু দ্যৌস্ শব্দের এই সম্বোধন পদের সহিত তুলনা করিলে আবিষ্কৃত প্রস্তর খণ্ড, পান-পাত্র, ঢাল, শিরোভূষণ, এমন কি সুবর্ণ-মুকুটও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধহয়। যেমন এক দিকে বুঝিতে পারা যায় যে, পান-পাত্র প্রভৃতি সামান্য শিল্পীর সামান্য চিন্তাসম্ভূত, তেমনি অন্য দিকে সুবর্ণাপেক্ষা বহুমূল্য উপাদান স্বরূপ মানব চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইয়া প্রীতি লাভ করিতে হয়। যদি পিরামিদ গড়িতে বা সুচারু প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণে সহস্র সহস্র লোক আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে "দ্যৌষ্পিতর্," (আদৌ আলোকদাতা অর্থে, পশ্চাৎ ঈশ্বরার্থে প্রযুক্ত) এই একটীমাত্র শব্দের নির্ম্মাণে যে, কোটী কোটী লোকের পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা কেন বলিতে পারিব না? বেদের অনন্ত ভাণ্ডার এই রূপ অসংখ্য পিরামিদে পরিপূর্ণ এবং এই রূপ অগণ্য অমূল্য রত্নে সমাকীর্ণ। এখন আমরা এই রত্নরাজির উদ্ধরণ, সংগ্রহ এবং সজ্জিতকরণ জন্য কর্ম্মকুশল লোক চাই, তাহাহইলেই সেই মহামতি প্রাচীন মানবের হৃদয়-নিহিত গভীর বৈচিত্র্য আবার বিমুক্ত হইবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলিকে কেবল বিচিত্র বলিলেই উহাদের সম্পূর্ণ প্রশংসা করাহইল না; ভাষা-বিজ্ঞান রূপ অণুবীক্ষণে দ্যৌস্ ও Zeus শব্দের সম্বোধন পদের স্বর যেন জীবের অন্তর্লীন, জীবনসূচক ধমনীর প্রকম্পন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে জীবন আছে, ঐতিহাসিক জীবনের সতেজ চিহ্ন ইহাতে লক্ষিত হইতেছে। আধুনিক ইতিহাস মধ্যকালের ইতিহাস ব্যতীত যেরূপ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিংবা মধ্যকালের ইতিহাস রোমের ইতিহাস, অথবা রোমের ইতিহাস গ্রীসের ইতিহাস ব্যতিরেকে যেমন অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ সমস্ত জগতের ইতিহাস বৈদিক সাহিত্য-সংরক্ষিত, আর্য্যজাতির জীবন-বৃত্তান্তের প্রথম অধ্যায় ব্যতিরেকে আজি অবধি অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে ভারতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক কেবল কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ এবং শিব ও বিষ্ণুর ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা ইহার অধিক আর কিছুই করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির পূর্ব্বে যখন সংস্কৃত ভাষা ভারতের কথিত ভাষা ছিল, এবং শিবপূজা অসম্পূর্ণ প্রচলিত কি অজ্ঞাত ছিল, তৎকাল-প্রসূত ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।

বৈদিক সাহিত্যের চারিটি স্তর।

১ম। সূত্রকাল, ৫০০ খ্রীঃ পূঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ভারতীয় সাহিত্যে উপর্য্যুপরি তিন চারিটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সূত্রকাল। এই কাল বৌদ্ধসময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। বিচিত্র রচনাপ্রণালী দ্বারাই এই কালের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই সকল রচনা নিতান্ত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত, টীকা ব্যতিরেকে প্রায় বোধের অগম্য। সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে বিরত হইলাম। ফলতঃ আমি যে সকল সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার কোন খানির মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব রচনা দৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এইরূপ একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, সূত্রলেখক একটি মাত্র অক্ষর বাঁচাইতে পারিলে পুত্রলাভেরও অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। পুত্রের প্রদত্ত পিণ্ড না পাইলে তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইত না। তৎকালের পরিষদ-প্রচলিত জ্ঞানসংগ্রহ ও একত্রীকরণই সূত্রের উদ্দেশ্য। এই সকল সূত্রে যজ্ঞের নিয়ম, স্বর-বিজ্ঞান, ধাতুপ্রকরণ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ, ছন্দ, আচার, আইন, জ্যামিতি, খগোল ও দর্শনশাস্ত্র, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটীতে নূতন নূতন ভাব লক্ষিত হয়। আধুনিক পাঠকেরা এ সমস্ত মত অস্বীকার করিতে অসমর্থ।

কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দেখা যায় না বলিয়া, আজি কালি উহা আদৃত না হইলেও বলির উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় মানব-হৃদয়ের

ইতিহাসে একটী প্রয়োজনীয় অধ্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয় ভারতে জানিবার যেমন সুবিধা, আর কোথাও তেমন নহে।

যখন লিপিকার্য্য জগতে অবিদিত ছিল, তখন ভারতে স্বর-বিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ উহা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা স্তোত্রের প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষা করিতেন। খ্রীষ্ট জন্মিবার পঞ্চম শতাব্দী পূর্ব্বের ভারতীয় স্বর-বিজ্ঞানবিৎগণকে ভাষার পদার্থ-বিভাগ বিষয়ে যে, অদ্যাপি পৃথিবীর কোন জাতি অতিক্রম করিতে পারে নাই একথা বলিলে বোধ হয়, হেমহোজ্ বা এলিস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রতিবাদ করিবেন না।

ব্যাকরণ বিষয়ে পাণিনির সূত্রে যেরূপ ভাষা-তত্ত্ব সংগৃহীত ও বিভক্ত হইয়াছে, কোনও পণ্ডিত অন্য কোনও ভাষায় সেইরূপ আর একখানি গ্রন্থ দেখাইতে পারিবেন না, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতেছি।

ছন্দের বিষয়ে আধুনিক ছন্দকারেরা বলিয়া থাকেন যে, আদৌ নৃত্য গীতের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকদিগের মত হইতেও আমরা ঠিক তাহাই বুঝিতে পারি। ছন্দগুলির নাম শ্রবণ মাত্রেই তাহা উপলব্ধি হয়। ছন্দের সহিত পদবিক্ষেপার্থের সংস্রব লক্ষিত হয়। বৃত্ত বৃত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর অর্থে আদৌ নৃত্যকারীর শেষ ৩।৪ পদ-বিক্ষেপ বুঝাইত এবং সেই বৃত্ত দেখিয়া নৃত্যের প্রকৃতি ও ছন্দ স্থিরীকৃত হইত। বেদে সচরাচর যে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় (১) তাহা ত্রিপদার্থে প্রযুক্ত হইত। ইহার বৃত্তে তিনটি করিয়া পদ থাকিত, যথা, ৩——

প্রাচীন সূত্রের মধ্যে জ্যামিতি ও খগোল সম্বন্ধে যে যে মত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় কতদূর প্রকৃত, তাহা বলিতে পারি না। হিন্দুরা বহুকাল পরে গ্রীকদিগের নিকট যে, ঐ বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে বেদী নির্ম্মাণ লইয়া জ্যামিতি ও ২৭টি নক্ষত্র লইয়া খগোল ছিল, একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। শুল্ব সূত্রে (২) এই প্রশ্ন দেখা যায় যে, একটি গোল বেদীর আয়তনের সমান

(১) ঋ., ঋ., ঋগ্বেদের অনুবাদ।

(২) এই সূত্র সর্ব্বপ্রথম "পণ্ডিতে" অধ্যাপক জি থিবট কর্তৃক সংস্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছিল।

করিয়া কিরূপে একটি বর্গক্ষেত্রাকারের বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে? ইহাতে বোধ হয়, এই জন্যই বৃত্তকে বর্গ করিবার প্রথম প্রয়াস হইয়া থাকিবে (১)। এই সকল প্রাচীন সূত্রে যে সকল পদের ব্যবহার দেখা যায়, তৎসমুদায় গৃহজাত বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা গণিত-বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার ইচ্ছা করেন, ঐ সমস্ত সূত্র তাঁহাদের সমধিক যত্নের সহিত পর্য্যালোচনা করা উচিত।

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া প্রভৃতি গার্হস্থ্য ব্যাপার সম্বন্ধে নিয়মাবলী, শিক্ষা-বিষয়ক নিয়ম, সামাজিক আচার ব্যবহার, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি, কর ও শাসন-সংক্রান্ত রীতি নীতি প্রভৃতি গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র পাঠ করিয়া যেমন জানা যায়, তেমন আর কোথাও নহে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির প্রণীত নিয়ম ঐ সকল মূল গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে প্রাচীন সময়ের রীতি নীতি বর্ণিত হইলেও উহারা অতি প্রাচীন কালের রচিত গ্রন্থ নহে।

এই সকল সূত্রমধ্যে (২) দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও কয়েকটি অধ্যায় নিবেশিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র উপনিষদে অঙ্কুরিত হইয়া ষড়্দর্শনসূত্রে অতি বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল সূত্র আধুনিক হইতে পারে (৩), কিন্তু

---

(১) গ্রীসেও ডেলিয়ানগণ একটী দৈবাদেশ পাইয়াছিলেন যে, যদি তাঁহারা বর্ত্তমান বেদী অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ একটী বেদী নির্ম্মাণ করেন, তবে তাঁহাদের এবং যাবতীয় গ্রীক জাতির দুর্দ্দশার ও বিপদের অপনয়ন হইবে। কিন্তু তাঁহারা জ্যামিতিতে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। "পরে এতৎসম্বন্ধে তাহারা প্লেতোর পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, দৈবাদেশের তাৎপর্য্য কেবল তোমাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বিজ্ঞানুশীলনে উৎসাহী করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেশের মঙ্গল চাহিলে বিজ্ঞানই উহার প্রধান সাধন।"

(২) "প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থাবলী," নামক গ্রন্থে জি, বুলার সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত "আপস্তম্ব সূত্র" দেখ।

(৩) ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বিল সাহেবের বুদ্ধ-ত্রিপিটকের ৮৪ পৃষ্ঠা দেখ। বিল সাহেব কোলব্রোককে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন তাঁহার মূল গ্রন্থের সহিত তদীয় "সুবর্ণ সপ্ততি" শাস্ত্রের ঐক্য আছে। আমি এই অনুবাদের কাল এবং এই বিষয় স্বীকার করি।

উহা যে সময়েরই হউক, কসিন সাহেব বলেন, "ইহাতে অন্যের মধ্যে সমস্ত বিষয় এরূপ বিশদরূপে বর্ণিত ও নির্ণীত হইয়াছে যে, এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র উপেক্ষিত হইলেও উহারা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে"।

২য়। ব্রাহ্মণকাল ৬০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ।

সূত্রকালের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-কাল। এই সকল ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীতে ও কথঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ভাষায় লিখিত। ইহার উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশেই স্বর-বোধক চিহ্ন দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে যাগযজ্ঞের নিয়ম সুন্দররূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং তৎসমুদয়ের সমর্থন জন্য অনেক মহাত্মার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যাগযজ্ঞের বর্ণনা করা প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সময়ে সময়ে উহাতে নানা বিচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রে অনেক বিষয়ের সমর্থনস্থলেই ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পর সূত্র হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে সূত্র বোধগম্য হইয়া উঠে না।

ব্রাহ্মণের মধ্যে আরণ্যকের বিবরণ অতি সুন্দর। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপে আত্মসংযম করিতে হয়, ইহাতে তাহার বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। অবশেষে উপনিষদে ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে যদি সূত্রকাল আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-কালের উৎপত্তি ও বিবৃদ্ধি হইতে অন্যূন ২০০ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। ইহার মতের সমর্থনপ্রসঙ্গে যে সকল মহাত্মার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারাও যে এ কালের কম সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এরূপ কাল-নিরূপণে আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল স্মৃতিশক্তির সহায়তা হইতে পারে। সাহিত্যের যে স্তররাশি সূত্রের নিম্নাংশে পতিত থাকিয়া স্বয়ং আর একটি স্তরোপরি স্থাপিত রহিয়াছে, তাহার নাম মন্ত্রকাল। ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩য়। মন্ত্রকাল৮০০-১০০০ খ্রীঃ পূ।

এই সময়ে বৈদিক স্তোত্র ও সূত্র সকল যে, যথানিয়মে সন্নিবেশিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল, ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বেদচতুষ্টয় বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র বা বলিপ্রকরণ প্রকটন উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল। কোন্ শ্রেণীর ঋত্বিক্‌গণ কোন কোন যজ্ঞে কোন্ কোন্ মন্ত্র ব্যবহার করিবেন, এক একটী বেদে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সামবেদ-সংহিতা (১) উদ্‌গাতার উচ্চার্য্য স্তোত্রে পূর্ণ, এবং যজুর্ব্বেদ-সংহিতা অধ্বর্য্যুদিগের উচ্চার্য্য স্তোত্রে ও মন্ত্রে পরিপূরিত। এই দুই খানি গ্রন্থের সন্নিবেশ-বিষয়ে কতকগুলি যজ্ঞের নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতা হোতৃদিগের পাঠ্য স্তোত্রে পূর্ণ। কিন্তু তৎসমুদয় কোন যজ্ঞের নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত নহে। উহাতে নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক ও প্রচলিত কবিতা আছে। অথর্ব্ব বেদটী আধুনিক সংগ্রহ মাত্র। ইহাতে ঋগ্বেদের কবিতা ভিন্ন মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কুসংস্কার-পূর্ণ অনেক বিচিত্র কবিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা কেবল সংহিতা-রচকদিগকে লইয়া বিচরণ করিতেছি না, যে ব্যবসায়ী ঋত্বিক্‌গণ এই দুরূহ যজ্ঞের নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, কোন্ কোন্ আচার্য্যকে যজ্ঞের কোন্ কোন্ অংশ সম্পাদন করিতে হইবে, অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রীয় প্রাচীন কবিতার কোন্ কোন্ অংশই বা পঠিত ও গীত হইবে, তাহাও স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বিচরণ করা এখন আমাদের কার্য্য।

সৌভাগ্যের বিষয় এই, অপর এক শ্রেণীর ঋত্বিক্ আছেন যাঁহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র উপাসনা-গ্রন্থ নাই। তাঁহাদিগকে কেবল তাঁহাদের জাতীয় সমস্ত পৌরাণিক কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত। যাগযজ্ঞের সহিত কোন সংশ্রব নাই এরূপ অনেক প্রাচীন কবিতা তাঁহাদিগের দ্বারা এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে। অপরাপর গ্রন্থ বেদ নামে অভিহিত হইলেও ঋগ্বেদই

(১) প্রায় ৭৫টী কবিতা বা স্তোত্র ব্যতীত আর প্রায় সকল সামবেদসংহিতার কবিতাই ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত ঐতিহাসিক বেদ, এবং উহাতেই প্রাচীন কবিতা সকল বিস্তারিত রূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই বেদ দশ ভাগে বিভক্ত এবং একই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধীনে সম্পাদিত হইলেও এক একটী ভাগ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্তোত্রের সংগ্রহ মাত্র (১)। উহা ভিন্ন ভিন্ন পরিবার মধ্যে সাদরে সংরক্ষিত হইত। পরিশেষে এই সকল কবিতা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক প্রকাণ্ড পবিত্র কবিতা-গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতার সংখ্যা ১০১৭ কি ১০২৮ হইবে।

যে সময়ে এই প্রাচীন স্তোত্রগুলি সংগৃহীত ও উল্লিখিত চারি শ্রেণীর ঋত্বিকগণের জন্য উপাসনা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, সেই কালই মন্ত্রকাল নামে অভিহিত। এই কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৪র্থ। ছন্দকাল, ১০০০ খ্রীঃ পূঃ।

এইজন্য কেবল ঋগ্বেদে যেরূপ কবিতা দৃষ্ট হয়, সেই রূপ বৈদিক কবিতার উৎপত্তি, বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমবর্দ্ধন এবং প্রধান প্রধান বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান-বিধি অন্যূন খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে হইয়া থাকিবে। এই ছন্দকাল কত কাল হইতে বিস্তৃতি লাভ করিয়া আসিতেছিল, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? কেহ কেহ এমন মনে করেন যে, এই কাল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৎসর বা শতাব্দী দ্বারা এই কালের পরিমাণ স্থির করিতে চেষ্টা করা কেবল অনুমান মাত্র—সুতরাং বৃথা। স্তরে স্তরে চিন্তার উৎকর্ষে যে রূপে বৈদিক ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান-প্রসঙ্গে এই সুদীর্ঘ কাল অবধারণ করাই শ্রেয় বলিয়া বোধ হয়।

যদি আমাদিগকে এই কালের প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্ত্তন, কোন কোন স্তোত্রে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পশ্চিম স্থানের পরিবর্ত্তন, কবিকথিত প্রাচীন এবং আধুনিক নীতিসমূহ রাজা বা দলাধিনায়ক-

(১) অনুক্রমণীর পরিভাষা দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে স্তোত্রোল্লিখিত দেবগণের শ্রেণী বিভাগ এবং ঐ বিভাগানুসারে প্রত্যেক মণ্ডলে যে যে স্তোত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পরিব্যক্ত আছে।

ঋণের বংশাবলি, মানব-বিহিত আচার ব্যবহারের ক্রমবর্দ্ধন এবং পরিশেষে আধুনিক স্তোত্র-লক্ষিত চতুর্বর্গের উৎপত্তির প্রথম লক্ষণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নির্ণয় করাই উচিত। ঋগ্বেদের সহিত অথর্ব্ববেদের তুলনা করিলে মনে হয়, ঋগ্বেদের আদি ভাব সকল অথর্ব্বে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদের শেষ ভাগেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতেই বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক উৎপত্তি-বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে।

কেবল ভারতে কেন, সমস্ত আর্য্যজগতেও যে, ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন ও আদিম গ্রন্থ নাই, ইহা একবারে নিশ্চিত। এমন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্য ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার সংশ্রব দেখিয়া ঋগ্বেদকে তাঁহাদের আপন প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। যে ঋগ্বেদ তিন চারি হাজার বৎসর হইতে কোটী কোটী লোকের ধর্ম্মের ও নৈতিক জীবনের মূল স্বরূপ হইয়াছে, সে বেদ যে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা বলিলে আপাততঃ গল্প বলিয়া বোধ হইবে। ফলতঃ ইহা গল্প নহে। সৌভাগ্যক্রমে আমি এই সমস্ত বেদ সায়নাচার্য্যের টীকার সহিত প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতে পারিয়াছি।

ঋগ্বেদে অন্যূন ১০১৭ কি ১০২৮টি স্তোত্র আছে এবং প্রত্যেক স্তোত্রে গড়ে ১০টি করিয়া কবিতা আছে। দেশীয় পণ্ডিতগণের মতে উহাতে অন্যূন ১৫৩,৮২৬ শব্দ আছে।

বেদ জন-শ্রুতিক্রমে আগত।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত প্রাচীন সাহিত্য কিরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতে ছিল? বর্ত্তমান কালে বেদের পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট শাকের ১,০০০ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রায় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রারম্ভের বা বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ের পূর্ব্বে যে, ভারতে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কিরূপে ব্রাহ্মণ, সূত্র ও প্রাচীন স্তোত্রাদি বিদ্যমান ছিল? পূর্ব্বে কেবল স্মৃতি-শক্তির বলেই উহা থাকিত। এই সমুদয় স্মরণ রাখিবার জন্য বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা পাঠশালার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

যে সময় অতিবাহিত করি, ভারতের উচ্চ তিন বর্ণের বংশ-সম্ভূত সন্তানেরা সে সময়ের মধ্যে কোন গুরুর মুখ হইতে বেদ অভ্যাস করিতেন। ইহা তাঁহাদের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই পবিত্র কর্ত্তব্যে শিথিল-প্রযত্ন হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে ঘৃণিত হইতে হইত। লিপি-প্রণালীর সৃষ্টির পূর্ব্বে সাহিত্য সঞ্জীবিত রাখিবার আর কোন উপায় না থাকায়, উহার ব্যাঘাত ঘটিতে না পারে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অতি সাবধান ছিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে। উহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম কর্তৃক পরাভূত হইয়া আর মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই, এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম কেবল শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবপূজা-বিধি-পূর্ণ পুরাণ (১) এবং তন্ত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের যে সকল লোকের সহিত ভারতের বিশেষ সংশ্রব আছে, এবং যে সকল ভারতবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম অনেক রূপান্তর, ধারণ করিয়াছে। সত্য বটে উহাঁকে ভিন্ন অবস্থার অনুবর্ত্তী হইতে হইয়াছে,

---

(১) আমরা বর্ত্তমান পুরাণ হইতে প্রাচীন প্রবাদে পরিচিত অথর্ব্ববেদোক্ত মূল পুরাণ বাছিয়া লইব। ১১শ, ৭, ২৪, ঋচাঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ; ১৫শ,৬,৪, ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ গাথা চ নারাশংসিশ্চ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে গল্পময় ইতিহাস ব্রাহ্মণগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা পুরাণ হইতে বিভিন্ন (গৃহ্য সূত্র ৩য়, ৩; দেখ)। পুরাণ ও ইতিহাসাদি কেবল শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার সময়েই আবৃত্তি হইত, গৃহ্য সূত্র ৪র্থ ৬, ৬। অনেক সময় ব্যবহারশাস্ত্রও পুরাণের উপর নির্ভর করিত। উহা বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদাঙ্গ হইতে পৃথক, গৌতম, ১১ ম, ১৯। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে পুরাণ হইতে উদ্ধৃত অংশ নিবেশিত আছে, ১ম ১৯, ১৩; ২য়, ২৩, ৩; এ গুলিও ছন্দোবদ্ধ, প্রথম মনুতে (৪ র্থ, ২৪৮, ২৪৯) এবং শেষে যাজ্ঞবল্ক্যে (৩য়, ১৮৬) উক্ত হইয়াছে। উহাতে গদ্যাংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১ম, ২৯, ৭। পুরাণ উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জৈমিনীর সময়েও পুরাণের তাদৃশ আদর দৃষ্ট হয় না, এমন কি তিনি তাহার মীমাংসা গ্রন্থে পুরাণের নামও করেন নাই।

এবং ব্রাহ্মণদিগ-কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম তৎপ্রতিও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মগত বিশ্বাসে একতা স্থাপনে, ধর্ম্মানুগত্য পরীক্ষণে, বা নাস্তিকতা দমনেও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের সময় যবনের হস্তের খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা অনেকে মৃত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপে (১)? অনাহার-কষ্ট-সহিষ্ণু যাজক ইউরোপে বা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি? ভারতে যাজকদিগের প্রভুত্ব আজিও প্রবল রহিয়াছে। আচার ব্যবহার, জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের প্রবল প্রতাপে উহা আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। যাঁহারা দীক্ষা-গুরু বলিয়া মনোনীত হন, তাঁহারা বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদের সহিত তন্ত্র, পুরাণ বা মনুর কোন স্থানের অনৈক্য হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ স্মৃতি ও শ্রুতির সমাদর করেন, এই ঘোর কলিযুগে ম্লেচ্ছ-প্রাধান্যকালেও তাঁহাদিগকে কলিকাতার দরবার-গৃহে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা ভিক্ষাজীবী হইয়া পল্লীতে একাকী চতুষ্পাঠীতে কাল কাটাইয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস যে, নাস্তিকের সহিত কথা কহিলে গৌরবের লাঘব হয়। সুতরাং তাঁহারা ইউরোপ-বাসীদের সহিত সহজে কথা কহেন না। কিন্তু সংস্কৃত-পারদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে কখনও আলাপ পরিচয় হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং তাহাদিগকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে অবশেষে প্রাচীন জ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ন্যায় হৃদয়-দ্বার খুলিয়া বসেন। ইহাঁরা ইংরেজী বা বাঙ্গালায় কথা কহেন না। ইহাঁরা সংস্কৃত কহেন এবং সংস্কৃতই লিখিয়া থাকেন। আমি সময়ে সময়ে ইহাঁদের নিকট হইতে অতি পরিপাটী ও নির্দ্দোষ সংস্কৃত পত্র পাইয়া থাকি। আমার অদ্ভুত গল্প এখনও শেষ হয় নাই। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন সমস্ত ঋগ্বেদ জানিতেন, তেমনি ইহাঁরাও সমস্ত-ঋগ্বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন। মুদ্রিত বেদ

(১) ইহাই আশ্চর্য্য যে, দুর্ভিক্ষের সময়েও অশুচি হস্তের অন্ন গ্রহণ পাপ বলিয়া গণ্য—সাধারণে এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী রহিয়াছে; কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিছুই দৃষ্ট হয় না। বরং শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।

ও তাহার হস্ত লিপির অভাব নাই, তথাপি ইহাঁরা ইহাঁদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় গুরুর মুখে শুনিয়া সমস্ত ঋগ্বেদ অভ্যাস করেন। বেদ-শিক্ষার সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি রক্ষার জন্যই ইহাঁরা এইরূপ করিয়া থাকেন (১)। এইরূপ বেদ-শিক্ষা ইহাঁরা পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। যদিও দিন দিন ইঁহাদের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে, তথাপি ইঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সমুদ্র পারে যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া ইহাঁরা ইংলণ্ডে আইসেন না। ইঁহাদের কোন কোন ছাত্র দেশীয় ও বিদেশীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইয়া এখন দেশান্তর গমনে কুণ্ঠিত হন না। আমি এমন অনেক ভারতবর্ষীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, যাঁহাদের বেদের অধিকাংশই কণ্ঠস্থ আছে। এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার চিঠি পত্র লেখা লেখি হয়, যাঁহারা দ্বাদশ কি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিতে পারিতেন (২)। তাঁহারা প্রতিদিন কয়েক পঙ্‌ক্তি করিয়া শিক্ষা করেন এবং কয়েক ঘণ্টা কাল ধরিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে থাকেন। উচ্চারণ-শব্দে সমস্ত গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহা-দের স্মরণ-শক্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলে। তাঁহাদের পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা এক এক খানি জীবিত বেদস্বরূপ হইয়া উঠেন। বেদের অন্তর্গত যে অংশ জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার স্বরগ্রাম ঠিক রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা

---

(১) এই মৌখিক শিক্ষার বিষয় ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্যে বিবৃত আছে। সম্ভবতঃ ইহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়ের হইবে। ব্রাহ্মণে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহা হইতেও প্রাচীন সময়ের; কারণ ঋগ্বেদের একটী স্তোত্রে (৭ম, ১০৩) বর্ষাগম এবং তজ্জনিত উল্লাস ও ভেকগণের মক্ মক্ শব্দের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এতৎসম্বন্ধে লেখা আছে—"একটী ভেক আর একটী ভেকের ঠিক অনুকরণ করিতেছে, যেমন ছাত্র শিক্ষকের উচ্চারিত কথার পুনরুচ্চারণ করে।" ছাত্রের নাম শিক্ষমান। শিক্ষকের নাম শক্ত; শিক্ষাও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহা আধুনিক সময়ের শব্দবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দে পরিচিত হইতেছে।

(২) "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী" ১৮৭৮ অব্দ। ১৪০ পৃষ্ঠা। এই পত্রের সম্পাদক বলেন, "এমন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, সমগ্র ঋগ্বেদ যাঁহাদের জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই ইহারা গ্রন্থের সাহায্য না লইয়া অনায়াসে স্তোত্রাবলী আবৃত্তি করিতে পারেন।"

সেই অংশ আবৃত্তি করেন। শঙ্কর পাণ্ডুরং নামক জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত আমার ঋগ্বেদের সংস্করণ জন্য পাঠ সংগ্রহ করিতেছেন। লিখিত কি মুদ্রিত বিভিন্ন ঋগ্বেদ হইতে এই পাঠ সংগৃহীত হইতেছে না। কেবল বৈদিক শ্রোত্রীয়দের মুখে শুনিয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিতেছেন। গত ১৮৭৭ অব্দের ২রা মার্চ্চ আমি তাঁহার এক খানি পত্র পাই, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনার ঋগ্বেদের মূল অবলম্বন করিয়া আমি এই বেদের অনেক ভ্রমণশীল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিব যে, তৎসমুদয় ঐ বেদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ কি না। আপনাকে এই বিষয় না জানাইয়া আমি প্রকাশ্যরূপে উহার কোন ব্যবহার করিব না। আমি যখন আপনার জন্য পাঠ সংগ্রহ করি, তখন একজন বৈদিক শিষ্য উহা পরীক্ষা করেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার পাণ্ডুলিপি সকল থাকে মাত্র, কিন্তু তিনি প্রায়ই তাহা খুলেন না, সমস্ত সংহিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। এই যজ্ঞোপবীতধারী, ধুতি-পরিহিত প্রাচীন ঋষির প্রতিকৃতি স্বরূপ বেদ-পাঠকের মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে।"

তিন চারি হাজার বৎসর হইতে যে স্তোত্রাবলী মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, যিনি ভারতীয় আকাশতলে বসিয়া সেই পবিত্র স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতেছেন, সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ হিন্দুর বিষয় ভাবিয়া দেখুন। যদি লিপি-প্রণালী উদ্ভাবিত না হইত, যদি মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না হইত, যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকারে না থাকিত, তাহা হইলে এই তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার সহস্র সহস্র সমপাঠীর সহিত সমবেত হইয়া, যে গান পঞ্জাবের সরস্বতী প্রভৃতি নদীর তীরে বসিয়া একদিন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ গাইয়াছিলেন, আজিও সেই বেদ গান করিতেন। দেশ, কাল, বর্ণ ও ধর্ম্মে আমাদের অপেক্ষা পৃথগ্‌ভূত হইলেও যে মানব-হৃদয় সর্ব্বত্রই একরূপ, সেই মানব-হৃদয়ের গভীর গুপ্ত বিষয় বুঝিবার আশায় আমরা ইউরোপের—সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্র-ভূমি ওয়েষ্টমিনষ্টর আবির ছায়ায় বসিয়া মনে মনে সেই পবিত্র স্তোত্র শুনিতেছি, এবং তৎসমুদয় বুঝিবার (সময়ে সময়ে তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে) চেষ্টা করিতেছি।

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে এই গল্প বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আপনাদের কেহ কেহ ইহা উপন্যাসের কথা মনে করিতে পারেন। 'আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যায় অপেক্ষাও ইহা অধিকতর সত্য।

পূর্ব্ব প্রস্তাবের পরিশিষ্ট।

আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্তও এই ভাবে উক্ত সাহিত্য রক্ষিত হইতেছে। আমার এই কথায় কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না দেখিয়া, আমি ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্য হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। খ্রীষ্টের অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বেদ কিরূপে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা ইহাতে জানা যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে কিরূপে এই পদ্ধতি রক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য দুইজন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের লিখিত বিবরণও এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে উক্ত বেদের উচ্চারণ-বিধি কথিত হইয়াছে। যাস্ক ও পাণিনি এই দুই ব্যক্তির আবির্ভাব-সময়ের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন প্রাতিশাখ্য লিখিত হইয়া থাকিবে। অন্য বলবৎ প্রমাণের অভাবে উপরিউক্ত অনুমিত কালই সত্য বলিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-গৃহে কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইত, উক্ত প্রাতিশাখ্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষককে নির্দ্ধারিত সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইত। ব্রহ্মচারীর করণীয় সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন না করিলে কোন শিক্ষকই অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। আবার শিক্ষক সমুদয় ব্রতপালনোন্মুখ ছাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকে শিক্ষা ও দিবেন না। আচার্য্য উপযুক্ত স্থানে বাস করিবেন। যদি তাঁহার একটী বা দুইটী শিষ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দক্ষিণে উপবেশন করিবে। তাহার অধিক হইলে তাহাদিগকে স্থানের সচ্ছলতা বিবেচনায় বসিতে হইবে। প্রত্যেক নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রগণকে গুরুদেবের পদবন্দনা করিয়া "পাঠ আরম্ভ করুন" বলিতে হইবে। তৎপরে শিক্ষক "ওঁ হাঁ" বলিয়া উত্তর দিয়া দুইটী কথা উচ্চারণ করিবেন। কথাটী সংযুক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে কেবল একটী মাত্র উচ্চারণ করিবেন। অধ্যাপক দুই একটী কথা

উচ্চারণ করিলে পর প্রথম ছাত্র প্রথম কথাটী পুনরায় উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু উহার অর্থবোধ না হইলে পুনরায় "মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিবেন। এবং অধ্যাপক উহার ব্যাখ্যা করিয়া "ওঁ হাঁ—মহাশয়" বলিবেন।

একটী প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ অধ্যাপনা চলিতে থাকিবে। এই রূপ প্রশ্ন সচরাচর তিনটী পদ লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু যদি চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ শব্দের ছন্দোবদ্ধ বাক্য হয়, তাহা হইলে তাহার দুইটী বাক্য লইয়া একটী প্রশ্ন হইবে। আর যদি চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ শব্দের পঙ্‌ক্তি ছন্দে সকল-গুলিই হয়, তাহা হইলে উহার দুই তিনটী লইয়া একটী প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যদি একটী স্তোত্রে একটী মাত্র বাক্য থাকে, তবে উহাও একটী প্রশ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রশ্নটী শেষ হইলে পর শিষ্যদিগকে উহা আর একবার অভ্যাস করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। যতক্ষণ সমস্ত পাঠ সমাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ অধ্যাপক একে একে সকল ছাত্রকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া গিয়া এক একটী প্রশ্ন করিবেন। ৬০টী প্রশ্ন লইয়া এক একটী পাঠ হইবে। সর্ব্বশেষের বাক্যার্দ্ধ শেষ হইলে অধ্যাপক বলিবেন, "মহাশয়" এবং শিষ্য "ওঁ হাঁ মহাশয়" বলিয়া পাঠের সর্ব্বশেষ বক্তব্য বাক্যটী উচ্চারণ করিবেন। পরে ছাত্রবর্গ অধ্যাপকের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবেন। ৯১,০৬৪

পাঠ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যে এসম্বন্ধে আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম দৃষ্ট হয়। এমন কি ছোট কথা পরিত্যক্ত হইবার ভয়ে অধ্যাপককে দীর্ঘ উচ্চারণবিশিষ্ট বা একস্বর-বর্ণ-সংযুক্ত শব্দকে দুই বার উচ্চারণ করিতে হইবে। কতকগুলি ছোট কথার পর "ইতি" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং আর কতকগুলি কথার পর "ইতি" শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐ কথা পুনরায় উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা—"চ ইতি চ"

প্রায় অর্দ্ধ বৎসর ব্যাপিয়া এইরূপ অধ্যাপনা-কার্য্য চলিত। সচরাচর বর্ষা কালেই পাঠ আরম্ভ করিবার রীতি ছিল। অনেক পর্ব্বদিনে পাঠ বন্ধ থাকিত। এই সম্বন্ধে গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম দেখা গিয়া থাকে।

খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে অধ্যাপনা-কার্য্য চলিত, তৎসম্বন্ধে এই চিত্রই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। এখন বর্ত্তমান সময়ে এই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর কি কি অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

১৮৭৮ অব্দের ৮ই জুন ষড়্দর্শনচিন্তনিকার সুশিক্ষিত-সম্পাদক মহাশয় পুণা হইতে যে পত্র লিখেন, তাহা এই—

"যদি ঋগ্বেদ পাঠক বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়ী হন, তাহাহইলে তাঁহার দশ গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্যূন ৮ বৎসর লাগে। দশগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে। যথা—

১। সংহিতা বা স্তোত্র।

২। ব্রাহ্মণ। যজ্ঞাদি সম্বন্ধে গদ্য গ্রন্থ।

৩। আরণ্যক বা অরণ্য গ্রন্থ।

৪। গৃহ্যসূত্র। সাংসারিক আচার ব্যবহারের নিয়ম।

(৫-১০) ষড়ঙ্গ, শিক্ষা, জ্যোতিষ, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু ও নিরুক্ত, এবং ছন্দ।

এই ৮ বৎসরের মধ্যে অনধ্যায় বা পর্ব্বদিন বাদে শিষ্যকে সকল দিনই পড়িতে হয়। এক চান্দ্র বৎসরে ৩৬০ দিন, সুতরাং ৮ বৎসরে ২৮৮০ দিন হয়। তন্মধ্যে ৩৮৪ পর্ব্বদিন বাদ দিলে ৮ বৎসরে ২৪৯৬ দিন পাঠাভ্যাসের জন্য থাকে।

এখন এই দশ গ্রন্থে স্থূল স্থূল হিসাবে ২৯,৫০০ শ্লোক থাকিলে ঋগ্বেদ-পাঠককে প্রতিদিন ১২টী করিয়া শ্লোক পড়িতে হয়। প্রতি শ্লোকে ৩২টী করিয়া শব্দ আছে।

আমি কিরূপে এতদ্বিষয়ক বিবরণ জানিয়াছি, তাহা বলা আবশ্যক। পুণা নগরীতে বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভা নামে আমাদের একটী সভা আছে। এই সভা প্রতিবৎসর সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য অনেক পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকেন। ষড়্দর্শন, অলঙ্কার শাস্ত্র, বৈদ্যক শাস্ত্র, জ্যোতিষ, পদ ক্রম, ঘন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে বেদ পাঠ, এবং ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে দশ গ্রন্থে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, সাধারণতঃ তৎসমুদয়ের জন্য এই সকল পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। একটী পরীক্ষক-সমিতি

পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন করেন। প্রক্রিয়া (শাস্ত্রের উপপত্তি-মূলক জ্ঞান,) উপস্থিতি (শাস্ত্রগত সাধারণ জ্ঞান), এবং গ্রন্থার্থ পরীক্ষা (ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে বাক্য-রচনা) এই তিন বিষয়ে প্রত্যেক শাস্ত্রে তিন প্রকার প্রশ্ন দেওয়া হয়। পুণার সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকেরা ইহাতে প্রায় ১০০০ সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া থাকেন। গত ৮ই মে যে সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৫০ জন সংস্কৃত ও বৈদিক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুণা নগরীর এক মহামান্য প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি।"

এতৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর, এম্,এ, (ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী ১৮৭৪, পৃঃ ১৩২) আর একটী আমোদ-জনক বিবরণ লিখিয়াছেন;—

"প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-বংশ কোন এক বিশেষ বেদ এবং বেদের কোন এক বিশেষ শাখা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। সেই সেই বেদের সূত্র অনুসারে এই ব্রাহ্মণ বংশের গার্হস্থ্য ব্যাপারও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের মধ্যে বেদ কণ্ঠস্থ করিবার নাম "বেদপাঠ করা"। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আবাসভূমি বারাণসী ব্যতীত উত্তর ভারতের আর সকল স্থানে এই বেদ পাঠ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে কেবল শুক্ল যজুর্ব্বেদ এবং তাহার মাধ্যন্দিন শাখা প্রচলিত আছে। গুজরাটেও অনেককে বেদাধ্যয়ন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশেই ইহার বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। তৈলঙ্গেও বেদের আলোচনা হইয়া থাকে। তৈলঙ্গে অদ্যাপি এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা সমস্ত জীবন বেদাধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা দান প্রাপ্তির জন্য সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেন। সম্পন্ন লোকেরা তাঁহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদিগকে অর্থ দিয়া থাকেন। এই বেদের মধ্যে কৃষ্ণযজুঃ এবং আপস্তম্ব সূত্রই অধিক প্রচলিত। এখানে এমন সপ্তাহ নাই, যে সপ্তাহে তৈলঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা গ্রহণ জন্য আমার নিকট না আইসেন। আমি এই সুযোগে তাঁহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আমার নিকট যে মুদ্রিত বেদ আছে, তাহার পাঠের সহিত তৎসমুদয়ের তুলনা করিয়া থাকি।

'বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আচার ভেদে সাধারণতঃ গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহস্থেরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং ভিক্ষুকেরা ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বেদ পাঠ করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

'সন্ধ্যাবন্দনার প্রণালী বেদ-বিশেষে বিভিন্ন হইলেও উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ গায়ত্রী মন্ত্র—"তৎসবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি, সকলকেই আবৃত্তি করিতে হয়। কেহ ৫ বার, কেহ ১০ বার, কেহ ২৮, কেহ বা উহা ১০৮ বার অবৃত্তি করেন।

'এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেই প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে উহা সকলেরই কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। ঋগ্‌বেদীদিগকে উহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্তোত্র, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভের অংশ, ঐতরেয় আরণ্যকের পাচ অংশ, যজুঃসংহিতা, সাম-সংহিতা, অথর্ব্বসংহিতা, আশ্বলায়ন কল্প সূত্র,নিরুক্ত,ছন্দ, নিঘণ্টু, জ্যোতিষ, শিক্ষা, পাণিনির সূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মহাভারত এবং কণাদ, জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্র আবশ্যক হয়।

'যে সকল ভিক্ষুক সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম স্তোত্র পাঠ করিবার পরে ও ইচ্ছামত পরের অনেক স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

'যাজ্ঞিক বলিয়া কতকগুলি ভিক্ষুক আছেন। তাঁহারা পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতি দক্ষ। কিন্তু ভিক্ষুকদের মধ্যে বৈদিক নামে আর এক সম্প্রদায় আছে। ইহাঁদের অনেকে আবার যাজ্ঞিক। বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা এবং উহা অভ্রান্ত রূপে পাঠ করাই ইহাঁদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভাল ঋগ্বেদী বৈদিকের সংহিতা, স্তোত্রের পদ, ক্রম, গতা,ঘন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,আরণ্যক, কল্প এবং আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র, নিঘণ্টু নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, শিক্ষা এবং পাণিনির ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ থাকে। তাঁহাকে জীবিত বৈদিক পুস্তকালয় বলা যাইতে পারে।

'স্তোত্র সমূহের বিন্যাসের জন্য সংহিতা, পদ, ক্রম, গতা ও ঘন এই ভিন্ন ভিন্ন নাম স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে।

'সংহিতাতে সমস্ত কথাই সংস্কৃতের উচ্চারণ অনুসারে যুক্ত হইয়াছে।

"পদে" বাক্য সকল বিভক্ত এবং সমাসবাক্য বিযুক্ত হইয়াছে।

'মনে করুন এক পঙ্ক্তিতে এগারটী কথা আছে। সন্ধির সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া তৎসমুদয় ক্রমে এইরূপ বিন্যস্ত হয় ঃ—

১, ২ ; ২ ৩ ; ৩ ৪ ; ৪, ৫ ; ৫, ৬ ; ৬; ৭ ; ৭ ৮ ; ইত্যাদি। প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ বাক্যের শেষ কথা ও প্রত্যেক বাক্যার্দ্ধের শেষ কথাও " ইতি " শব্দের সহিত পুনরুচ্চারিত হয়।

সংহিতা, পদ ও ক্রম এই তিনটী অন্নকৌশলময়। এগুলি ঐতরেয় আরণ্যকে ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। এই নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। সংহিতা নির্ভুজ নামে উক্ত হইয়াছে। পদ প্রভিন্ন নামে এবং ক্রম উভয়ং অন্তরেণ অর্থাৎ উভয়ের মধ্য নামে অভিহিত হইয়াছে (১)।

গতায় বাক্যসমূহ নিম্নলিখিত রূপ বিন্যস্ত হইয়া থাকে ঃ—

১,২,২, ১,১,২;২,৩,৩,২,২,৩ ; ৩,৪,৪,৩,৩, ৪; ইত্যাদি। প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও বাক্যার্দ্ধের শেষ দুটী কথা " ইতি " শব্দের সহিত পুনরুচ্চারণ করিতে হয়।

ঘনতে বাক্য-বিন্যাসের নিয়ম ঃ—

১,২,২,১,১,২,৩,৩,২,১,১,২,৩;২,৩,৩,২,২,৩, ৪,৪,৩,২,২,৩ ; ২,৩,৩,২,২,৩,৪, ৪,৩, ২, ২, ৩,৪;৩, ৪,৪, ৩, ৩, ৪,৫,৫,৪, ৩, ৩, ৪, ৫; ইত্যাদি।

প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও বাক্যার্দ্ধের শেষ দুটী কথা "ইতি" শব্দের সহিত পুনরায় আবৃত্তি করিতে হয়।

যথাঃ—৭,৮,৮,৭,৭,৮ ; ৮ ইতি ৮; আবার ১০, ১১, ১১, ১০, ১০, ১১; ১১ ইতি ১১। ইহাতে সমাস-বাক্য বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

---

(১) ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য। পৃঃ ৩। সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে তিন সংহিতা, শুদ্ধা, অদুঃস্পৃষ্টা এবং অনির্ভুজা নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথমটী পবিত্র স্থানে স্নানের পর পঠিতব্য। দ্বিতীয়টী উচ্চারণের দোষ না থাকে, এমন ভাবে পড়িতে হইবে। বাহুদ্বয় হাঁটুর বাহিরে প্রসারিত হইতে না পারে, এই ভাবে থাকিয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা অঙ্গুলিতে আঘাত দিয়া স্বরগ্রাম প্রকাশ পূর্ব্বক, এই শেষোক্ত "অনির্ভুজা" পাঠ করিতে হইবে।

'পবিত্র বেদ রক্ষা করাই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর এক মাত্র উদ্দেশ্য। বেদ পাঠ কেবল আবৃত্তি মাত্র নহে। ইহাতে স্বরগ্রাম ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ-প্রণালীর প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ দিতে হয়। স্বরের উচ্চতা ও নীচতা দ্বারা বিভিন্ন উচ্চারণ-প্রণালী দেখাইতে হয়। ঋগ্‌বেদী, কম্ব এবং অথর্ব্ববেদীরা তৈত্তিরীয়দিগের অবলম্বিত প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া ভিন্নরূপে ইহা করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনেরা দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিয়া স্বরগ্রামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করেন।

'ঋগ্বেদীরা ঘন পর্য্যন্ত না যাইয়া সংহিতা, পদ ও ক্রমেতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তৈত্তিরীয়দিগের মধ্যে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণও আরণ্যক শিক্ষা করণার্থ স্তোত্রের ঘন পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদী প্রাতিশাখ্যও পড়িয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বেদাঙ্গে মনোযোগ দেন না। ফলতঃ ঋগ্বেদী ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ই উহার আলোচনা করেন না। মাধ্যন্দিনেরা তাঁহাদের স্তোত্রের সংহিতা, পদ, ক্রম, গতা ও ঘন পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখেন। কিন্তু তাঁহাদের পাঠ ইহাতেই শেষ হইয়া থাকে। প্রায় কাহাকেও সমগ্র শতপথ ব্রাহ্মণ কণ্ঠস্থ করিতে দেখা যায় না। অনেকে উহার কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়াই নিরস্ত থাকেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অথর্ব্ববেদীর সংখ্যা অতি অল্প। সামবেদীগণের সাম গান করিবার নানা উপায় আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদও অভ্যাস করিয়া থাকেন।

'শ্রোত্রিয়, সাধারণতঃ শ্রৌতী নামে আর এক শ্রেণীর বৈদিক আছেন। যজ্ঞ-সম্পাদন-কার্য্যে ইহাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। ইহাঁরা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট বৈদিক। অধিকন্তু ইহাঁরা কল্প সূত্র ও প্রয়োগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

'কোথাও আবার অগ্নিহোতৃদিগকেও দেখা যায়। তাঁহারা তিনটী যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন, এবং পাক্ষিক ইষ্টি ও চাতুর্মাস্য সমাধান করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে সুমহান্ সোমযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান দেখা যায়। কিন্তু তাহা কদাচিৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণে স্মৃতি-শক্তির কতদূর প্রয়োজন, উপরি উদ্ধৃত

বিষয়গুলি দ্বারা তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রাচীনকালে বেদ যেমন প্রস্তুত হইয়াছে, অদ্যাপি তেমনই রহিয়াছে। উহাতে একটীও প্রকৃত পাঠান্তর ঘটে নাই, এমন কি ঋগ্বেদে একটীও অস্পষ্ট স্বর-প্রণালী দেখা যায় না। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে বৈদিক পাঠের অপভ্রংশ দেখা যায় বটে, কিন্তু বেদের মূল অবধারিত হওয়ার সময় হইতেই বোধ হয়, ঐ অপভ্রংশ গুলিও বেদের প্রকৃত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় এইরূপ অনেক পাঠ দৃষ্ট হয় এবং তৎসমুদয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিচারও দেখা যায়।

ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নে বেদের প্রমাণ সম্মান সহকারে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত এই সম্মানের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের ন্যায় বেদের প্রমাণ অবিসংবাদিত নহে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের বাইবল্ ও মুসলমানদিগের কোরাণের ন্যায়, বেদ শাস্ত্রানুগত হিন্দুদিগের সর্ব্ব প্রধান, অভ্রান্ত, ও মহা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

স্পৃশ্য, ঈষৎস্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য পদার্থের আরাধনা।

কোথা হইতে আমরা আসিতেছি, কোথায় উপনীত হইবার ইচ্ছা করিতেছি এবং এজন্য কোন পথই বা অবলম্বনীয় প্রথমতঃ তাহাই স্থির করা আবশ্যক। আমরা আপাততঃ ধর্ম্মভাবের প্রথমোৎপত্তির স্থলে উপস্থিত হইতে চাহি। কিন্তু এই অভিলষিত স্থলে উপস্থিত হইতে হইলে এক দিকে পৌত্তলিকতা ও অপর দিকে আদিম প্রকটীকরণ, এই দুইটী পূর্ব্ব-প্রসারিত পথ উপেক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয়, সেই জ্ঞান হইতে যাত্রা করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলে, পরিশেষে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনন্ত ভাবব্যঞ্জক ও অপ্রাকৃত স্বর্গীয় বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিতে পারে, আমাদিগকে এরূপ কোন পথেই অগ্রসর হইতে হইতেছে।

ধর্ম্মের প্রমাণ কদাপি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

জগতের সকল ধর্ম্মে নানা রূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতিই যে ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ নহে, সকল ধর্ম্মেই তাহার ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। এমন কি অসভ্যজাতির পৌত্তলিকতাতেও উহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অসভ্যগণ সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রস্তর, মৃত্তিকা বা বৃক্ষাদির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতেই যে, তাহারা কেবল ঐ সামান্য জড়েরই পূজা করে, এমত নহে। তাহারা যাহার প্রকৃত পূজা করে, তাহাতে সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির বিদ্যমানতা ভিন্ন আরও কোন বিষয় আছে। এই "আরও কোন বিষয়" আমাদের হস্ত, আমাদের কর্ণ, কিংবা আমাদের চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর।

কিরূপে এই ভাবের উৎপত্তি হইল? কোন্ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া-বলে এই ধারণার আবির্ভাব হইল যে, আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অগোচর —অদৃশ্য, অনন্ত, অমানুষ, স্বর্গীয় কোন বিষয় আছে? স্বীকার করিলাম;

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অদৃশ্য, অনন্ত ও স্বর্গীয় বলিয়া কল্পনা করা অবশ্য ভ্রমাত্মক, কিন্তু মানব অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধিমান হইয়াও সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল এই বিষয়ে উন্মত্ত ভাবে চলিতেছে কেন? ইহার কারণ জানিবার জন্য আমাদের মনে স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই কৌতূহলের তৃপ্তি সাধনে অসমর্থ হইলেই ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক সমালোচনার অযোগ্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

বাহ্য প্রকটীকরণ।

কেবল এক কথায় এ গুরুতর বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে, এরূপ মনে করিলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির বিষয়াতীত ধর্ম্মভাব সকল কোন প্রকার বাহ্য প্রকটীকরণ বশতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। জগতে এরূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম বিরল—একথাটি সহজ ও শুনিতে মিষ্ট বটে। কিন্তু এ যুক্তিটী পৌত্তলিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলেই বুঝা যাইবে যে, উহা ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি ও উন্নতি বিষয়ক গবেষণার পক্ষে যে সকল বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিতে কত অল্প সাহায্য করিতে পারে। যদি আসান্টী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কেমন করিয়া তোমার উপাস্য প্রস্তরাদিকে কেবল প্রস্তর না ভাবিয়া অন্যরূপ কল্পনা করিয়া থাক?" এবং তাহাতে ঐ আসান্টী পুরোহিত যদি এই উত্তর দেয় যে, "আমার উপাস্য আমাকে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, এবং ঐরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন," তবে আমরা আর কি বলিতে পারি? আর ইহাই যদি আদিম ঈশ্বরোপদেশের উপপত্তি বলিয়া বোধ হয়, তবে দেবতারা যে আছেন মানুষ তাহা কিরূপে জানিল? এপ্রশ্নের উত্তর, "দেবতারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আছেন"।

কি অসভ্য, কি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেবতাসম্বন্ধীয় এরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। আফ্রিকাদেশীয় লোকদের মধ্যে এরূপ একটী প্রবাদ আছে

যে, এক্ষণকার অপেক্ষা পূর্ব্ব কালে স্বর্গধাম মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী ছিল, এবং দেবপ্রধান বিশ্ববিধাতা তখন সময়ে সময়ে স্বয়ং লোকসমাজে উপস্থিত হইয়া জ্ঞান দান করিতেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন (১)। হিন্দু (২) এবং গ্রীকগণও (৩) প্রায় এইরূপ বলেন। এই উভয় জাতিরই বিশ্বাস আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেবতাদিগের সহিত দেখা করিতে ও কথা কহিতে পারিতেন। দেবতাগণের সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে ঐ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কিরূপে আদিম মনুষ্যগণের মনে দেব-কল্পনা বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর কোন পদার্থের ধারণা উদিত হইয়াছিল? সমস্যা এই যে, মানুষ 'ঈশ্বর' এই বিশেষক কিরূপে জানিতে পারিল? প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান বা অদৃশ্য কোন পদার্থে ঐ বিশেষক আরোপিত করিবার পূর্ব্বে মানুষ নিশ্চয়ই উহা জানিতে পারিয়াছিল।

অন্তর-প্রকটীকরণ।

যখন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অসীম অদৃশ্য এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া বলক্রমে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তখন এবিষয়ের বিশদীকরণ জন্য আর একটী কথার অবতারণা হইতেছে। কথিত আছে, মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা কুসংস্কারমূলক একটী সাধারণ সংস্কার আছে। ঐ সংস্কার-প্রভাবেই মানুষ অনন্ত, অসীম, অদৃশ্য এবং ঐশ্বরিক ধারণা পরিগ্রহ করিতে পারে। ফলতঃ এরূপ যুক্তি সরল পৌত্তলিক ভাষায় অনুবাদ করিতে গেলে বোধ হয়, আমরা আমাদের নিজ আদিমত্ব সম্বন্ধে একান্ত বিস্মিত হইব।

যদি কোন আসামী কহে যে, তাহার এমন একটী সংস্কার আছে,

---

(১) ওয়েইজ, ২য়। ১১১ পৃঃ।

(২) ঋগ্বেদ ১ম, ১১৯, ২ ; ৭ম, ৭৬, ৪ ; মুইর, "সংস্কৃত মূল" ৩য়, ২৪৫ পৃঃ।

(৩) Homerische Theologie.p.151

যদ্দ্বারা সে তাঁহার উপাস্য প্রস্তর খণ্ডের পাষাণত্ব ব্যতীতও এমন কিছু দেখিতে পায়, যাহা কোনক্রমে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাহা হইলে হয়ত একথা শুনিয়া আমরা ইয়ুরোপীয় জ্ঞান-মত্ততায় বিস্মিত হইব। আমরা এমন মনে করি না যে, জ্ঞানশূন্য কি অশিক্ষিত অসভ্য হইতে এই বিষয় শিখিলে আমাদের উপকার আছে। ধর্ম্ম ভাবোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া অন্যান্য মানসিক বৃত্তির উপর একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার স্বীকার করা, আর ভাষার মূল নির্ণয় বা গণিত প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া ভাষার সংস্কার বা গণিতের সংস্কার কল্পনা করা ঠিক একই কথা। কোন কোন পদার্থের নিদ্রা উৎপাদন করিবার শক্তি আছে বলিয়া উহাতে নিদ্রা উৎপাদন করিয়া থাকে। এভাবে ধর্ম্মোৎপত্তির ব্যাপারে সংস্কারের কল্পনা সর্ব্বথা অযৌক্তিক।

এই দুইটী উত্তরে যে অন্তঃ কণা প্রমাণ সত্যও নাই, একথা একবারে অস্বীকার করা যায় না। ঐ কণাপ্রমাণ সত্যটুকু স্তূপাকার অসত্য আলোড়ন করিয়া বাছিয়া বাহির করিতে হয়। সংক্ষেপে আদিম প্রকটীকরণ শব্দে কি বুঝায় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার শব্দেই বা কি বুঝায়, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ শব্দ আবার আমরা ব্যবহার করিলেও করিতে পারি। কিন্তু উহা এত অধিক বার ভুল অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে তৎসমুদয় আর ব্যবহার না করাই ভাল।

যে সেতু অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম-ভাবোৎপত্তির মূল অন্বেষণের বাধা বিঘ্ন সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যাইত, এক্ষণে সেই সেতু ভস্মসাৎ পূর্ব্বক আদিম প্রকটীকরণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মভাবোৎপত্তির মূল অনুসন্ধানে তৎপর হওয়াই আবশ্যক। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী, পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, এই জগতের সত্ত্বা ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্যে সপ্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে ইহাই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য যে, কেমন করিয়া আমরা পর জগতে যাই, অথবা কেমন করিয়াইবা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তথায় যাইতে পারিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয়গণ ও তৎসমুদয়ের সাক্ষ্য।

আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, তাহাকেই আমরা যথার্থ ও পরিদৃশ্যমান বলিয়া থাকি। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় কি না, আপাততঃ সে কথার প্রয়োজন নাই। বরক্লি, হিউম্ এমন কি এমপেদক্লেস্ বা জেনোফেনের সহিতও আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না। আমাদের এখন কেবল তৃতীয় বা চতুর্থ যুগস্থ নীলনদের তীর-বাসী জাতিবিশেষের সহিত তর্কের প্রয়োজন। তাহারা যে কঙ্কাল বা অস্থিখণ্ড সংস্পর্শ করিতে, আঘ্রাণ করিতে, আস্বাদন করিতে, দেখিতে এবং আবশ্যক হইলে উহা ভগ্ন করিয়া সেই ভঙ্গন-শব্দ শুনিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে আর কোন বিষয় ইহা অপেক্ষা প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চেন্দ্রিয়গণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন এই তিনটী ইন্দ্রিয় এক শ্রেণীভুক্ত এবং ইহাদিগকে প্রাচীন ইন্দ্রিয় বলা গিয়া থাকে। শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহাদিগকে আধুনিক বা নূতন ইন্দ্রিয় কহে (১)। পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে প্রথম তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী। শেষোক্ত দুইটী সেরূপ না হওয়ায় বা সন্দেহাত্মক হওয়ায় প্রমাণ-বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ।

যাথার্থ্য নিরূপণে স্পর্শেন্দ্রিয়কে অব্যর্থ প্রমাণ স্বরূপ ধরিতে হয়। ইহার ন্যায় স্বতন্ত্র-ভাব-যুক্ত ও পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয় আর নাই। ইহার পুষ্টিতে ও স্বভাবে ইহাকে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণনা করা যায়। অধিকতর স্বতন্ত্র-ভাব যুক্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ঘ্রাণ ও আস্বাদনকে স্পর্শের অব্যবহিত পরে গণনা করিতে হয়। সত্যসমর্থনের জন্য পশুদিগকে প্রথমটীর ও বালক-দিগকে দ্বিতীয়টীর পরিচালক দেখা গিয়া থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে ঘ্রাণশক্তিকেই এক মাত্র প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া দেখা যায়। মনুষ্যে বিশেষতঃ সভ্য-সমাজে এই অভিপ্রায়ে উহার পরিচালনা প্রায়ই দেখা যায় না। কোন পদার্থের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে

(১) মুইরহেড প্রণীত "ইন্দ্রিয়-জ্ঞান"।

হইলে বালকগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার অত্যল্পই করিয়া থাকে। উহারা কোন দ্রব্য পাইলে সর্ব্ব প্রথমেই উহা ধরে, কিংবা তুলিয়া লয়, পরে সক্ষম হইলে মুখ-মধ্যে প্রবেশিত করে। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত শেষোক্তটী পরিত্যক্ত হইয়া প্রথমটী অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় জন্য স্পর্শ করা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। যে পদার্থ প্রকৃত, তাহার যে অবশ্য গন্ধ ও আস্বাদ থাকিবে, একথা স্বীকার না করিলেও অনেকে আজ পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, যাহা স্পর্শ-গ্রাহ্য নহে, তাহা প্রকৃত হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ।

ভাষা দ্বারা এই শব্দের অর্থ অবধারিত হইয়াছে। কোন পদার্থের সত্তার আর সন্দেহ নাই, যখন আমরা এই রূপ বলিতে ইচ্ছা করি, তখনই উহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি। রোমকেরা যখন এই বিশেষণ-পদের সৃষ্টি করেন,তখন তাঁহারা ইহার অর্থ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা হস্ত দ্বারা যাহা স্পর্শ বা আঘাত করিতে পারিতেন, তাহাকেই প্রত্যক্ষ কহিতেন। লাতিন Fendo ধাতু আঘাত অর্থে ব্যবহৃত হইত। offendo বা defendo শব্দে ঐ ধাতু অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। Festus একটী প্রাচীন নিষ্ঠান্ত পদ, ইহা Fend এবং tus যোগে নিষ্পন্ন, যেমন Fus-tis, যষ্টি, Fos-tis, (১) Fons-tis, Fond-tis.

Fustis যষ্টি, এই কথার সঙ্গে Fist (২) কথার কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরেজীতে F অক্ষরটী লাতিন ও গ্রীকের P স্থানীয়। গ্রীক pux কথার সঙ্গে ইংরেজী Fist কথার সম্ভবতঃ সংশ্রব থাকিবে। লাতিন Pugna যুদ্ধ, আদৌ মল্লযুদ্ধ এবং Pugil মল্লযোদ্ধা; লাতিনে Pungo এই ক্রিয়া পদে এই সমস্ত কথার ধাতু দৃষ্ট হয়। এমতে মল্লযুদ্ধ হইতে জ্যামিতির অদৃশ্য বিন্দুর এবং ন্যায়শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের নামকরণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতু হইতে Fendo, Fustis এবং Festus পদ গুলি সিদ্ধ

---

(১) Corssen, 'Aussprache' I. 149; II. 190.

(২) Grimm, 'Dictionary,' S. V. Faust.

হইয়াছে। উহা ধন্ বা হন্, গ্রীকে উহা আঘাত করা, সংস্কৃতে হন্ বধ করা, নিধন, মৃত্যু ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক, জগতের প্রাচীন অধিবাসীরা কোন্ কোন্ পদার্থকে প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত কহিতেন। প্রস্তর, অস্থি, কড়ি, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, জীব, ও মনুষ্য প্রভৃতিই প্রকৃত বলিয়া উক্ত হইত। কারণ উহাদিগকে হস্তদ্বারা আঘাত বা স্পর্শ করা যাইত; বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কেই তাঁহারা প্রকৃত কহিতেন।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের স্পৃশ্য এবং অর্দ্ধ-স্পৃশ্য, এই দুই বিভাগ।

(আমরা এই আদি জ্ঞান ভাণ্ডারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, (১) যে সকল সামগ্রীকে প্রকৃষ্ট রূপে স্পর্শ করা যায়। যথাঃ—প্রস্তর, হাড়, কড়ি, পুষ্প, ফল, বৃক্ষ-শাখা, জলবিন্দু, পৃথ্বীপিণ্ড, পশুচর্ম্ম, এবং জীবগণ। এই সকল পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর নহে। উহাদের মধ্যে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই। উহারা আদিম সমাজে অতি পরিচিত, কথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

(২) বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী ও পৃথিবীর সম্বন্ধে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপ বলা যাইতে পারে না।)

বৃক্ষ।

এমন কি প্রাচীন বনের বনস্পতিতেও কোন অপূর্ব্ব বিস্ময়-সূচক পদার্থ আছে। উহার সুগভীর মূল আমরা স্পর্শ করিতে পারি না। উহা আমাদের শিরোভাগের অতি উর্দ্ধদেশে শোভা পায়। (আমরা উহার তলায় দাঁড়াইয়া উহাকে স্পর্শ করিতে ও অবলোকন করিতে পারি। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গণ এক কালে উহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।) আমরা অট্টালিকার কাষ্ঠকে মৃত মনে করিয়া থাকি। কিন্তু বৃক্ষকে জীবিত বলিয়া থাকি। প্রাচীনেরা এই রূপই বোধ করিতেন। তাঁহারা উহাকে

জীবিত ভিন্ন আর কিই বা বলিবেন? কিন্তু তাঁহারা উহার শ্বাস প্রশ্বাস বা সজীব হৃদয় কল্পনা করিতেন না। কিন্তু এই বৃক্ষকে তাঁহাদের সমক্ষে অঙ্কুরিত হইতে, বৃদ্ধি পাইতে, শাখা, প্রশাখা, পত্র ও ফল পুষ্প প্রসব করিতে, শীত কালে পত্র ত্যাগ করিতে এবং অবশেষে উহা কর্ত্তিত বা মৃত হইতে দেখিয়া উহাকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অগ্রাহ্য কোন অজ্ঞাত ও বিস্ময়-সূচক পদার্থের আরোপ বা কল্পনা করিতেন। (ভাবুকের কাছে এই অজ্ঞাত এবং বুদ্ধির অগম্য পদার্থ, বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন একদিকে উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইত, তেমনি আবার অপর দিকে উহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়াতীত হইয়া উঠিয়াছিল।)

পর্ব্বত।

পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও পৃথিবী অবলোকন করিয়াও মনে এই রূপে বিস্ময়ের অবির্ভাব হইত। পর্ব্বতের অধোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উহার অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আপনাদিগকে প্রকাণ্ড রাক্ষস সমক্ষে বামন বলিয়া বোধ হয়। অনেক পর্ব্বত একবারেই দুরতিক্রমনীয়, উপত্যকা-বাসীরা উহাদিগকে তাহাদিগের ক্ষুদ্র জগতের সীমা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। উষা, সূর্য্য, চন্দ্র, ও তারকাগণ বোধ হইত যেন পর্ব্বত হইতে উঠিতেছে। গগনমণ্ডল বোধ হইত যেন উহাদের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। উহাদের অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি দৃষ্টিপাত করিলে উহা অপর জগতের দ্বার-দেশ বলিয়া বোধ হইত। যেদেশে বৈদিক স্তোত্র সর্ব্ব প্রথমে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং যে দেশে ডাক্তর হুকর একস্থানে দাঁড়াইয়া ২৮,০০০ ফুট উচ্চ ২০টী তুষার শৃঙ্গোপরি বিশাল নীলিম গগনমণ্ডল ১৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিয়াছিলেন, একবার তাহার দৃশ্য ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, (প্রকৃত অনন্তের সমক্ষে এবম্বিধ মন্দির সন্দর্শনে অতি সুদৃঢ় অন্তঃকরণও কেমন কম্পিত হইয়া উঠিতে পারে।)

নদী।

পর্ব্বতগণের অব্যবহিত পরেই জলপ্রপাত ও নদীর উল্লেখ করা উচিত। নদী নামে প্রকৃত কোন পদার্থ বুঝা যায় না। (আমাদের গৃহ-পার্শ্বে প্রতিদিন জলরাশি প্রবাহিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু কখনই সেই সরিৎ বা সমস্ত সরিৎ অবলোকন করিতে পাই না। নদী আপাততঃ পরিচিত বলিয়া বোধ হইলেও উহার অজ্ঞাত উদ্ভব ও পতন-স্থান আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর ও অগম্য।

সেনেকা তাঁহারা এক পত্রে লিখিয়াছেনঃ—"বড় বড় নদীর উৎপত্তির বিষয় মনে হইলে ভক্তির উদ্রেক হয়। অন্ধকার হইতে হঠাৎ নিঃসৃত কোন নদীর পূজার জন্য বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকি। উষ্ণ প্রস্রবণের পূজা করি, এবং কোন কোন হ্রদের জল অতি গভীর ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আমরা পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।"

নদী হইতে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সম্পাদন, মেষপালন, আশ্রয় দান, ও শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষণ প্রভৃতি তীরবাসীর যে সকল উপকার হইয়া থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিলে এবং প্রচণ্ড নদীর বেগে জীব-ধ্বংস, উহার প্রবল তরঙ্গে লোকের হঠাৎ নিমজ্জন ও সর্ব্ব নাশের কথা মনে না হইলেও দূর-সমাগত অপরিচিত উদাসীনের ন্যায়—কোথা হইতে আসিয়াছে, এবং কোথায় যাইবে, তাহা অবিদিত—এই বেগবতী নদীর উপস্থিতি অবলোকন মাত্রেই প্রাচীন জগৎবাসিগণের মনে তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূতা ক্ষুদ্র পৃথিবী ভিন্ন অন্য দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিত এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অদৃশ্য, অনন্ত ও স্বর্গীয় শক্তিতে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেন।)

পৃথিবী।

যে ধরা-পৃষ্ঠে আমরা দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যখন উহাকে এক খণ্ড প্রস্তর বা একটী আত্মা স্বরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তখনই উহা

আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়াতীত, কিংবা অন্ততঃ প্রাচীন ভাষাপ্রণেতাদের সম্বন্ধেও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া উঠে। (তাঁহারা একটী নাম যোজনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই নামে কি পর্য্যন্ত বুঝাইত, তাহা অবধারিত বা সীমাবদ্ধ না হইয়া যেন অসীম ও কিয়ৎপরিমাণে দৃশ্য, প্রত্যক্ষ এবং অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য এমন পদার্থবিশেষ বুঝাইত।)

অতি প্রাচীন কালে আদিম অধিবাসীগণ এসম্বন্ধে যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ সামান্য বলিয়া বোধ হইলেও তাহাতে যে যথেষ্ট উপকার এবং উহাই যে মানব-জ্ঞানের পথ প্রদর্শক-প্রায় হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। (যাহা সীমাবদ্ধ নহে, যাহা মুষ্টি-মধ্যে ধরা যায় না এবং যাহা সর্ব্বত্র দর্শন করা যায় না, আদিম অধিবাসী কর্ত্তৃক নাম-কল্পনায় ঠিক এই কয়টী অবস্থা অনুভূত না হইয়া একটী সংকীর্ণ ভাবমূলক কি সীমা-বিশিষ্ট জ্ঞান-জ্ঞাপক শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য উদ্ভাবনাই মানবকে ক্রমে অজ্ঞাত, অনন্ত, ও স্বর্গীয় পদার্থ-বাচক শব্দের ও ভাব-পূর্ণ সংজ্ঞা-দান-ক্ষমতার প্রথম উচ্ছ্বাস দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঈষৎ-স্পৃশ্য পদার্থ।

স্পৃশ্য পদার্থের অনুভূতি গুলিকে প্রথম শ্রেণী ভুক্ত করা গিয়াছে। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত গুলিকে প্রথম হইতে পৃথক করিবার জন্য ঈষৎ-স্পৃশ্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণী অতি বিপুল এবং এই শ্রেণীভুক্ত অনুভূতির মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। একটী পুষ্প কিংবা ক্ষুদ্র বৃক্ষকে কখন কখন এই শ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কেন না ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, এমন কোন পদার্থ ইহাতে বর্ত্তমান নাই। আবার এই শ্রেণীভুক্ত পদার্থেই এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহার অননুভূত অংশ পরিদৃশ্যমান অংশ হইতে অনেক অধিক। পৃথিবী ইহার এক উদাহরণ স্থল। আমরা উহা স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং শ্রবণাদি সকলই করিতে পারি বটে;

কিন্তু উহাতে উহার সমগ্র অংশে এবং সমস্ত অবস্থায় অনুভূতি জন্মে না। আমরা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র অনুভব করিয়াই বিরত হই। সুতরাং আদিম জগৎবাসীরাও পৃথিবীর সামগ্র্য ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আবাস-ভূমির সন্নিহিত ভূখণ্ড, ক্ষেত্রের তৃণ, বন, বা নয়ন-পথের শেষ সীমাস্থিত কোন পর্ব্বত মাত্র অবলোকন করিতেন। তাঁহার নয়নপথের বাহিরে যে অসীম বিস্তৃতি বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা তিনি স্বাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখিলেও মানস-নেত্র দ্বারা দেখিতেন, এমন বলিলেও বলা যায়।

ইহা কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। আমরা স্বয়ং ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে পারি। যখন আমরা কোন উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের চক্ষু চূড়া হইতে চূড়ান্তরে ও অভ্র হইতে অভ্রান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্রষ্টব্যের অসদ্ভাব না হইলেও কেবল চক্ষুর দূরদর্শনে অসামর্থ্য প্রযুক্ত আমরা ক্ষান্ত হই। নয়নপথাতীতে যে অসংখ্য দ্রষ্টব্য বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা যে কেবল যুক্তি দ্বারা অনুভব করি, এমত নহে। বস্তুতঃ আমরা উহা অবলোকন ও অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের দর্শনের অসীম শক্তি নাই, ইহাতে আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস থাকায় পরজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কোন সীমা অনুভব করিতে হইলে ঐ সীমান্তে কি আছে তাহাও অনুভব করিতে হয়।

যে ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইলে এই ভূতার্থ গুলি স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, অসঙ্কুচিত ভাবে তাহা করা আবশ্যক। আমাদের সম্মুখে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সমক্ষে দৃশ্য ও স্পৃশ্য অনন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু কেবল সীমাতীতই অসীম নহে, যাহার সীমা অবধারণে ও অবলোকনে আমরা অসমর্থ, তাহাকেও আমরা এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনন্ত বলিয়াছেন।

অস্পৃশ্য পদার্থ।

এই সকল ঈষৎ-স্পৃশ্য পদার্থগুলিকে ইচ্ছাক্রমে আর কতকগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, এবং উহাদের অনেকের অংশবিশেষ হস্ত দ্বারাও স্পর্শ করা গিয়া থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর আর একরূপ পদার্থ আছে। তাহারা আমাদের চক্ষু-কর্ণের গোচর হইলেও আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের অগোচর। তবে উহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইবে?

দৃশ্য অথচ অস্পৃশ্য পদার্থ আছে, তাহা শুনিলে আপাততঃ বিস্ময় জন্মে। কিন্তু এইরূপ পদার্থে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বলা যায়। আদিম অসভ্যেরা যে উহা দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। মেঘ প্রায় সকলেরই দৃশ্য, কিন্তু স্পৃশ্য নহে, এবং পর্ব্বত-সমাকীর্ণ দেশে মেঘ অর্দ্ধস্পৃশ্য পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইলেও আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি আমাদের অস্পৃশ্য রহিয়াছে। এই শ্রেণীর পদার্থকে অস্পৃশ্য বলা যায়।

এই রূপে সামান্য বিজ্ঞান-বলে আমরা তিন প্রকার পদার্থ নির্ণয় করিলাম। উহারা সকলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইলেও উহাদের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে তিনটী স্বতন্ত্র ধারণা হইয়া থাকে।

(১) স্পৃশ্য পদার্থ, যথা, প্রস্তর, কড়ি, অস্থি প্রভৃতি। যে সকল দার্শনিক পৌত্তলিকতাকে সকল ধর্ম্মের আদি বলিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে ধর্ম্মের আদিম উদ্দীপক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা এই স্পৃশ্য পদার্থগুলিকে পূজার সামগ্রী মনে করিতেন।

(২) অর্দ্ধ-স্পৃশ্য পদার্থ, যথা, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও পৃথিবী। এই সকল হইতেই উপদেবতা বা অর্দ্ধদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) অস্পৃশ্য পদার্থ, যথা, আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য্য, উষা এবং চন্দ্র, এই গুলিকে ভবিষ্যৎ দেবতার অঙ্কুর বলিতে পারা যায়।

দেবতাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনগণের প্রমাণ।

দেবতাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন-লেখকেরা কি বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহা দেখা আবশ্যক। এপিকর্ম্মস্, বায়ু, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি ও নক্ষত্রগণকে দেবতা বলিয়াছেন।

প্রদীকশ্ বলিয়াছেন, মিশরদেশীয়গণ যেমন নীলনদকে দেবতা বলিত, প্রাচীনেরা তেমনি, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী নির্ঝর এবং সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য সমস্ত পদার্থকেই দেবতা জ্ঞান করিতেন। বোধ হয় এই জন্য অন্ন লক্ষ্মী বলিয়া, মদ্য বারুণী বলিয়া, জল বরুণ বলিয়া, এবং অগ্নি ব্রহ্মা বলিয়া পূজিত হইত।

কাইসরের এইরূপ ধারণা ছিল যে, জর্ম্মানেরা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির পূজা করিত।

হিরদোতস্ বলিয়াছেন, পারস্য-বাসিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, জল ও মরুতের উদ্দেশে বলি দিত।

কেলসস্ এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পারসিকেরা পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি দিসের উদ্দেশে বলি দিত। দিস্‌কে তাহারা পৃথিবীর বৃত্ত মনে করিত। ইহা দিস্ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ, কিংবা জিউস বা অদোনাই, সাবোথ বা আমন অথবা সিথীয়দিগের পাপা এক কি না, তাহা নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন নাই।

কুইন্তস্ কর্ত্তিয়স্ ভারতবাসিদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে কোন পদার্থকে তাঁহারা সমাদর বা ভক্তি করিতেন, তাহাকেই দেবতা কহিতেন। এমন কি তাঁহারা একটী বৃক্ষ নাশ করাও ঘোর অপরাধের কারণ মনে করিতেন।

বেদের প্রমাণ।

সেকেন্দর সাহের সহচরবর্গ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, বেদের প্রাচীন স্তোত্র গুলি অধ্যয়ন করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের নির্দ্দেশ যথার্থ কি না; যে স্তোত্রাবলী আমাদের সমক্ষে আর্য্য-জগতে মানবগণের কবিতার প্রাচীন অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহা কাহার উদ্দেশে প্রয়োজিত হইত? দেখা যাইতেছে যে বেদের স্তোত্র গুলি প্রস্তরাদি স্পৃশ্য পদার্থে প্রযুক্ত না হইয়া, নদী, পর্ব্বত, মেঘ, পৃথিবী, আকাশ, উষা ও সূর্য্য প্রভৃতি অস্পৃশ্য বা ঈষৎস্পৃশ্য পদার্থের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইহা একটী সামান্য প্রমাণ নহে। আশ্চর্য্য, শত বর্ষ পূর্ব্বে কেহই ইহার প্রতি প্রণিধান করেন নাই। আমরা যে এক দিন, সেকন্দরের আক্রমণের সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-প্রসূত, আর্য্য-সাহিত্য বা সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা, ভারতবাসিদের সম্বন্ধে সেকন্দরের ইতিহাস-লেখকেরা যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিরোধ করিব, কে তাহা মনে করিতে পারিয়াছিলেন ?

এই পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়াই আমাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইবে না। আর্য্যবংশ পৃথগ্‌ভূত হইবার পূর্ব্বে উঁহাদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, ভারতীয় আর্য্য-ভাষার সহিত গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি দেশের আর্য্যগণের ভাষার তুলনা করিয়া আমরা কিয়দংশে সেই ভাষার উদ্ধার করিতে পারি।

আর্য্যভাষা যে অবিভক্ত, তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন আর্য্যেরা নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী, আকাশ, উষা এবং সূর্য্য সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা ও ধারণা করিতেন, আমরা অদ্যাপি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবধারণ করিতে পারি। কারণ যে উপায়ে তাঁহারা উহাদের নামকরণ করিতেন, তাহা আমরা এক প্রকার জানি। (তাঁহারা উহাতে আঘাত, ঘর্ষণ ও মর্দ্দন প্রভৃতির ন্যায় কোন প্রকার চাপল্য বা চাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া উক্ত প্রকৃতির অনুসারে উহাদের নাম নির্দ্দেশ করিতেন। এই আঘাত, ঘর্ষণ প্রভৃতিতে প্রথম হইতেই এক এক প্রকার শব্দ সংযুক্ত থাকিত। পরিশেষে এই শব্দগুলি ভাষা-বিজ্ঞানে ধাতুরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।)

আপাততঃ যতদূর অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে ইহাকে সকল ভাষার ও সকল চিন্তার আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নোয়রি নানা বিসংবাদিত মতে ভীত না হইয়া উহা আমাদিগকে বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রের গুণপনা ও গৌরব সামান্য বর্দ্ধিত হয় নাই (১)।

---

(১) ১৮৭৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের "কন্টেম্পরারি রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রে "কারণের মূল" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয় বিবৃত করিয়াছি। উহাতে অধ্যাপক নোয়রির গ্রন্থের বিষয় সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষার উৎপত্তি।

ক্রিয়াতেই ভাষার প্রথম বিকাশ হয়। আঘাত, ঘর্ষণ, ঠেলন, ক্ষেপণ, কর্ত্তন, যোজন, মাপন, কর্ষণ, বয়ন প্রভৃতি কতকগুলি সংজ্ঞ ক্রিয়ার সহিত একরূপ সাধারণ ধ্বনি পূর্ব্বে যেমন থাকিত, এখনও তেমন রহিয়াছে। এই ধ্বনি প্রথমে অনিশ্চিত ছিল, কালক্রমে উহাই সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল ধ্বনি কেবল ক্রিয়ার সহিত সংসৃষ্ট ছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে "মর্" এই ধ্বনির উল্লেখ করা যাইতে পারে (১)। "মর্" প্রথমে ঘর্ষণ, প্রস্তরসমূহ পরিষ্করণ, অস্ত্রসমূহ তীক্ষ্ণকরণ বুঝাইত। এতদ্দ্বারা বক্তা বা অন্য কাহারও পরিব্যক্তি হইত না। কিছুকাল পরে "মর্" কেবল এই লক্ষণ-বোধক হইল না যে, পিতা স্বয়ং কার্য্য করিতে, ঘর্ষণ করিতে এবং প্রস্তরময় অস্ত্র পরিষ্কার করিতে যাইতেছেন; কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরে এবং নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইয়া উহা এমন লক্ষণবোধক হইয়া উঠিল যে, পিতা তাঁহার সন্তান এবং ভৃত্যদিগকে কাজের সময় অলস হইতে নিষেধ করিতেছেন। আমরা যাহা অনুজ্ঞা বলিয়া থাকি, "মর্"! ক্রমে তাহাই হইল। ইহা প্রথম হইতে কেবল একব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত না, যখন অনেকে এক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকিত, তখন সকলেই ইহা ব্যবহার করিত।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমে আবার অভিনব উপায় অবলম্বিত হইল। "মর্" কেবল অনুজ্ঞাবোধক লক্ষণে পর্য্যবসিত হইল না। পরিষ্কৃত ও সমীকৃত প্রস্তরসমূহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে—সাগরতট হইতে গহ্বর-সমীপে বা বহির্দ্দেশ হইতে কুটীরে অনিবার প্রয়োজন হইলে "মর্" কেবল পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সমানীত প্রস্তর-সমূহের বোধক হইল না, প্রত্যুত যে সকল প্রস্তর খণ্ডীকৃত, তীক্ষ্ণ বা পরিষ্কৃত করা যায়, তাহারও জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। এইরূপে অনুজ্ঞা-বোধক "মর্" কেবল ক্রিয়াতে আবদ্ধ রহিল না, ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েও প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

"মর্" শব্দের এই রূপ ক্ষমতার বিস্তৃতিতে অনেক গোলযোগের উৎপত্তি

(১) Lectures on the Science of Language Vol. II, Page 347.

হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ গোলযোগ না ঘটিতে পারে, স্বভাবতই তাহার জন্য কোন উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

যখন এক "মর্" শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইত, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে তাহা করা যাইত। প্রাচীন সময়ে বিভিন্ন ধ্বনিতে স্বরগ্রামের পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহা সংসাধিত হইত। চীনদেশের ভাষাতে দেখা যায় যে, একবিধ ধ্বনি ভিন্নভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক হইয়া উঠে।

আমরা যাহা সর্ব্বনাম-ধাতু বলিয়া থাকি, তাহাও উল্লিখিত ভিন্নার্থ বোধের একটী উপায়। এই উপায়ে এক "মর্" শব্দে ভিন্নার্থ বোধ হইতে পারে।

এইরূপ একমূল শব্দ সহজ উপায়ে উদ্ভূত হইয়া উচ্চারণ বৈষম্যে মানবের অনুভূতি এবং কল্পনা-পরম্পরায় নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নোয়রির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপাঠে এবিষয় বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যে শব্দ যে ভাবেই উচ্চারিত হউক, শব্দ-বিজ্ঞানে উহার বিশ্লেষণ করিতে গেলে অবশেষে উহার মূল অবধারণ করা যায়।

যাহাহউক, এই সকল বিষয় যদিও ভাষা-বিজ্ঞানের উপযোগী, তথাপি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ইহা একবার পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আদি কল্পনা।

(নদী বলিলে প্রাচীনগণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা স্থির করিতে হইলে, তাঁহারা উহাদের কিরূপ নাম রাখিতেন, তাহা জানা আবশ্যক। তাঁহারা উহাকে যাহা বলিয়া ডাকিতেন, উহাদিগকে তাহাই ভাবিতেন। তাঁহাদের মধ্যে নদীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যথা:— (নদীর দ্রুত অর্থে) সরিৎ, (নদীর শব্দার্থে) ধুনী, সরলভাবে বহিলে সীর, অথবা শর, উহাকে ভূমির উর্ব্বরতা-সম্পাদক ভাবিলে মাতা, এক দেশকে অন্য দেশ হইতে রক্ষা করিতে দেখিলে সিন্ধু ইত্যাদি। নদীর এই সমস্ত নামেই কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। মনুষ্য যেমন দৌড়িয়া থাকে, নদীও তেমনি

দৌড়িতেছে ও তাহার ন্যায় শব্দ করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় কর্ষণ করিতেছে এবং মনুষ্য যেমন রক্ষা করিয়া থাকে, নদীও তেমনি রক্ষা করিতেছে।) নদী সর্ব্বপ্রথমে লাঙ্গল নামে না হইয়া লাঙ্গলকর্ষক নামে অভিহিত হইয়াছে। এমন কি লাঙ্গল বহুকাল হইতে যন্ত্রের পরিবর্ত্তে যন্ত্রচালক বলিয়া অভিহিত হইতেছে। লাঙ্গল, বিভাজক ছেদক ও এবং তন্নিবন্ধন বৃক বা বরাহের নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (১)।

সকল পদার্থই সকর্ম্মক বলিয়া অভিহিত।

(আদিম মনুষ্য কি রূপে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত জড় জগতের রহস্যানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি ইতস্ততঃ নিজ কার্য্যের ন্যায় কার্য্য দেখিয়া তাঁহার স্বীয় কার্য্যবাচক শব্দগুলি ঐ ঐ পদার্থে প্রয়োগ করিতেন।)

ভাষার এই অধোদেশে অলঙ্কার প্রভৃতির অঙ্কুর লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে (কবিকাল্পনিক না বলিয়া চিন্তা ও ভাষার আবশ্যক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করি।)(মনুষ্য স্বয়ং প্রস্তরকে তীক্ষ্ণ করিয়া যখন উহাকে অস্ত্র না বলিয়া আপনার প্রতিনিধি ও "কর্ত্তক" বলিতেন, মানদণ্ডকে মাপক কহিতেন, লাঙ্গলকে বিদারক ও পোতকে পক্ষী কহিতেন, তখন যে নদীকে শব্দকারী, পর্ব্বতকে রক্ষক ও চন্দ্রকে মাপক বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা চন্দ্রকে তাহার আহ্নিক গতির জন্য আকাশ-মাপক মনে করিতেন। চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য-নির্ণয়ে চন্দ্র মনুষ্যের সহায়তা করিতেন। এই রূপে চন্দ্র ও মনুষ্য উভয়েই এক যোগে কার্য্য করিতেন, একত্রে মাপিতেন। যেমন কোন ক্ষেত্র বা কাষ্ঠ-মাপকারীকে মাপক কহা যায় সেই রূপ চন্দ্রও মাস অর্থাৎ মাপক বলিয়া বাচ্য হইতেন। সংস্কৃত "মাস" শব্দই চন্দ্রের প্রকৃত নাম। লাতিনের মেনসিস্ ও ইঙ্গরেজী "মুন" শব্দের সহিত উহার নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়।)

এই গুলি ভাষাতত্ত্ব বুঝিবার অতি সহজ ও অব্যর্থ উপায়। আমরা

(১) বেদে বৃকশব্দে লাঙ্গল এবং ব্যাঘ্র উভয়ই বুঝায়।

উহাদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অশক্ত হইলেও উহারা স্বয়ং অতি সহজ ও সম্পূর্ণ বোধগম্য। অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে মানবের ভাষা ও কল্পনার উৎপত্তি অনুধ্যান করিলে উহা সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

সকর্ম্মক শব্দ মানব অর্থবাচক নহে।

প্রাচীন ভাষাকারকেরা চন্দ্রকে মাপক ও সূত্রধর বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা যে মনুষ্য ও চন্দ্রের মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্টি করেন নাই, এমত নহে। আদিম লোকদিগের মনের ভাব যে আমাদিগের ভাব হইতে ভিন্নরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে আমরা তাঁহাদিগকে কখন মূর্খ বা নির্ব্বোধ বলিতে পারি না। (তাঁহারা আপনাদের কার্য্যের সহিত, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশের কার্য্যের সাদৃশ্য দেখিয়া নিজ নিজ কার্য্যের নামকরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা কখনই মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা মনুষ্য-মাপক ও চন্দ্র-মাপক এবং প্রকৃত মাতা ও নদী-মাতার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন নাই।)

যখন প্রত্যেক বিদিত ও নাম-নির্দ্ধারিত পদার্থেই কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইত এবং কর্ত্তৃত্ব আরোপণের সঙ্গে উহা ব্যক্তি-বাচক হইয়া উঠিত, যখন প্রস্তরকে ছেদক ও দন্তকে খাদক বলা যাইত, তখন উহাদিগকে সমাসোক্তি-বিরহিত করিতে, মাপক ও চন্দ্রের বিভিন্নতা দেখাইতে, মনুষ্য হইতে হস্ত ও হস্ত হইতে যন্ত্রের প্রভেদ করিতে, এমন কি প্রস্তর যে পদদলিত পদার্থ মাত্র, তাহা প্রকাশ করিতে যে, সাতিশয় অসুবিধা হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অলঙ্কারে, সচেতনত্বে বা সমাসোক্তিতে এরূপ কোন কষ্ট ছিল না।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্ম ও পুরাণ-পাঠকের পক্ষে সমাসোক্তি এত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা একবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। ভাষা কিরূপে সমাসোক্তি আরোপ করিতে শিখিল, আমরা সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না, ভাষা কিরূপে তাহার বিপরীত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল, তাহাই আমাদের আলোচ্য হইতেছে।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় লিঙ্গ।

ব্যাকরণের লিঙ্গকে অনেকে সমাসোক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহা কারণ নহে, কার্য্য। যে যে ভাষায় এই লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত বিশেষতঃ চরমাবস্থায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সেই ভাষার কবিগণ সহজেই লিঙ্গ-প্রয়োগে সমাসোক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অতি প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি। লিঙ্গ-প্রকাশক ভাষারও এমন এক সময় ছিল, যখন লিঙ্গবাচকের উদ্ভব হয় নাই। যে আর্য্য ভাষায় অতি সুঘটিত লিঙ্গ-প্রথা দেখা যায়, তাহাতেও অনেক প্রাচীন কথা লিঙ্গ-শূন্য রহিয়াছে। পিতৃ শব্দ পুংলিঙ্গ নহে এবং মাতৃ শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ নহে। এমন কি নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দেও লিঙ্গের কোন বাহ্য চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু লিঙ্গ-চিহ্ন না থাকিলেও প্রাচীন বিশেষ্যপদগুলি কার্য্যকারিতা-প্রকাশক ছিল।

ভাষার এই অবস্থায় সকর্ম্মক ও ব্যক্তিবাচক নহে, এমন কোন পদার্থের ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। প্রত্যেক নামেই কোন সকর্ম্মক পদার্থ বুঝাইত। যদি Calx—গুল্‌ফ শব্দে পদাঘাতকারী বুঝাইত তবে Calx—প্রস্তর শব্দেও তাহাই বুঝাইত। সুতরাং অন্যরূপে ইহা ব্যাখ্যা করিবার আর উপায় ছিল না। গুল্‌ফ প্রস্তরকে আঘাত করিলে প্রস্তরও গুল্‌ফকে আঘাত করিত। উহারা উভয়েই Calx। বেদে বি অর্থে পক্ষী উড্ডয়নকারী, কিন্তু এই কথারই আবার "শর" অর্থ হইয়া থাকে। "যুধ" অর্থে যোদ্ধা, শস্ত্র ও যুদ্ধ বুঝায়।

যখন বাহ্য চিহ্ন দ্বারা পদাঘাতকারী এবং পদাঘাতিত, এবং নির্জীব এবং সজীবের প্রভেদ করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অনেক ভাষা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর যাইতে পারে নাই। আর্য্যভাষা সজীব পদার্থের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ করিয়া আর এক পদ উন্নত হইয়াছিল। পুংলিঙ্গ বিশেষ্য অবধারণ না করিয়া বরং স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদ অবধারণ করাতেই ঐরূপ প্রভেদ আরম্ভ হইয়াছিল, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় বাছিয়া রাখায় অবশিষ্ট গুলি পুংলিঙ্গ হইয়াছিল। আবার ইহার দীর্ঘকাল পরে ক্লীবলিঙ্গ নির্ব্বাচিত হইয়া

ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম পদেই এরূপ নির্ব্বাচিত হইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

বৈয়াকরণ লিঙ্গ পৌরাণিক বিষয়ে কবিদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিলেও উহাকে ভাষার উদ্দেশ্য-শক্তি বলা যাইতে পারে না। এই শক্তি ভাষা ও ভাবের প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে প্রয়োজন সৌকর্য্যার্থে অনেক স্বর-চিহ্ন বা সঙ্কেত প্রচলিত আছে। মানব আপন কার্য্যের অনুরোধে নানা কণ্ঠচিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি বাহ্য জগতেও তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ অনেক কার্য্য দর্শন করেন। স্বর-চিহ্ন দ্বারা বাহ্য জগতের এই সকল পদার্থ তিনি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে নদীকে রক্ষক বলিয়া স্বপ্নেও কথন উহার হস্ত পদাদি বা অস্ত্র শস্ত্রাদি কল্পনা করেন না, অথবা চন্দ্রকে গগন পরিমাণ করিতে দেখিয়া সূত্রধরও মনে করেন না। পশ্চাতে এইরূপ অনেক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভব। আমরা এখনও চিন্তার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে সঞ্চরণ করিতেছি।

সহকারী ক্রিয়া পদ।

আমরা মনে করি যে, বাক্য ব্যতিরেকে ভাষা অসম্ভব, এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে বাক্য অসম্ভব। ফলতঃ এরূপ ধারণা সত্যও বটে এবং ভ্রমাত্মকও বটে। বোধগম্য ভাব ব্যক্ত করাই যদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ হয়, তবে একথা সত্য। কিন্তু বাক্য অর্থে যদি কর্ত্তৃপদ, বিশেষক ক্রিয়া প্রভৃতির সমবায় বুঝায়, তাহা হইলে একথা ভুল। কেবল অনুজ্ঞা বাক্য হইতে পারে এবং ক্রিয়া পদের যে কোন রূপকে বাক্য বলা যাইতে পারে। আমরা এক্ষণে যাহাকে বিশেষ্য পদ বলি, অগ্রে উহা ধাতু প্রত্যয়সমন্বিত বাক্য মাত্র ছিল, এবং উহাতে যে বিষয় বা বস্তু বুঝাইত, ধাতুটী তাহারই গুণবাচকের কার্য্য করিত। সেইরূপ আবার যখন কর্ত্তৃপদ ও বিশেষক দেখি, তখন আমরা মনে করিতে পারি যে, মধ্যে ক্রিয়া উহ্য আছে। ফলতঃ প্রথমে উহার পরিব্যক্তি হইত না, বা পরিব্যক্তির আবশ্যকতা ছিল

না। এমন কি আদিম ভাষায় উহা ব্যক্ত বা ব্যবহার করা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্যগণ অচেতন কোন পদার্থই ধারণা করিতে পারিতেন না। কোন পদার্থের বর্ত্তমান বা ভূতকালীন অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেও তাহাদের এইরূপ অসুবিধা হইত। সর্ব্ব প্রথমে এই ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ঐ ঐ পদার্থ তাঁহাদের "নিজ কার্য্যের ন্যায় কোন কার্য্য করিতে পারে" এইরূপ বলিতেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। উহা দেখিয়া যখন আমরা এই বিষয় আছে এইরূপ বলি, তাঁহারা তখন এই বিষয় "নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতেছে" এইরূপ কহিতেন।

As, —নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগকরা।

"He is" পদের as অতি প্রাচীন ধাতু। আর্য্যগণের পৃথক্ হওয়ার পূর্ব্বে উহা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হইত। অদ্যাপি আমরা জানি যে, as ধাতুর অস্তি অর্থের পূর্ব্বে as ধাতুর শ্বাস অর্থ ছিল।

সংস্কৃতে ইহা অস্ উ—শ্বাস্ এইরূপ ছিল, এবং উহা হইতেই বোধ হয় শ্বাসবন্ত, জীবন্ত এবং অবশেষে জীবিত দেবগণের প্রাচীন নাম বৈদিক অসুর হইয়া থাকিবে (১)।

ভূ—হওয়া।

বৃক্ষ প্রভৃতি শ্বাসহীন পদার্থের অস্তিত্ব প্রকাশে ধাতুর যোগ্যতা না থাকায় "ভূ" ধাতুর সৃষ্টি হয়। ইহা কেবল প্রাণি-জগতে ব্যবহৃত না হইয়া

---

(১) সংস্কৃতে যাহা "অসু" জেন্দে তাহা "অহু"—আবেস্তায় এই শেষোক্তটীর অর্থ মাত ও পৃথিবী। যদি জেন্দের অসু শব্দের অর্থ প্রভু হয়, তাহাহইলেও অহুর মজদার অহুর শব্দে প্রভু অর্থ কদাপি হইতে পারেনা। অসু শব্দের সহিত কেবল একটীর প্রত্যয় যোগ হইয়াছে। জেন্দে অসু শব্দের দুইটী অর্থ করা যাইতে পারে। একটী শ্বাস ও অপরটী প্রভু। 'রতু শব্দের অর্থও ঠিক ঐ রূপে আদেশ ও আদেশদাতা হইয়া থাকে। অসু জেন্দে যে অর্থে প্রভু হইয়া থাকে, সে ভাবে সংস্কৃতের অসুর অর্থে প্রভু, স্বীকার্য্য বলিয়া অনুভূত হয় না।

উদ্ভিদজগতের উন্নতিশীল ও বর্দ্ধমান বস্তুতে প্রয়োজিত হইত। পৃথিবী স্বয়ং 'ভূ' শব্দে অভিহিত হইত।

বস, বাস করা।

পরিশেষে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে অনুভূতির আবশ্যকতা হইলে বাস অর্থে বস্ ধাতুর সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত বাস্তু, বাটী এবং ইংরেজী I was এই বাক্যে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্বাস ও উৎপত্তি-ধর্ম্মবিহীন পদার্থ মাত্রে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা জীবন-হীন পদার্থ-প্রকাশের প্রথম উপায়। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য পদের গঠন ও এই তিনটী সহকারী ক্রিয়া পদ ব্যবহার-প্রথা, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ নৈকট্য বা সৌসাদৃশ্য আছে।

আদিম ভাব-ব্যক্তি।

এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় আর্য্যগণ চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে কিরূপ বলিতেন, যখন আমরা বলি, চন্দ্র আছে, সূর্য্য রহিয়াছে, কিংবা বায়ু বহিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, তখন বলিতেন, সূর্য্য নিঃশ্বাস লইতেছে (সূর্য্যঃ অস্তি) চন্দ্র হইতেছে (মা ভবতি), পৃথিবী বাস করিতেছে, (ভূর্বসতি), বায়ু বহিতেছে, (বায়ুর্বাতি), বৃষ্টি হইতেছে (ইন্দ্র উনত্তি বা বৃষা বর্ষতি বা সোমঃ সুনোতি) এই রূপ বলিতেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রতিদিন তাঁহার সম্মুখে স্বভাবের কার্য্য দেখিয়া সর্ব্ব প্রথমে কিরূপে তাহা বুঝিতে ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল ভাষানুশীলন-প্রথার উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে আমরা সংস্কৃত ব্যবহার করিতেছি। ধারণা হইতে কিরূপে ব্যক্ত করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইল, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি প্রবাদ-মূলক হইয়াই বা কিরূপে ধারণার উপর প্রতিফলিত হইল এবং উহার ঘাত প্রতিঘাতই বা কিরূপে প্রাচীন পৌরাণিক-গ্রন্থ উৎপাদনে সমর্থ হইল, এই সকল জটিল বিষয় পরে বিচার করা যাইবে।

এখন কেবল ইহাই বক্তব্য যে,প্রাচীন আর্য্যেরা সূর্য্যকে আলোকের উদ্দীপক, চন্দ্রকে মাপক, উষাকে জাগরণকারক, বজ্রকে শব্দকারক, বৃষ্টিকে বর্ষক এবং অগ্নিকে দ্রুতগমনকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও আমরা কথন (এমন মনে করিব না যে, তাঁহারা উহাদিগকে হস্তপদবিশিষ্ট মানব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।) তাঁহারা "সূর্য্য নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতেছে" বলিতেন বলিয়া উহাকে মনুষ্য বা পশু কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব কল্পনা করিতেন না। আমাদিগের গুহাবাসী পূর্ব্বপুরুষেরা নির্ব্বোধও ছিলেন না, কবিও ছিলেন না। ('সূর্য্যঃঅস্তি," এই রূপ বলিয়া তাঁহারা কেবল তাহাকে আমাদের ন্যায় কার্য্যক্ষম ও গতিশীল বুঝিতেন। প্রাচীন আর্য্যেরা কথনই অত পূর্ব্বে চন্দ্রের মুখ, চক্ষু, নাসিকা আছে বলিয়া বর্ণন করেন নাই।)

আদিম কালে সাদৃশ্যের অপহ্নব।

আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি,বোধ হয় সেই সময়ে আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা অর্দ্ধ-স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য পদার্থের সাদৃশ্য কল্পনা না করিয়া এবং আপনাদের ও উহাদের মধ্যে কোন কাল্পনিক সাদৃশ্য না দেখিয়া, বরং (আপনাদের ও উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা দর্শন করিয়াই অধিকতর মুগ্ধ হইতেন।)

বেদে এই মত সমর্থনের উপযোগী অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যাহাকে সাদৃশ্য বা তুলনা বলি, অনেক বৈদিক স্তোত্রে তাহা অসাদৃশ্যযুক্ত। আমরা বলিয়া থাকি "পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়" কিন্তু বৈদিক কবিরা ঐ রূপ না বলিয়া "দৃঢ়, পাহাড় নহে" এইরূপ কহিয়াছেন (১)। তাঁহারা সাদৃশ্য অনুভব করাইতে অসাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি তাঁহারা দেবতার উদ্দেশে মিষ্ট খাদ্য উৎসর্গ না করিয়া শুদ্ধ প্রশংসা-স্তোত্রেই উহা পর্য্যবসিত করিতেন। তাহাদের মতে উহাই যেন মিষ্ট খাদ্য(২)। নদী প্রচণ্ড

---

(১)ঋগ বেদ ১ ম, ৫২, ২। সঃ পর্ব্বতঃ ন অচ্যুতঃ; ৯ম, ৬৪, ৭, গিরয়ঃ ন স্বতবসঃ। ন যে শব্দের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সাদৃশ্যবাচক। এই হেতু আদিম অনুভূতি এই রূপ ছিল যে, সে, পর্ব্বত, না; অর্থাৎ সে সর্ব্বাংশে নয়, কোন কোন অংশে পর্ব্বত।

(২) ঋগ্বেদ ১ম, ৬১, ১।

বা ভীম নাদে আসিতেছে, কিন্তু বৃষ নহে, অর্থাৎ বৃষের ন্যায়। এই রূপ কথিত আছে যে, মরুৎগণ তাঁহাদের উপাসকগণকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন, যথা পিতা, পুত্র নহে,অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন (১)।

এইরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে পরিভ্রমণশীল মনে করিতেন, কিন্তু জন্তু বলিতেন না। নদী শব্দ করিতেছে ও যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহা মনুষ্য নহে, পর্ব্বতগণকে পরাভব করা অসাধ্য, কিন্তু তাহারা যোদ্ধৃবর্গ নহে। দাবানল বন-ভক্ষক বটে, কিন্তু সিংহ নহে।

বেদের এই সকল স্থান অনুবাদ কালে আমরা "না" স্থানে ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, কবিরা আদৌ সাদৃশ্য দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইতেন, অসাদৃশ্য দেখিয়াও তদধিক না হউক, অন্ততঃ সেইরূপ মুগ্ধ হইতেন।

চলিত বিশেষণ।

কবিরা স্বভাব বর্ণন করিতে করিতে স্বভাবতঃ অনেক বিশেষণ বারংবার ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বভাবের অনেক পদার্থ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও উহাদের অনেকের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং তৎসমুদয় একটী সাধারণ বিশেষণে অভিহিত হয়। তৎপরে উহারা প্রত্যেক বিশেষণের অধীনে এক এক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া একটী নূতন ভাবাত্মক হইয়া উঠে। এইরূপ হওয়াই সম্ভব। কার্য্যতঃ ইহা কত দূর হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

বেদ দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষীয় পরমার্থবিদ্‌গণের মতে উহার স্তোত্রগুলি কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে (২)। "দেবতা" শব্দ ইঙ্গরেজি ডীটি (Deity) শব্দের সমান। কিন্তু বেদের স্তোত্রে দেবতা কেবল এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না। দেবতা শব্দের ধারণা

---

(১) ঋগ্‌বেদ ১ম, ৩৮, ১।

(২) অনুক্রমণিকা। যস্য বাক্যং স ঋষিঃ, যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যৎ বস্তু সা দেবতা।

এপর্য্যন্ত অবধারিত হইয়া উঠে নাই। এমন কি প্রাচীন টীকাকারেরা বলিয়াছেন যে, "স্তোত্রে যা কিছু বা যে কেহ সম্বুদ্ধ হয়, তাহাই স্তোত্রের আরোপ্য দেবতা শব্দের অর্থ। যিনি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া স্তোত্রের প্রয়োজ্য বিষয় উল্লেখ করেন, তাঁহাকে ঋষি বা দর্শক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এইরূপে যখন কোন বলি, যজ্ঞপাত্র, বা যুদ্ধাস্ত্র সম্বোধিত হয়, তখন তাহারা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। স্তোত্রের মধ্যে যে সকল কথোপকথন দেখা যায়, তাহাতে বক্তা ঋষি বলিয়া ও শ্রোতা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ দেবতা একটী পরিভাষা তুল্য হইয়াছে। পরমার্থবিৎদের ভাষায় কবি-সম্বোধিত পদার্থ ভিন্ন উহাতে আর কিছুই বুঝায় না। যদিও এ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের স্তোত্রে দেবতা শব্দের ব্যবহার দেখা যায় নাই, কিন্তু প্রাচীন কবিগণ যে সকল বিষয়কে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন আমরা অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া গ্রীক দিয় শব্দ দেবগণ অর্থে ব্যবহার করি, এই দেব শব্দ অনুবাদ করিতে বোধ হয় গ্রীকেরা তেমনি "দিয়স্" শব্দ প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু বৈদিক কবিগণ দেব শব্দের সহিত কি অর্থ সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে বুঝা যায়, দেব এবং ইঙ্গরেজী god ঈশ্বর, শব্দের অর্থের সহিত উহার কতদূর বিভিন্নতা আছে। এমন কি বেদে, ব্রাহ্মণে আরণ্যকে ও সূত্রে উহার অর্থ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। দেবতা শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে ধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিতে হয়।

দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া আদৌ উজ্জ্বল। অভিধানে দেবতার অর্থ ঈশ্বর, স্বর্গীয়। দেবতা শব্দের আমরা এক্ষণে যে অর্থ বুঝি, তৎকালে উহার এই অর্থ হয় নাই, তখন উহার আধুনিক অর্থ কেবল গঠিত হইতেছিল। সৃষ্ট পদার্থের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমে ঈশ্বর-সমীপে উপনীত হইয়াছেন(১)। ইহাই বৈদিক স্তোত্রের

(১) Brown, 'Diorysiak Myth,' I. p. 50.

প্রকৃত ভাবার্থ। হিসিয়ড্ আমাদিগকে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত দিয়াছেন। আবার আমরা বেদেও দেবোৎপত্তি দেখিতেছি। দেবগণের জন্ম ও বৃদ্ধি অর্থাৎ দেবতাবাচক শব্দের জন্ম ও বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক প্রকৃতির স্তোত্রে স্বর্গীয় ভাবের উদ্ভাবনে আধুনিক ধারণাই কেবল দেখা গিয়া থাকে।

বেদে ঋষিরা অনেক পদার্থের কোন একটী সাধারণ শব্দ দিয়া সকল গুলিকেই সম্বোধন করিয়াছেন। পরিশেষে যে, ঐ শব্দ ঈশ্বরের সাধারণ নাম হইয়াছে, দেবতা শব্দ উহার এক মাত্র প্রমাণ নহে। বেদে অনেক দেবতার সাধারণ নাম বসু, আদৌ ঐ শব্দে দীপ্তি কিংবা উজ্জ্বল বুঝাইত।

এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে কতকগুলিকে প্রাচীন কবিরা অপরিবর্ত্তনশীল ও অক্ষয় বলিয়া মনে করিতেন, এবং অপর গুলিকে নশ্বর ও ধূলিসাৎ হইবার উপযোগী ভাবিতেন। এজন্য তাঁহারা তাহাদিগকে অমর ও অজর প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করিতেন।

তাঁহারা মনুষ্য প্রভৃতি জীবের পরিবর্ত্তন ও মরণ দেখিয়া এবং আকাশ সূর্য্য প্রভৃতিতে ঐ ঐ ধর্ম্মের অসদ্ভাব দেখিয়া উহাদের প্রকৃত জীবন আছে মনে করিতেন। সুতরাং ঐ ভাব প্রকাশার্থই অসু (শ্বাস) ধাতু-সিদ্ধ অসুর শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে কেবল ধাত্বর্থানুসারে যে দেব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির উজ্জ্বল ও সৌম্য মূর্ত্তি বুঝাইত।

অসুর শব্দের প্রয়োগে ওরূপ কোন প্রতিষেধ না থাকায় উহা প্রাচীন কাল হইতে শিব অশিব, সকল শক্তিতেই প্রযুক্ত হইত। আদৌ শ্বাস পরিশেষে ঈশ্বর-দ্যোতক এই অসুর শব্দ হইতেই আমরা আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্বে ইহাই বুঝিতে পারি যে, আত্মা দেহের জীবনী শক্তির ও পরিপুষ্টির প্রধান উপাদান।

ইষির আর একটী বিশেষণ শব্দ। আদৌ উহাও প্রায় অসুর অর্থে ব্যবহৃত হইত। উহা ইষ্, রস, শক্তি, জীবন, বেগ অর্থবোধক ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়া অনেক বৈদিক দেবতায় বিশেষতঃ ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিন, মরুৎ, এবং বায়ু, শকট ও মন প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইত। গ্রীকে ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চঞ্চল এবং সুন্দর ধান্য, পক্ষান্তরে সাধারণ অর্থ স্বর্গীয় এবং পবিত্র।

এই শেষোক্ত অর্থ, সংস্কৃত অসুর ঈশ্বর, এই অর্থের ন্যায় অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে।

বৈদিক দেবগণের মধ্যে স্পৃশ্য পদার্থ।

পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর পদার্থের কথা বলা গিয়াছে, ঋগ্বেদের দেবতাগণের মধ্যে তাহার (প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায় না।) আধুনিক স্তোত্রে বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদে, প্রস্তর, কড়ি, কঙ্কাল প্রভৃতি উপাস্য বলিয়া কথিত হইলেও প্রাচীন স্তোত্রে উহাদের ব্যবহার একবারেই বিরল। ঋগ্বেদে রথ, ধনুক, তূণীর, যজ্ঞপাত্র, কুঠার, পটহ প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম পদার্থ উল্লিখিত ও সমাদৃত হইয়াছে, বলিতে কি প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতিও তৎসমুদয়ের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। এই সকল পদার্থকে কোন স্বতন্ত্র প্রকৃতি ধারণ করিতে দেখা যায় না। তাহারা কেবল ব্যবহার্য্য, বহুমূল্য এবং কখন বা পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১)

---

(১) এরূপ কথিত হইয়া থাকে যে তৈজস পত্র এবং বস্ত্রাদি কখনও পূজিত হইত না (see kapp, Grundilinien der Philsophie der Technik, 187,8p. 104) কিন্তু স্পেনসর সাহেবের Principles of Sociology I. গ্রন্থের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় আমরা ইহার বিপরীত মত দেখিতে পাই। উহাতে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা গৃহব্যবহার্য্য ধামা, সাজি প্রভৃতির পূজা করে এবং উহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য যে সকল দ্রব্য দ্বারা গৃহকার্য্যের সাহায্য হয়, তৎসমুদয়েরও পূজা হইয়া থাকে। সূত্রধর হাতুড়ি, বাটালি প্রভৃতি অস্ত্রাদির পূজা করে। ব্রাহ্মণ যখন লিখিতে আরম্ভ করেন, তখনও লেখনী প্রভৃতির সম্বন্ধে এইরূপ করিয়া থাকেন। সৈনিক পুরুষ তাহার যুদ্ধব্যবহার্য্য অস্ত্রাদির পূজা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, রাজমিস্ত্রী কর্ণিশ পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ডুয়র সাহেব এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইঁহাদের অপেক্ষা এতৎসম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ লাএল সাহেব তাঁহার 'ভারতীয় প্রদেশ সকলের ধর্ম্ম' নামক পুস্তকেও ঠিক এইরূপ যে বলিয়াছেন এ কেবল যে, কৃষকেরাই লাঙল পূজা করে, জালজীবী জাল পূজা করে, তাঁতী তাঁত পূজা করে, তাহা নহে। মসীজীবিগণ কলম পূজা, ব্যবসায়িগণ হিসাবের খাতা পূজাও করিয়া থাকে। এখন কথা এই, এরূপ পূজার উদ্দেশ্য কি।

বৈদিক দেবগণের মধ্যে ঈষৎ স্পৃশ্য পদার্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যে সমস্ত পদার্থ ঈষৎ-স্পৃশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিই বৈদিক দেবগণের মধ্যে দেখা যায়। ঋগ্বেদের ১ম, ৯০,৬-৮ শ্লোকে আছে :—

"হে বায়ু! ধার্ম্মিকগণের উপর মধু বর্ষণ কর, হে নদীগণ! তোমরাও মধু বর্ষণ কর। হে লতাসকল! তোমরা মধুময় হও। ৬।

" হে রজনি! হে উষে! মধুময় হও। হে পৃথিবীর উপরিস্থিত আকাশ! মধু-পূর্ণ হও। হে ঈশ্বর! হে পিতৃগণ! মধুময় হও। ৭।

" হে বৃক্ষগণ! মধুপূর্ণ হও! হে গাভীগণ! সুমিষ্ট হও। ৮।)

আমি এস্থলে আক্ষরিক অনুবাদ করিলাম, তৎসঙ্গে মধু শব্দও ব্যবহৃত হইল। কিন্তু সংস্কৃতে এ শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। মধু শব্দে খাদ্য আছে। মধু শব্দে খাদ্য ও পানীয়, মিষ্ট খাদ্য ও মিষ্ট পানীয় বুঝায়। সুতরাং স্নিগ্ধ বৃষ্টি, জল, দুগ্ধ ও প্রত্যেক প্রীতিকর সামগ্রী মধু নামে পরিচিত হইত। এই সকল প্রাচীন শব্দ সম্পূর্ণ রূপে ভাষান্তরিত ও ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। তবে বিশেষ অধ্যয়ন ও দীর্ঘকাল আলোচনার পর আমরা এই মাত্র অনুমান করিতে পারি যে, এই সকল শব্দ প্রাচীন কথক ও কবিগণ কি ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতেন।

ঋগ্বেদ, ১০ ম, ৬৪,৮ শ্লোকে লেখা আছে:—

"হে তৃসপ্ত-ধাবমান নদি, সমুদ্র, বৃক্ষগণ! হে পর্ব্বতগণ! এবং হে অগ্নি! তোমাদিগকে আমরা সাহায্যার্থ আহ্বান করি।

ঋগ্বেদ, ৭ ম ৩৪,২৩, হে পর্ব্বত! সমুদ্র! লতা এবং স্বর্গ! হে বৃক্ষধারা হরিৎ পৃথিবি! হে উভয় লোক! আমাদের ধন রক্ষা কর।

ঋগ্বেদ ৭ ম, ৩৫, ৮, দূরদৃশ্বা সূর্য্য! শুভোদয় হও, চতুর্দ্দিক! প্রসন্ন হও; সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ! নদি ও জল! প্রসন্ন হও।

ঋগ্বেদ ৩,৫৪,২০। হে সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ! আমাদিগের কথায় কর্ণপাত কর।

ঋগ্বেদ ৫ম, ৪৬, ৬,। হে প্রশংসিত পর্ব্বতগণ! এবং উজ্জ্বল নদীগণ! আমাদিগকে রক্ষা ও আশ্রয়দান কর।"

ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ, ৫২, ৪। "উদিত উষে! আমাকে রক্ষা কর, হে উচ্ছ্বসিত নদীগণ! আমাকে রক্ষা কর, হে সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ! আমাকে রক্ষা কর! হে পিতৃগণ! ঈশ্বরোদ্দেশে যাইতে আমাকে রক্ষা কর।"

ঋগ্বেদ ১০ম, ৩৫, ২। "আমরা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আশ্রয় কামনা করি। দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা নদীগণ, মাতৃগণ, শস্পপূর্ণ পর্ব্বতগণ এবং সূর্য্য ও উষার আরাধনা করি। সোম অদ্য আমাদের স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি বর্দ্ধন করুক।"

আমরা বৈদিক ইতিহাসের যে যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছি, তাহা পঞ্জাবের নদীকুল-সম্বন্ধীয়, এক্ষণে দেখা যাউক, সেই নদীগণ কিরূপে সম্বোধিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ১০ম, ৭৫। "হে নদীগণ! কবিগণ বিবস্বতের এই স্থানে তোমাদের মহত্ত্ব প্রচার করুন। সাত সাতটী করিয়া তাহারা তিনটী গতিতে আসিয়াছে। কিন্তু সিন্ধু (সিন্ধুনদ) বেগে ও বলে অপরাপরকে পরাভূত করিয়াছেন।"

"তুমি যখন পুরস্কার লাভের জন্য ধাবমান হইয়াছিলে, বরুণ তোমার পরিভ্রমণের পথ খনন করিয়াছিলেন। তুমি সকল সরিতের প্রভু হইয়াও পৃথিবীর একটী বন্ধুর দেশ দিয়া গমন করিতেছ।"

"পৃথিবী হইতে স্বর্গে ধ্বনি উত্থিত হয়; সিন্ধু গৌরবের সহিত অবিশ্রান্ত ধ্বনি করিতেছেন, সিন্ধু বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে আসিতেছেন, মেঘ হইতে যেন বজ্র নিনাদ বাহির হইতেছে।"

"মাতৃগণ যেমন শাবকের প্রতি ধাবমান হয়, শব্দায়মান গাভীগণ (নদীগণ) তেমনি দুগ্ধ লইয়া তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। রাজা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পার্শ্ববর্ত্তী দুই দল চালনা করিয়া থাকেন, তেমনি তুমি নিম্নপ্রবাহিনী এই নদীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছ।"

"হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে সরস্বতি! হে শতদ্রু! হে পরুষ্ণি! (বিতস্তা) তোমরা আমার স্তব গ্রহণ কর। হে মরুদ্বৃধা! অসিক্নীর সহিত এবং বিতস্তার সহিত, হে অর্জ্জিকীয়া! সুষোমার সহিত শ্রবণ কর;" ৫।

"ভ্রমণের জন্য প্রথমে ত্রিষ্টামার সহিত একত্র হইয়া হে সিন্ধু! তুমি

সুশর্ত্তু, রাস এবং শ্বেতির সহিত যাইতেছ; কুভার (কাবুলনদী) সহিত গোমতীতে, মেহত্নুর সহিত ক্রুরমুতে উপস্থিত হইতেছ। তুমি সকলের সহিতই একপথে অগ্রসর হইতেছ;"৬।

"দ্রুত হইতেও দ্রুত, অদমনীয়, সুন্দর বড়বার ন্যায় দর্শনযোগ্য, ফেনিল, উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যশালী সিন্ধু মেঘদিগকে প্রবাহিত করিতেছে;" ৭।

"অশ্বযানে, পরিচ্ছদে, স্বর্ণে, দুর্ব্বাদলে, পশমে ও তৃণে সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর, যুবা সিন্ধু মধু-প্রবাহিত দেশে প্রবাহিত হইতেছে;" ৮।

"সিন্ধু তাঁহার সুখদায়ক যানে অশ্ব যোজনা করিয়াছেন; যুদ্ধে যেন তিনি আমাদিগের জন্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে পারেন। যে হেতু সেই অনিবার্য্য বা অপ্রতিহত বিখ্যাত এবং গৌরবান্বিত যানের গৌরব অতি মহৎ;" ৯।

সহস্র সহস্র স্তোত্রের মধ্যে এই কয়েকটি মাত্র নির্দ্ধারিত করিলাম। এই গুলি অদ্যাপি সম্পূর্ণ বোধগম্য ঈষৎস্পৃশ্য ও অর্দ্ধ দেবতার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল পদার্থকে দেবতা বলা যাইতে পারে কি না। কোন কোন স্থানে কখনই তাহা বলা যায় না। এমন কি যাঁহারা বহুদেবতার উপাসক নহেন, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, পৃথিবী, আকাশ, উষা প্রভৃতিকে মধুময় হইতে বলাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই।

মনুষ্যকে আশ্রয় দানের জন্য যখন নদী পর্ব্বতকে সম্বোধন করিতে দেখা যায়, তখন কিছু নূতন বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐ বিষয় বোধের অগম্য নহে। প্রাচীন মিসরদেশবাসিগণ নীল নদের বিষয় কিরূপ ভাবিত, তাহা আমরা জানি, এবং অদ্যাপি দেশ-হিতৈষী সুইসদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহ রক্ষার জন্য নদী, পর্ব্বতকে ঐরূপ সম্বোধন করিতে দেখা যায়। প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে পর্ব্বতগণকে অনুরোধ করা হইত, ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে বোধ-গম্য, যে হেতু পর্ব্বত যদি কর্ণপাত না করিবে, তবে আমরা কেন তাহাদিগকে আহ্বান করিব?

সূর্য্য দূরদর্শী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেনই বা না হইবেন? আমরা

কি অন্ধকার-ভেদী নবোদিত সূর্য্যের অংশু-মালাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের গৃহের ছাদোপরি পতিত হইতে দেখি না? ঐ রশ্মিজাল কি আমাদিগকে দর্শন-সামর্থ্য প্রদান করে না? তবে সূর্য্য কেনই বা দূরদর্শী বলিয়া উক্ত হইবে না।

নদীগণ মাতৃগণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেনই বা না হইবে? নদী কি তাহার তীরভূমি উর্ব্বরা করে না? এবং তদুপরি গোমেষকে প্রতিপালন করে না? যখন ইচ্ছা তখনই প্রাণ ভরিয়া জল পান করি, সুতরাং আমাদের জীবন কি নদীদ্বারা একরূপ রক্ষা পাইতেছে না?'

আকাশ যদি পিতা বা পিতার ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ কি? আকাশ কি আমাদের উপর চক্ষু রাখিতেছে না? আমাদিগকে এবং সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছে না? আকাশের ন্যায় প্রাচীন, উচ্চ, কখন শান্তমূর্ত্তি ও কখন বা প্রচণ্ডরূপধারী আর কি কোন পদার্থ আছে?(১)

এই সমস্ত পদার্থকে যদি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ আনন্দ, খাদ্য ও সুখের জন্য দেবতা (২) বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন, আমাদের তাহাতে

---

(১) এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা, যদি প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসকারিদিগের সহিত তর্ক উপস্থিত করে, তাহা হইলে প্রায় কোন লেখককেই এই শেষোক্ত পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা যায় না। একবার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে আবার যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস জন্মে, তাহা একরূপ অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু ঈদৃশ অসম্ভব বিষয়ও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। "True Story" লেখক কেলসস ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান অদ্বৈতবাদিদের আক্রমণ হইতে গ্রীক বহুদেবোপাসকদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। Origen এই লেখকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। কেলসস্ লিখিয়াছেন, ইহুদীরা স্বর্গ এবং স্বর্গবাসিদের সম্মান করে। কিন্তু তাহারা সেই প্রদেশের অতি মহৎ, অতি উচ্চ পদার্থের সম্মান করে না। তাহারা অন্ধকারে ভূত যোনির, নিদ্রায় অস্পষ্ট স্বপ্নের আরাধনা করে, কিন্তু যে সকল মঙ্গলসূচক পদার্থ রহিয়াছে, যে শক্তিতে শীত, বৃষ্টি, গ্রীষ্মের উত্তাপ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, পৃথিবীর ফল এবং সমুদয় সজীব পদার্থ হইতেছে, যে সমুদয়ে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছেন সেই সমস্ত স্বর্গীয় বিষয়ে তাহারা কিছু মাত্র মনোযোগ দেয় না। Froude, 'On Origen and Celous' in Fraser's Magazine, 1878, P. 157.

(২) উপনিষদে 'দেব' শব্দ বেগ বা বৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেবগণ বৃত্তি এবং 'প্রাণ নামে সর্ব্বদাই উক্ত হইয়া থাকেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬, ৩, ২।

বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমরা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, উহারা আমাদের কত উপকার করিতেছে।)

যে স্তোত্রে আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল পদার্থ আহূত হইয়াছে, সেই স্তোত্রই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ উহা নিশ্চয়ই আধুনিক ভাব, এবং উহারা বেদা-গত বলিয়া আমরা কখন এমন মনে করিব না যে, উহারা এক সময়ে সম্ভূত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ শতাব্দীতে বৈদিক স্তোত্র সকল একত্র হইলেও উহারা যে, একত্র হইবার সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে হইতে বিরাজমান ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল ভাবের প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইবারও যথেষ্ট সময় ছিল এবং এই সকল স্তোত্রে যে সকল স্বাধীন ভাব পরিব্যক্ত দেখা যায়, তৎ সমুদয় যে, শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভবিষ্যতে সত্যের বিজয়-জন্য ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল, তাহাও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

অতি সামান্য ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। যে কবিগণ নদীগণকে মাতা বলিয়া এবং আকাশকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, যাঁহারা উহাদের নিকট তাঁহাদের কথা শুনিতে ও তাঁহার পাপ দূর করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমর সেই সকল বৈদিক কবিগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, আকাশ, পর্ব্বত এবং নদী প্রভৃতিকে কি আপনারা দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিতেন? আমার বোধ হয়, কোন উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আমাদের প্রকৃত অভিপ্রায়ও তাঁহারা হয়ত বুঝিতে পারিতেন না। মনুষ্য, ঘোটক, পতঙ্গ, মৎস্যাদি জীব কি না, এবং ওক প্রভৃতি বৃক্ষ উদ্ভিদ কি না, একথা একটী শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যাহা বুঝিবে, তাঁহারাও আকাশ, পর্ব্বত ও নদী, দেবতা কি না, এ প্রশ্ন ঐরূপ বুঝিতেন। উত্তর দিতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা "না" বৈ আর কিছুই বলিতেন না। (যেহেতু তাঁহারা তদবস্থায়ও এরূপ উচ্চ ধারণায় আসিয়া উপনীত হন নাই, পরে যে ধারণাদ্বারা এক বিভিন্ন

প্রকৃতির পদার্থের অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। মানব যখন ধীরে ধীরে ঈষৎ স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য পদার্থের ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন তখন নিশ্চয়ই উহার সঙ্গ ধীরে ধীরে ঐশ্বরিক ধারণাও জন্মিতেছিল। এই সমুদয় ঈষৎ স্পৃশ্য পদার্থে অভ্যন্তরে যে, অস্পৃশ্য ও অজ্ঞেয় পদার্থ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, একটী, দুইটী, বা ততোধিক বৃত্তি, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে নিবদ্ধ হওয়াতেই, আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচরাতীত বিষয়কেও হয় স্বীকার করা হইয়াছে, নয় অন্যরূপে তাহার অনুসন্ধান হইয়াছে। যেমন দুটী কি একটী ইন্দ্রিয়ের বোধ্য পদার্থ-পরিপূরিত একটী জগৎ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়াতীত পদার্থপূর্ণ আর একটী জগৎও ধারণামধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। এই জগৎ প্রকৃত, এবং নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বতাদির ন্যায় মানবের উপকারী বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে।

এখন অর্দ্ধ স্পৃশ্য হইতে অস্পৃশ্য এবং স্বাভাবিক হইতে স্বভাবাতীত, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া যাহা অনুভব হয়, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমেই অগ্নির বিষয় বলা যাইতেছে।

অগ্নি।

অগ্নি কেবল দৃশ্য বলিয়া বোধ হয় না, স্পৃশ্য বলিয়াও বোধ হয়, বস্তুতঃও উহা তাহাই। কিন্তু আমরা আজি কালি অগ্নিকে যাহা বলিয়া জানি, তাহা ভুলিয়া জগতের আদিম বাসীরা উহাকে যে রূপ মনে করিতেন, সেই রূপ ভাবিতে চেষ্টা করিব। এমন হইতে পারে যে, মানব অগ্নি প্রজ্বালন-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বহুকাল কেবল ভাষা ও ভাবের গঠন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। অগ্নি-প্রজ্বালন-ক্রিয়ার আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনে নিশ্চয়ই একটী প্রবল বিপ্লব ঘটিয়াছিল, এবং উহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে তাঁহারা বজ্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যের আলোক ও

উত্তাপ দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন এবং বজ্রাগ্নি ও পরস্পর সংঘর্ষণোত্থিত দাবাগ্নিতে বনরাজি ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অগ্নির এইরূপ যুগপৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া তাঁহারা উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই এখানে অগ্নি বিরাজমান ছিল, পরক্ষণেই উহা নির্ব্বাপিত হইল। কোথা হইতেই বা আসিয়াছিল, কোথাই বা গেল? যদি পৃথিবীতে ভূত প্রেত থাকে, তাহা হইলে উহা অগ্নি। উহা কি মেঘ হইতে আইসে নাই? উহা কি সমুদ্রে বিলীন হয় নাই? উহা কি সূর্য্যে ছিল না? উহা কি নক্ষত্রগণের মধ্যে পরিভ্রমণ করে নাই? আমাদের নিকট এইরূপ প্রশ্ন বালকের প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিকে স্ববশে আনিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের মনে এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হইত। সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করিতে জানিলেও তাঁহারা কার্য্য কারণ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা হঠাৎ আলোক বা উত্তাপের আবির্ভাব দেখিতেন। তাঁহারা উহাতে স্তম্ভিত হইতেন এবং বালকদের ন্যায় অগ্নির সহিত ক্রীড়া করিতেন। যখন তাঁহারা উহার বিষয় ভাবিতে বা কহিতে শিখিলেন, তখন তাঁহারা কি করিলেন? তাঁহারা উহার কার্য্য দেখিয়া উহার নামকরণ করিলেন। তাঁহারা উহাকে দীপ্তিকারক ও দাহক কহিয়াছেন। তাঁহারা অগ্নিকে সূর্য্যালোকের ন্যায় দীপ্তিকারক ও বজ্রাগ্নির ন্যায় দাহক মনে করিতেন। তাঁহারা উহার সত্বর সঞ্চরণ ও হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শনে উহাকে দ্রুত বা চপল কহিয়াছেন। সংস্কৃতেতে উহাকে অগ্নি এবং লাতিনে ইগ্নিশ বলে।

অগ্নি দুই খণ্ড কাষ্ঠ-প্রসূত সন্তান, জন্ম মাত্র ইহা পিতামাতা-নাশক অর্থাৎ যে দুইখণ্ড কাষ্ঠ হইতে ইহা জন্মিয়াছে, তাহার ধ্বংসকারক; জল স্পর্শ মাত্র ইহা নির্ব্বাপিত ও অদৃশ্য হয়। পৃথিবীর উপর ইহা বন্ধু-স্বরূপ বাস করে, ইহা বন-নাশক, ইহা যজ্ঞীয় উপহার স্বর্গ হইতে আকাশে লইয়া যায় এবং মনুষ্য ও দেবতার মধ্যে দৌত্যকার্য্য করে। অতএব অগ্নির অসংখ্য নাম ও সংজ্ঞা দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে নানা গল্প ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। অগ্নিতে কোন অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অথচ অস্বীকারের অযোগ্য, দেবতা বলিয়া স্বীকৃত পদার্থ আছে, এই

বলিয়া যে একটী অতি প্রাচীন কথা আছে, তাহা শুনিয়াও আমাদের চমৎকৃত হওয়া উচিত নহে।

সূর্য্য।

অগ্নির অব্যবহিত পরেই সূর্য্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য ও অগ্নির মধ্যে কখন কখন একত্বও কল্পিত হইয়াছে। উহা দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন আর সকল ইন্দ্রিয়ের অত্যূর্দ্ধ বলিয়া অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন। সূর্য্য জগতের আদিম অধিবাসিদের মনে কি রূপ পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল তাহা স্থির করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিন্‌ডেল সূর্য্য সম্বন্ধে আজি কালি যে সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও সূর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীনগণের কি রূপ ধারণা ছিল তাহা অবধারণ করা সহজ-সাধ্য নহে। ফলতঃ আর্য্যগণের মধ্যে সূর্য্য লইয়া এত কথার সৃষ্টি হইল কেন? এই বলিয়া অনেকে চমৎকৃত হন। চমৎকৃত হইবার বিষয়ই বটে। সূর্য্যের নাম অসংখ্য এবং তাহার গল্পও অসংখ্য। কিন্তু সূর্য্য কে? কোথা হইতে আসিল? এবং কোথায়ই বা যায়? এ রহস্য এপর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। সূর্য্য অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা উত্তম রূপ পরিচিত হইলেও উহার মূল রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই। যেমন মনুষ্য মনুষ্যের চক্ষু পানে চাহিয়া তাহার অন্তরাত্মা দেখিতে প্রয়াস পায়, না দেখিলেও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে এবং তাহাতে সন্দেহ না করিয়া তাহার সমাদর করিয়া থাকে, সেই রূপ মনুষ্য সূর্য্যপানে চাহিয়া তাহার অন্তরাত্মা নিরূপণে অসমর্থ হইলেও এবং উহার প্রচণ্ড প্রতাপে তাহার ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যুদস্ত হইয়া গেলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিয়াছি এই বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ও প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজা করিতেন।

ভারতের অসভ্য সাওতাল জাতি সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যকে চণ্ড, কহিয়া থাকে। চণ্ড অর্থে উজ্জ্বল। চন্দ্রও ঐ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত চন্দ্র। যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক সাওতালদের মধ্যে বাস করিয়া থাকে, সাওতালেরা তাহাদিগকে বলিয়াছে যে চণ্ড পৃথিবী

সৃজন করিয়াছেন। সূর্য্য পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব এই রূপ বলিলে তাহারা বলিয়া থাকে, "না এ চণ্ড নহে, যে চণ্ড পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন তিনি অদৃশ্য" (১)।

ঊষা।

সর্ব্বাদৌ উদীয়মান সূর্য্য, অস্তমিত সূর্য্য ও গোধূলি ঊষা বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু কিছুকাল পরে এই দুইটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া নামে পৃথক্ পড়ে। এতদ্বিষয়ে অসংখ্য গল্প ও উপকথা রহিয়াছে। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার পর দিবা ও রাত্রি ও তাহাদের নানা প্রতিনিধি দৃষ্ট হয় যথা, দিয়স্‌কেরি দুই অশ্বিন, আকাশ, পৃথিবী ও তাহাদের অসংখ্য বংশাবলী। বস্তুতঃ আমরা এক্ষণে পুরাণ ও ধর্ম্ম বিষয়ের নানা কাহিনীজালে ব্যাপৃত রহিয়াছি।

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে আরাধ্য পদার্থ।

যে সমস্ত অস্পৃশ্য পদার্থের বিষয় বিবৃত হইল, তাহাদের সকল গুলিই আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর। যে সমস্ত পদার্থ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এখন তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইবে (২)।

(১) 'What is the correct name for God in Santhali?' by L. O. Skrefsrud 1876, p. 7.

(২) জেনেফন কহিয়াছেন, (Mem IV. 3,14) সূর্য্য সকলেরই দৃষ্টিপথবর্ত্তী রহিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও আপনার দিক ভাল করিয়া দেখিতে দিতেছে না। যদি কেহ তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য তাহার দৃষ্টি হরণ করিবে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি সকল অদৃশ্য। উপর হইতে বিদ্যুৎ প্রেরিত হয়, এবং যাহা পথে পায়, সমস্তই পর্য্যুদস্ত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা যখন আইসে, যখন আঘাত করে, যখন চলিয়া যায়, তখন দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও আমরা বায়ুর আগমন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি, তথাপি তাহা দেখিতে পাই না। See also Municius Felix as quoted by Feuerbach 'Wesender Religion,' p. 145

বজ্র।

আমরা বজ্রনিনাদই শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু উহা দেখিতে, অনুভব করিতে, আঘ্রাণ করিতে কিংবা আস্বাদন করিতে পারি না। প্রাচীন আর্য্যগণ অপ্রাণি-সম্ভূত কোন শব্দ বা নিনাদ ধারণা করিতে সমর্থ হইতেন না। কাননে ধ্বনি শুনিলে যেমন তাঁহারা কাননস্থ ধ্বনি-কারক ব্যাঘ্র কি সিংহ বা অন্য কিছু মনে করিতেন, তেমনি বজ্রধ্বনিকে তাঁহারা ধ্বনিকারক মাত্র জানিতেন, তদতিরিক্ত কিছু তাঁহাদের ধারণায় উপস্থিত হইত না। ফলতঃ অপ্রাণিসম্ভূত কোন শব্দ তাঁহাদের কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। আমরা সর্ব্ব প্রথমে এই বজ্রীশব্দে কাহারও নাম বুঝি, এবং উহা অদৃশ্য হইলেও উহার অস্তিত্বে বা ইষ্টানিষ্ট উৎপাদন-শক্তিতে কোন সন্দেহ নাই, এইরূপ মনে করি। বেদে বজ্রী রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং একবার ঐ নামের সৃষ্টি হইলে কিরূপে রুদ্র যে বজ্রধারী, ধনুর্ধর, দুষ্ট-নাশক, শিষ্টক-রক্ষক, অন্ধকারাবসানে আলোকদায়ক, গ্রীষ্মাবসানে তৃপ্তিদায়ক ও পীড়াবসানে স্বাস্থ্যদায়ক প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষের নবপল্লবোদ্ভেদ অবলোকন করিবার পর উহার পশ্চাদুদ্ভেদ দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই, সেইরূপ বজ্র শব্দের ধারণা, কি সূত্রে হইয়াছে এবং বেদে উহা কেন স্তুত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ দৃষ্ট হয় না।

বায়ু।

ইহার পরেই বেদে বায়ুর বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। উহা কেবল আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ও উহার পোষকতা করিতেছে এবং চক্ষুও প্রকারান্তরে উহা স্বীকার করিয়া থাকে।

এখানেও প্রাচীন ভাব ও ভাষাকে, বায়ু ও বায়ুবহের প্রভেদ করিতে দেখা যায় না। উভয়ই এক, এবং উভয়ই যেন আমাদিগের ন্যায় কোন পদার্থ। বেদে বায়ু ও বাত এই উভয় পদার্থের উদ্দেশে স্তোত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত, ক্লীবলিঙ্গে নহে। বায়ু সর্ব্বদা

প্রশংসিত না হইলেও গুণকীর্ত্তনকালে উহা সমধিক সম্মানিত হইয়াছে। উহা জগৎপ্রভু, আদিভব, দেব-নিশ্বাস এবং জগতের অঙ্কুর বলিয়া স্তুত হইয়াছে। আমরা উহার স্বর শুনিতে পাই, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাই না(১)।

মরুৎ।

বায়ু ভিন্ন বেদে মরুৎগণেরও কথা লিখিত আছে। উহারা নাশক, বজ্রবিদ্যুৎসহ ক্ষিপ্রগামী, বৃক্ষ ও গৃহ-নাশক, জীব-নাশক, পর্ব্বত ও শৈল বিদারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহারা আইসে ও যায়, কিন্তু উহাকে কেহই স্পর্শ করিতে পারে না, কিংবা কোথা হইতে আসিয়াছে ও কোথাই বা যায়, তাহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কে উহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে পারে? কেইবা উহাদের পদে মস্তক আনত না করিবে, এবং কেই বা উহাদিগকে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ও স্তুতি না করিবে? উহারা আমাদিগকে চূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু আমরা উহাদিগকে চূর্ণ করিতে পারি না। এই বিশ্বাসে উহাদের প্রতি ধর্ম্ম-ভাবের অঙ্কুর লক্ষিত হয়। অগ্নির ন্যায় বায়ুতেও যে, কোন অদৃশ্য, অজ্ঞেয় অথচ অস্বীকারের অযোগ্য বিষয়—ইহাই প্রভু হইতে পারে—কল্পিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

—০—

বৃষ্টি ও বর্ষণ-কারী।

সর্ব্বশেষে বৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বৃষ্টি কখনই অস্পৃশ্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু উহা যদি কেবল জল বলিয়া অবধারিত হইত এবং তদনুসারে উহার নাম হইত, তাহা হইলে উহা স্পৃশ্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু প্রাচীনেরা সাদৃশ্য দর্শন অপেক্ষা অসাদৃশ্য অবলোকনে বড়ই দক্ষ ছিলেন। আদিম মনুষ্য বৃষ্টির আগমন-স্থান অবিদিত থাকায় উহাকে কেবল সাধারণ জল মাত্র বলিয়া

---

১ ঋগ্বেদ ১০ম, ১৬৮।

ভাবিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি উহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদ জীব ও মনুষ্য-ধ্বংস দেখিতেন এবং উহার আগমন সঙ্গেই প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেন। কোন কোন দেশে বায়ু ও বজ্রী, বৃষ্টি-দাতা বলিয়া অবধারিত হইত। কিন্তু যে দেশে বার্ষিক বৃষ্টি-সমাগমের উপর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে, তথাকার লোকেরা যে বজ্রী ও বায়ুর ন্যায় বর্ষকেরও পূজা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সংস্কৃত ভাষায় বারিবিন্দু, "ইন্দু" (১) (পুংলিঙ্গ) নামে পরিচিত, এবং উহাদের প্রেরক ইন্দ্র নামে বিদিত। ইনিই বেদের দেবগণ-মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। ভারতবর্ষের আর্য্য অধিবাসীরা ইহাঁর পূজা করিতেন।

বৈদিক বিশ্ব-দেবকুল।

আকাশ দীপ্তি-দায়ক, এবং জগৎ প্রভাকর বলিয়া কিরূপে কল্পিত এবং তন্নিবন্ধন দ্যৌস, জিউস বা জুপিতর বলিয়া উক্ত হইত, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে দেখা গেল, কিরূপে এই আকাশ-স্থলে বজ্র, বর্ষা, ঝটিকা প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার-সাধক নানা দেবতা কল্পিত হইয়াছে। (এতদ্ব্যতিরিক্ত উহার জগৎ-ব্যাপকতা শক্তি অবলোকন করিয়া ঈশ্বরের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব কথা মনে হইতে পারে এবং এই সর্ব্ব-ব্যাপকতা-শক্তি-সম্পন্ন দেবতা পবিশেষে রাত্রি-দেবতা হইতে পারেন। তদনন্তর এই সঙ্গে সঙ্গে দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা-কাল, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী অনেক দেবতা কল্পিত হইতে পারে।) এই সকল পরিবর্ত্তন-ঘটনা বেদে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। বেদে দেবগণের যুগল মূর্ত্তি-কল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বরুণ (সর্ব্বব্যাপী দেবতা) এবং মিত্র (দিবসের প্রদীপ্ত সূর্য্য); অশ্বিনৌ (প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল) দ্যাবাপৃথিবী স্বর্গ ও পৃথিবী।

আমরা এই রূপে আর্য্য-জগতে এক একটী করিয়া বৈদিক কবিগণ কল্পিত বিশ্বদেবকুলের অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা ভারতীয় দেবগণের

---

(১) Cf.—Sindhu and sidhra, mandu and mandra, ripu and ripra etc.

অঙ্কুরিতাবস্থামাত্র অবলোকন করিতেছি। কবি-কল্পনালোকে উঁহাদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। এরূপ হইলেও দেবতাগণকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা গেল। ভূত, বল, শক্তি, আত্মা প্রভৃতি শব্দ গুলি অত্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবাত্মক হওয়ায় দেব শব্দেই ব্যবহৃত হইল।

১। অর্দ্ধদেবতা বা উপদেবতা। যথা বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং নদী, পৃথিবী, সমুদ্র (অর্দ্ধ-স্পৃশ্য পদার্থ)।

২। আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, উষা, অগ্নি (অস্পৃশ্য পদার্থ) এবং বজ্র, বিদ্যুৎ বায়ু, বৃষ্টি সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া অভিহিত। শেষোক্ত চারিটীকে, অনিয়মিত আবির্ভাব বশতঃ ভিন্ন শ্রেণী-ভুক্ত করা যাইতে পারে।

দেবতাগণ।

কোন ভাষার কোন শব্দই দেবতা শব্দের বহুবচনে প্রতিরূপ হইতে পারে না। ইংরাজিতে God শব্দের বহুবচন-প্রয়োগ আর বৃত্তের দুই কেন্দ্র কল্পনা করা উভয়ই সমান। এতদ্ভিন্ন Deities গ্রীক দীওই এবং লাতিন dii শব্দ প্রয়োগ করাতেও কালোনৌচিত্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং সংস্কৃত দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োগের চেষ্টা বৃথা। অগ্রে দেব শব্দে উজ্জ্বল বুঝাইত এবং ইহা অগ্নি, আকাশ, উষা, সূর্য্য, নদী, বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থে প্রযুক্ত হইত। এইরূপে ইহা একটী সাধারণ শব্দ হইয়া উঠে। বেদে প্রায় এমন কোন প্রাচীন স্তোত্রই দেখা যায় না, যাহাতে এই দেব শব্দ উজ্জ্বল ও স্বর্গীয় আত্মা অর্থে ব্যবহৃত না হইয়াছে। (দেব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিলুপ্ত হইলেও ইহা সর্ব্ব প্রকার উজ্জ্বল শক্তি অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইংরাজি deity ও লাতিন deus শব্দ অদ্যাপি ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বেদের দেবতা শব্দে এবং ইংরাজি divinity শব্দে কেবল শাব্দিক একতা দৃষ্ট না হইয়া ভাবগত একত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।)

দৃশ্য ও অদৃশ্য।

এক্ষণে কিরূপে প্রাচীন আর্য্যগণ দৃশ্য, নদীর ন্যায় স্পৃশ্য ও বজ্রের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর পদার্থ হইতে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, শ্রবণাতীত দেবতা ও ঈশ্বরের কল্পনা ও ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা এক প্রকার অবধারিত হইল। (আমাদের প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষেরা যে, যথাক্রমে জড়জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়ের অতীত জগতান্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, দেব বা deus শব্দ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং এই পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। অথবা প্রকৃতি প্রচ্ছন্নবেশধারী দেবতা হইলেও (১) তদপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ এই পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকিবে।) প্রাচীন আর্য্যগণ এই প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগের ন্যায় বিদিত হইতে অবিদিত এবং প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনেকে এমন বলিতে পারেন যে, ঐ উন্নতি অন্যায় রূপে হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আমাদিগকে বহু ও এক দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে পারে, এবং পরিশেষে ভাবুক মাত্রকেই নাস্তিকতায় লীন করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্যের কার্য্য এবং ক্রিয়া ভিন্ন কর্ত্তা বা কৃতকর্ম্মের সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই।

পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রতিবাদ দূরীকরণ জন্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক আর্য্যগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া যে, বহু দেবতায় ও পরিশেষে নাস্তিকতাতে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু প্রাচীন দেবতাগণ অস্বীকৃত হইলে পর তাঁহারা দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ পদার্থের তত্ত্ব অবধারণ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা জগতের প্রকৃত আত্মা ও অবশেষে তাঁহাদের স্বীয় প্রকৃত আত্মা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর্য্যগণ হইতে আমাদেরই বা প্রভেদ কি? তাহাদের ন্যায় অদ্যাপি আমরাও কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার কল্পনা করিয়া থাকি। কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে, আমাদের মনে একবার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্ম-বিশ্বাস বিলুপ্ত হইবে, এবং আমাদের চক্ষু কাচ-চক্ষু হইয়া উঠিবে।

(১) Seneca, Benef. IV. 7, I.

আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া কার্য্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, এবং আমরা আত্মাশূন্য প্রাণী এবং উদ্দেশ্য-শক্তিশূন্য যন্ত্র হইয়া পড়িব।

(আর্য্যগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের এবং সীমাবদ্ধ হইতে অসীমের কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সুদীর্ঘ ও বন্ধুর হইলেও উহাই প্রকৃত পথ। এই জগতে উহার শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও অপর পথের অভাবে আমরা উহাতেই বিশ্বাস করিতে পারি। মনুষ্য ঐ পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নত হইয়াছেন। যতই ঊর্দ্ধে উঠা যায়, জগৎও তত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, স্বর্গও তত নিকটবর্ত্তী হয়, আমাদের অন্তঃকরণ ততই প্রশস্ত হইতে থাকে এবং আমাদের বাক্যের অর্থও ততই গূঢ় হইতে থাকে।)

এই স্থলে আমার একজন প্রিয়তম বন্ধুর—যাহার কণ্ঠধ্বনি দীর্ঘকাল অতীত হয় নাই এই ওয়েষ্টমিনষ্টর আবিতে শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার জীবন্তমূর্ত্তি আমার অধিকাংশ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে—বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। চার্লস কিঙ্গস্‌লে বলিয়াছেন "আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জগতের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, যদি সর্ব্ব-পিতা থাকেন, তবে তিনি কোথায়? তিনি থাকিলেও জগতে থাকিতে পারেন না, কারণ ইহা ধ্বংস হইবে। এমন কি সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণেও থাকিতে পারেন না, যেহেতু, ইহারাও ধ্বংস হইবে। তবে সেই অবিনশ্বর কোথায়?

"তৎপর এইরূপ ভাবিয়া আর্য্যগণ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ সমূহ অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল, নীল, অসীম স্বর্গরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

"ঐ অসীম স্বর্গরাজ্য পরিবর্ত্তনশীল নহে, সর্ব্বদাই এক ভাবাপন্ন রহিয়াছে। মেঘ, ঝড় ও জগতের বাষ্পচয় উহার অতি অধোদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। নভোমণ্ডল চিরদিনই স্থির ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐ অবিনশ্বর, দীপ্তিমান বিশুদ্ধ অসীম প্রদেশেই অবিনশ্বর ও অসীম সর্ব্ব-পিতা অবস্থান করিতেছেন।".

তাঁহারা এই সর্ব্ব পিতাকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন?

পাঁচ সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার অঙ্কুরও জন্মে নাই, আর্য্যগণ তাঁহাকে দ্যোপিতা বা স্বর্গীয়-পিতা বলিতেন।

চারি সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া পঞ্জাবের নদীতীরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দ্যোপিতা বা স্বর্গীয় পিতা বলিয়াছেন।

তিন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে হেলসপণ্ট নদীতীরবাসী আর্য্যগণ তাঁহাকে জিউস্ পিতা বা স্বর্গ-পিতা কহিয়াছেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইতালিবাসী আর্য্যগণ ঊর্দ্ধদিকে উজ্জ্বল স্বর্গাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে জুপিতর, স্বর্গ-পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মণীর অন্ধকারাবৃত বনমধ্যে টিউটন আর্য্যগণ-ঐ স্বর্গ-পিতাকে তাঁহার প্রাচীন নামে টিউ বা জিউ অর্থাৎ সর্ব্ব-শক্তিমান বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

ফলতঃ কোন ভাব এবং কোন নামই একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা যদি ঐ অদৃশ্য, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, অবিদিত, জগতের প্রকৃত আত্মা এবং আমাদেরও প্রকৃত আত্মা স্বরূপ পরমেশ্বরের কোন নাম রাখিতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে আমরা পুনরায় বালকের ন্যায় বাল্যভাবাপন্ন হইয়া অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া আমাদের "স্বর্গবাসী পিতা" ঈশ্বরের এই নাম ভিন্ন আর কি অধিক সুন্দরতর নাম বাহির করিতে পারি?

অসীমত্ব ও বিধির সম্বন্ধে ধারণা।

এখন ধর্ম্মের কাল যে অতীত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস যে স্বপ্ন বা বালসুলভ ক্রীড়া মাত্র এই মত সমর্থন করিতে আজি কালি প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রভৃতি অনেক বহুলপ্রচার সাময়িক পত্রিকা দেখা যায়। ইহাদের মতে অবশেষে দেবগণ নির্ণীত ও দূরীকৃত হইয়াছেন। ইহাদের মত যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে জ্ঞানাগম অসম্ভব, ভূতার্থ ও সীমাবদ্ধ বস্তু মাত্র লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকা কর্ত্তব্য, এবং অসীম, স্বভাবাতীত ও স্বর্গীয় প্রভৃতি শব্দ গুলি ভবিষ্যতে অভিধান হইতে দূরীকৃত করা আবশ্যক।

কোন ধর্ম্মের অনুকূল বা প্রতিকূলে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কারণ সকল ধর্ম্মের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকের অভাব নাই। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষা এবং ইতিহাসের সাহায্যে ধর্ম্মের মূল-নির্ণয় যত দূর সম্ভবে,তাহাই প্রদর্শনীয়। কোন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, সত্য কি মিথ্যা, তাহার নির্ণয়ে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, মোল্লা প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের তত্ত্ববিৎগণ ব্যাপৃত থাকুন। ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভূত হইতে পারে, আমাদের ন্যায় মনুষ্যজাতিই বা কিরূপে ধর্ম্ম লাভ করিল, ধর্ম্ম বা কি এবং কিরূপেই বা উহা উহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইল, এই সমস্ত নির্ণয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভাষাবিজ্ঞানে ব্যাপৃত হইলে কোন্ ভাষা সম্পূর্ণ বা কোন্ ভাষা অসম্পূর্ণ, কোন ভাষাতে বিশেষ্য পদ বা ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণে এস্থলে বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় না। সর্ব্ব প্রথমে এক মাত্র ভাষা ছিল, অদ্যাপি তাহাই আছে বা ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবে, এরূপ বিশ্বাস প্রথমে কাহারও থাকে না। আমরা কেবল ভূতার্থ সমূহ সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়া তৎসমুদয় উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হই। এতদ্দ্বারা ক্রমে সকল ভাষায় প্রকৃত মূল নির্ণয় করিতে পারি, যে যে নিয়মানুসারে মানব-ভাষার বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে পারে, এবং পরিণামে উহার যে দিকে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায় অবধারণ করিতে সমর্থ হই।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞানসম্বন্ধেও এইরূপ। প্রত্যেক লোকেরই স্বীয় মাতৃভাষা ও মাতৃধর্ম্মসম্বন্ধে নিজের মত বা ধারণা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিহাস লেখক হইয়া সকল বিষয়েই একতা অবলম্বন করিব। ইতিহাস-মুখে জগতের সকল ধর্ম্মের যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা কেবল তাহাই সংগ্রহ করিব, এবং তৎসমুদয় বাছিয়া বাছিয়া সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসেরই মূল নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হইব। যে যে নিয়মানুসারে মানব-ধর্ম্ম বর্দ্ধিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যেরূপে সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বর কল্পিত হয়, তাহার আবিষ্করণে চেষ্টা পাইব। সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটী সুসম্পন্ন ভাষা চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যেমন দুরূহ, আর সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটী সুসম্পন্ন ধর্ম্ম চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরদানও তেমনি দুরূহ। অতি অসম্পূর্ণ ভাষার ন্যায় অতি অসম্পন্ন ধর্ম্মেও যে, ধারণাতীত কোন সূক্ষ্ম অদ্ভুত পদার্থ আছে, এখন কেবল এইটুকু মাত্র জানিতে পারিলেই আমরা নানা প্রকার পবমার্থবিদ্যার বহুল জ্ঞান লাভ অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিক লাভবান্ মনে করিতে পারি।

এই রূপ প্রাচীন কথা আছে যে, কোন বিষয় জানিতে হইলে উহার মূল নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি, অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারি। কিন্তু যে গূঢ় মূল হইতে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যত দিন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিব, ততদিন ধর্ম্ম যে কি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য থাকিবে।

ধর্ম্মের প্রকৃত মূল অবধারণ করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রজ্ঞেরা যাহা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সকল স্থানেই সেই সেই শব্দ ব্যবহার করাই আমার অভিপ্রেত। তাঁহাদের মতে সকল প্রকার জ্ঞানই দুইটী মাত্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম বলিয়া, অবধারিত হইয়াছে। উহার একটীর নাম ইন্দ্রিয়দ্বার, অপরটীর নাম যুক্তিদ্বার। ধর্ম্মজ্ঞান সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, অবশ্যই ঐ দুই দ্বার দিয়া আসিবার সম্ভাবনা। আমরা এখন এই দুই দ্বার-দেশেই অবস্থান করিব। এই দুইটী ভিন্ন, আদিম প্রকটীকরণ ও ধর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতি দ্বার

দিয়া যে ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আপাততঃ চিন্তার প্রতিকূল বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, এবং সর্ব্ব প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া না আসিয়া যে জ্ঞান একবারেই যুক্তিদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ত্যাগ করা যাইবে, অথবা উহা প্রথম দ্বার-পথে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইবে।

আমি উল্লিখিত কয়েকটী নিয়ম স্থির করিয়া যে সকল ভাব ধর্ম্মচিন্তার প্রধান উপাদান স্বরূপ, তাহাদের ইন্দ্রিয়গত ও পদার্থগত প্রারম্ভ নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

সর্ব্ব প্রথমেই এইটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, যে, যে অনন্তের ধারণা সকল ধর্ম্মের মূলে লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা একবারে যুক্তি দ্বারা উদ্ভূত না হইয়া, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উহার আদিম আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে। অনন্তের ধারণা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসাপেক্ষ না হইত, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে আমাদিগকে উহা কাজে কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইত। এস্থলে হামিল্টন সাহেবের ন্যায় অনন্তের ধারণা ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। স্থান ও সময়ের সীমা কল্পনা করিতে হইলে সেই সীমাতীত স্থান ও সময়ের কল্পনা করিতে হয়, এই সকল মত যে সত্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষগণকে যে, ঐ ঐ যুক্তি স্বীকার করিতেই হইবে, এমন বলিতে পারা যায় না।

এই জন্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সীমাবদ্ধ পদার্থ মাত্রেরই কি বহির্ভাগে, কি পশ্চাতে, কি অধোদেশে, কি অভ্যন্তরভাগে সর্ব্বত্রই অসীম বা অনন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রহিয়াছে। উহা আমাদের চারি দিকেই ব্যাপৃত রহিয়াছে। আমরা যে সময় ও স্থানেকে সীমাবদ্ধ মনে করিয়া থাকি, তাহা কেবল অসীমের উপর একটী আবরণ নিক্ষেপ মাত্র। সীমাবদ্ধের কল্পনা ব্যতিরেকে যেমন অসীমের ধারণা অসম্ভব, সেইরূপ অসীমের কল্পনা ব্যতিরেকে সীমাবদ্ধের কল্পনা একবারেই অসম্ভব। জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত, বিশ্বাসও সেইরূপ সীমাবদ্ধের অধঃস্থিত অসীমের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আমরা যাহাদিগকে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও বিশ্বাস বলি, তাহারা সকলই এক আত্মার

তিনটী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য মাত্র। ফলতঃ আমাদের ন্যায় জীবগণের পক্ষে ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে যুক্তি ও বিশ্বাস উভয়ই অসম্ভব।

আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসসম্বন্ধে যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, উহা কেবল (সীমবদ্ধের আবরণের পশ্চাৎস্থিত অনন্তের বিবিধ নাম-কল্পনা চেষ্টার ইতিহাস মাত্র। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যগণ ও বৈদিক কবিগণ কিরূপে সর্ব্ব প্রথম বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, উষা ও সূর্য্য এবং অগ্নি, বায়ু ও বজ্র প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থে অদৃশ্য, অবিদিত ও অনন্ত অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি রূপে ঐ সকল নৈসর্গিক পদার্থে আত্মা, মূল পদার্থ বা ঐশ্বরিক আশ্রয় কল্পনা করিয়াছেন এবং ঐ রূপ করিতে করিতে কি রূপেই বা তাঁহারা দৃশ্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী অদৃশ্য অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া অদৃশ্যের, স্বাভাবিক পদার্থের পশ্চাতে স্বভাবাতীত পদার্থের, এবং সীমাবদ্ধের বাহ্যে বা অভ্যন্তরে অসীমের অনুভব মাত্র করিয়াছেন, তাহাও দেখান গিয়াছে। তাঁহারা ঐ অনন্তের যে নাম দিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে, কিন্তু ঐ নামের অনুসন্ধান অযৌক্তিক নহে। এই অনুসন্ধান-বলেই প্রাচীন আর্য্যগণ অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায়, স্বর্গস্থ পরম পিতার অস্তিত্ব নিরূপণে সক্ষম হইয়াছেন।)

তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়াই স্থির হন নাই। ঈশ্বর যে পিতা নহেন, সর্ব্ব প্রথমে এই ধারণা, তৎপরে পিতার ন্যায় এই রূপ ধারণা, এবং সর্ব্বশেষে পিতাই এই রূপ ধারণা বেদের অতি প্রাচীন সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের প্রথমে অগ্নির উদ্দেশে যে স্তোত্র সম্বোধিত হইয়াছে, তাহার অর্থ "পুত্রের উপর পিতার ন্যায় আমাদের উপর সদয় হও।" উপর্য্যুপরি ঐ ভাব বেদের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—ঋগ্বেদ ১ম, ১০৪, ৯, "হে ইন্দ্র! পিতার ন্যায় আমাদের কথায় কর্ণপাত কর।" ঋগ্বেদ ৩য়, ৪৯, ৩ শ্লোকে "ইন্দ্র আমাদিগকে আহার দেন, আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন, এবং পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন" কবি এই রূপ লিখিয়াছেন। ৭ম, ৫৪,২ তে পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় ইন্দ্র সদয় হইবার জন্য যাচিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ ৭ম, ২১, ১৪তে আবার এই ভাব দেখা যায়ঃ

"আপনি যখন বজ্রপাত করেন, এবং মেঘমালা একত্র করেন, তখন আপনি পিতার ন্যায় উক্ত হন।" ঋগ্বেদ ১০ম, ৮৩, ৬, "মূষিক যেমন তাহার লাঙ্গুল গ্রাস করে, হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! আপনার এই উপাসককেও বিষাদ ও পরিতাপ সেই রূপ গ্রাস করিতেছে। হে প্রভাবশালী ইন্দ্র! একবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদের প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ কর।" ঋগ্বেদ ১০ম, ৬৯, ১০, "পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে বহন করেন, আপনিও তাহাকে সেই রূপ বহন করিতেছেন।" ঋগ্বেদ ৩য়, ৫৩, ২, "পুত্র যেমন বস্ত্রাগ্র ধরিয়া পিতার সমীপে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ আমিও এই সুমধুর গীতি উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি।" বস্তুতঃ জগতের প্রায় এমন কোন জাতিই নাই, যাহারা তাহাদের দেবতা বা দেবতাগণের উদ্দেশে পিতৃশব্দ প্রয়োগ না করিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগত বিশ্বাসের আদিম অবস্থায় ঈশ্বরকে পিতৃসম্বোধন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ শব্দ মানব-সমাজে ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অর্থ-গৌরব অবশ্যই অভিপ্রেত অর্থাপেক্ষা কম হইবে। যেমন কোন শিশুকে মৃত্যুর পর সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ও এক পিতা হইতে অন্য পিতার ক্রোড়ে যাইবে, এই রূপ বিশ্বাস করিতে দেখিয়া, আমরা তাহার অবস্থায় ঈর্ষান্বিত হই, তদ্রূপ আমরা আমাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণকে হিংসা করিয়া থাকি। কিন্তু বালকেরা যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত শিখিতে থাকে যে, তাহার পিতাও বালক ও অন্য কোন পিতার সন্তান এবং বালকেরা যেমন মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশব্দের অর্থ হইতে অর্থান্তর গ্রহণ করিতে শিক্ষা করে, প্রাচীনেরাও সেই রূপ করিয়াছিলেন। আমরা অদ্যাপি যদি ঐ শব্দ ঈশ্বরোদ্দেশে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরাও ঐ পিতৃশব্দের এক বিশেষক হইতে অন্য বিশেষক, কার্য্যতঃ এক এক করিয়া সমস্ত বোধগম্য বিশেষক গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিব। মনুষ্যের পক্ষে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঈশ্বরোদ্দেশে অপ্রয়োজ্য, এবং ঈশ্বরে প্রযোজ্য হইলে মনুষ্যে অপ্রযোজ্য হইয়া উঠে। "জগতে কাহাকেও পিতৃ-সম্বোধন করিও না, কারণ তোমার পিতা যিনি, তিনি স্বর্গে অধিষ্ঠান

করিতেছেন," মথি,২৩শ,৯। অপহ্নুতি হইতে তুলনা আরম্ভ হইয়া থাকে,এবং উহা এই অপহ্নুতিতেই পরিসমাপ্ত হয়। মনুষ্য সর্ব্বত্র অনন্তের আবির্ভাব মনে করিয়া তাহার প্রতি অগ্নি,ঝড়, বায়ু, স্বর্গ বা প্রভু প্রভৃতি যে সকল নাম আরোপ করিয়াছেন, পিতৃশব্দ যে, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ পিতৃশব্দও সামান্য মনুষ্য-বাচক শব্দ মাত্র। বৈদিক কবিগণ উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া ব্যবহার করিলেও উহার অভিপ্রেত ও প্রকৃত অর্থগৌরবের বিভিন্নতা, পূর্ব্বপশ্চিমের বিভিন্নতার ন্যায় অত্যন্ত অধিক।

প্রাচীন আর্য্যগণ কি রূপে প্রকৃতির সর্ব্বদেশে অনন্তের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন এবং তাঁহারা কি ভাবে কোন্ দ্রব্যের নামকল্পনা করিয়াছেন, কি রূপেই বা বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নাম প্রকৃতির নানা দ্রব্যে আরোপিত হইয়া অবশেষে "স্বর্গীয় পিতা" নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছি। তাঁহাদের কল্পনার ও ধারণার বিরাম নাই। আরও কতকগুলি ধারণার উৎপত্তির কারণ এখন আলোচ্য। আপাততঃ ঐ সমুদায় ধারণা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহার মূলদেশ যে, সীমাবদ্ধ এবং উহা যে প্রকৃতি-নিহিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজি কালি আমরা অকারণে নৈসর্গিক জগতের অনুসন্ধানে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এই পথই সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব কালেই অন্ত হইতে অনন্তে প্রাকৃতিক হইতে অপ্রাকৃতিকে এবং প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে উপনীত হইবার প্রশস্ত পথ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বেদোক্ত দেব-বংশ।

এই বিচিত্র জগতের কোন্ কোন্ পদার্থ আমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্তম্ভিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা অবধারণ করিতে আমরা চেষ্টা পাইয়াছি। কিরূপেই বা তাঁহারা অবিস্মিত ভাবে ও এক দৃষ্টে উহাদের দিকে কেবল না চাহিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়েরও আলোচনা করা গিয়াছে, এবং যে বেদে অতি প্রাচীন ধর্ম্মোৎপত্তির কল্পনা সমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমাদের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ে চিন্তাবিকাশের প্রথম দিন

আর অতি পরিমার্জ্জিত ভাষায় সুঘটিত ছন্দে সর্ব্ব প্রথমে প্রশংসা-স্তোত্র লিখনের দিন, এই উভয়ের মধ্যে যে শত শত সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ কি। তথাপি, মানব-চিন্তার এমনই ক্রম-বিধান যে, মানব-ভাষা দ্বারা একবার সংযত হইয়া বৈদিক স্তোত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিতে পারা যায়। (আমরা যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও অতীন্দ্রিয়, চিত্তমুগ্ধকর এবং বিস্ময়-সূচক বলিয়া স্থির করিয়াছি, তৎসমুদয়ই বেদের মতে প্রাচীন আর্য্যগণের অনন্ত দর্শনের গবাক্ষস্বরূপ হইয়াছিল।)

অনন্ত শব্দের আদিম ধারণা।

অসীমরূপে অনন্ত ক্ষুদ্র ও অসীমরূপে অনন্ত বৃহৎ, এই দুই স্থলে অসীম শব্দটী যেমন পরিমাণ-অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, সর্ব্বত্র কেবল তেমন অর্থ বোধ হইবে না। যদিও অনন্ত শব্দের সাধারণতঃ এইরূপ ধারণাই সম্ভব, তথাপি উহা অতি সামান্য ও শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ অসীমের অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধ পদার্থমাত্রের অবস্থার কল্পনা করিতেন, অর্থাৎ তাহাদের কাছে অসীম পদার্থ সীমাবদ্ধের পশ্চাৎভূমি বা পূরক বলিয়া বোধ হইত। মনুষ্যের বুদ্ধিতে এক দিকে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, স্পৃশ্য বা সীমাবদ্ধের ভাগ যত অধিক হইত, অপর দিকে অদৃশ্য, অশ্রোতব্য, অস্পৃশ্য বা অনন্তের ভাগ তত কম হইত। ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহকতাশক্তির ন্যূনাধিক্যের সহিত উহাদের অগ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধে সংশয়ের প্রভেদ হইত।

পর্ব্বত ও নদীর অনুভূতি উষা ও ঝটিকার অনুভূতি অপেক্ষা অতি সহজে সিদ্ধ। প্রতিদিন প্রভাতে উষা আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা কি এবং কোথা হইতেই বা আইসে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বায়ু স্বেচ্ছাচারে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু উহা কোথা হইতে আইসে এবং কোথায়ই বা যায়, তাহা তুমি বলিতে পার না। নদীর প্লাবন ও পর্ব্বত পতন দ্বারা যে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা ধারণা করা সহজ, কিন্তু ঝটিকার আগমনে

কিরূপে বৃক্ষ শাখা অবনত ও ভগ্ন হইতে থাকে এবং প্রবল অন্ধকারময় ঝঞ্ঝাবাতের সময় কোন্ অদৃশ্য শক্তির বলে পর্ব্বত, কুটীর, অট্টালিকা প্রভৃতি পাতিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা আর্য্য ঋষিগণের পক্ষে তত সহজ হইয়া উঠিত না।

এইজন্য অর্দ্ধ দেবতা কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়ায় অপরাপর দেবতা-গণের ন্যায় উহাদের চরিত্র কল্পিত হইতে দেখা যায় না। ঐ সকল দেবতাদের মধ্যে আবার যাহারা একবারে অদৃশ্য, এবং যাহাদের প্রতিনিধি হইতে পারে, প্রকৃতিতে এমন কিছুই ছিল না—যথা ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, সর্ব্বব্যাপী বরুণ, তাহারা উজ্জ্বল আকাশ, উষা ও সূর্য্য প্রভৃতি অপেক্ষা শীঘ্রই পৌরাণিক আকার ধারণ করিয়াছে। যে সকল পদার্থ দেখিয়া ঐ সকলের অনন্ত ও স্বভাবাতীত প্রকৃতি কল্পিত হইয়াছে, তাহারা সামান্য মানবাকারে পরিণত হইবে। ইহারা অনন্ত বলিয়া অভিহিত না হইয়া বরং অজেয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর, অযোনিজ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্ষম প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইবে, এবং ক্রমে এইরূপে যে, ইহারা অনন্তের ন্যায় কোন গূঢ় শব্দে অভিহিত হইবে, তাহাও আশা করা যাইতে পারে।

এরূপ আশা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বড় নিরাপদ নহে। আমার বিবেচনায় এতদ্বিষয়ক যে সকল বিবরণ প্রমাণ-সহ পাওয়া যায়, তাহার ভাব গ্রহণ ও তাহার মর্ম্মাবধাবণ করিবার প্রয়াস পাওয়াই শ্রেয়ঃ।

অদিতি বা অনন্ত।

বেদে অসীম ও অনন্ত নামে একটী দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাইয়া আমি প্রথমে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। সংস্কৃতে উহা কেবল অদিতি নামে পরিচিত।

(অদিতি 'দিতি' এবং অস্বীকার সূচক 'ন' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। দিতি শব্দ দা (দ্যতি) বন্ধন, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহা হইতে আবার দিত বদ্ধ, এবং বিশেষ্য দিতি বন্ধন, নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব আদৌ অদিতি শব্দের, বন্ধন-শূন্য, শৃঙ্খল মুক্ত, অসীম, অনন্ত প্রভৃতি অর্থ ছিল। গ্রীকেও ঐ ধাতুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অদিতি—অনন্ত নামে যে দেবতা দেখা যায়, তাহা যে দীর্ঘকাল পরে কল্পিত বা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলিতে আর কোন কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন নাই। ইহা কি? এ বিষয় জানা অপেক্ষা বরং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা অবধারণ করিতে যত্নবান হওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। অনন্তের অনুভূতি আধুনিক বলিয়া বোধ হওয়াতে অনেকানেক সুশিক্ষিত বেদ-বিশারদ অদিতিকে আধুনিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অদিতির সন্তানগণ প্রসিদ্ধ আদিত্য বা সৌর দেবতার প্রসঙ্গে 'অদিতি' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অদিতির উদ্দেশে একেবারেই কোন স্তোত্র না দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদিতি দেবী অবশ্যই বৈদিক কবিতার শেষ সময়ে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

দ্যৌস শব্দের সম্বন্ধেও এই রূপ বলা যাইতে পারে। এই শব্দের গ্রীক প্রতিশব্দ জিউস। বেদে যে সকল দেবতার উদ্দেশে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ স্তোত্র আছে, তাহাদের মধ্যে অদিতির উল্লেখ অপেক্ষা বরং দ্যৌস শব্দের উল্লেখ কম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার কল্পনা আধুনিক হওয়া দূরে থাকুক, আমরা এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারতে একটী মাত্র সংস্কৃত কথা ও গ্রীসে একটী মাত্র গ্রীক কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেও ঐ দেবতা বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক উহা একটী অতি প্রাচীন আর্য্য দেবতা রূপে পরিচিত, পরে উহাই ইন্দ্র রুদ্র, অগ্নি প্রভৃতি ভারতীয় দেবতাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিয়াছে।)

অদিতি আধুনিক দেবতা নহে।

অদিতির সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। (দ্যৌস পৃথিবী, সিন্ধু এবং অন্যান্য প্রাচীন দেবতাগণের সহিত অদিতির নামও স্তোত্রমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদিতি কেবল আদিত্যগণের মাতৃরূপে কল্পিত না হইয়া সর্ব্ব-দেব মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।)

যাহা হউক এই বিষয় সম্যক্ বুঝিতে হইলে আমরা অবশ্যই অদিতির জন্ম-স্থান ও উৎপত্তি নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব। কিরূপে অসীম ও অনন্ত অদিতি

নামে উদ্ভূত বা কল্পিত হইল এবং প্রকৃতিতেই বা উহার কোন দর্শনীয় বিষয় বিরাজিত ছিল যে, তাহাতেই উহা অদিতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

অদিতির স্বাভাবিক উৎপত্তি।

অদিতি (অসীম) শব্দ যে উষার একটী অতি প্রাচীন নাম, তাহার আর সংশয় নাই। (আকাশের যে ভাগ হইতে প্রতিদিন প্রভাতে জগজ্জীবন ও জগৎপ্রভাকর প্রভা বিকাশ করিতেন, সেই ভাগই এই অদিতি নামে উক্ত হইয়া থাকিবে।)

উষার প্রতি একবার নেত্রপাত কর, এবং ক্ষণেকের জন্য জ্যোতিষের কথা বিস্মৃত হও, যখন রাত্রির অন্ধকারময় আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতে থাকে, বায়ু স্বচ্ছ ও জীবন্তভাব ধারণ করিতে থাকে এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন অবিদিত স্থান হইতে আলোকের সঞ্চার হইতে থাকে, তখন যথাসাধ্য নয়ন বিস্তার করিয়া অনন্ত পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছিলে, মনে এই রূপ বোধ হয় কি না? প্রাচীন ঋষিগণ মনে করিতেন, উষা অপর জগতের স্বর্ণময় দ্বারোন্মোচন করিতেছেন। সূর্য্যকে এই দ্বারদেশ দিয়া আড়ম্বরে গমনাগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহারা এই সীমাবদ্ধ জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া পরজগতে প্রবেশ করিতে বালকের ন্যায় চঞ্চল বা চপল হইয়া উঠিতেন। তাঁহারা উষাকে আসিতে ও যাইতে দেখিতেন, কিন্তু তৎপশ্চাতে যে উচ্ছ্বসিত অগ্নি বা আলোকসমুদ্র রহিয়া যাইত, তাহাকে কি দর্শনযোগ্য অনন্ত বলা যাইতে পারে না? বৈদিক কবিগণ উহাকে যে অদিতি, অসীম প্রভৃতি নাম দিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কি সুন্দর নাম হইতে পারে?

আমার বোধ হয়, যে দেবতা সর্ব্বপ্রথমে এত সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইত যে, আমরা প্রকৃতির মধ্যে কোথাও উহার জন্মস্থান নাই বলিয়া মনে করিতাম, এবং এত আধুনিক মনে হইত যে, আমরা বেদে উহার নামোল্লেখ মাত্র আছে, এমন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, এক্ষণে সেই দেবতাই হিন্দুগণের হৃদয়ে প্রথম সৃষ্টি ও সহজ সংস্কার স্বরূপ হইয়া থাকিবে (১)। সুদীর্ঘকাল পরে এই

(১) ঋগবেদ সংহিতার অনুবাদে আমি অদিতির বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি (Vol. I. pp. 230 251.)। ডাক্তার আলফ্রেড হিলেব্রান্দ্ সাহেবের এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট

অসীম অদিতির, আকাশ ও পৃথিবীর সহিত একীভূতত্ব কল্পিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অতি পূর্ব্বে আকাশ ও পৃথিবীর সহিত উহার অতি দূরতর সম্বন্ধ ছিল।)

দিবা রাত্রির প্রতিনিধি স্বরূপ মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে যে স্তোত্র সম্বোধিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এইরূপ দেখিয়া থাকি,(১) "হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা উষাসমাগমে রথারোহণ করেন, এই রথ উষার আবির্ভাবে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে উহার কেন্দ্র আলোকময় হইয়া উঠে (২)। আপনারা উহা হইতে অদিতি ও দিতিকে অর্থাৎ ইহ জগৎ ও জগতাতীত, সীমাবদ্ধ ও অসীম এবং নশ্বর ও অবিনশ্বর অবলোকন করিয়া থাকেন" (৩)।

অপর কোন কবি অদিতিকে উষার মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪); এই রূপে(অদিতি স্বয়ং উষা বলিয়া উক্ত না হইয়া উষাতীত অন্য কোন পদার্থ বলিয়া সূচিত হইয়াছে।)

সৌর দেবগণের প্রাচী হইতে উত্থান দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে বা বুঝিতে পারি যে, কি জন্য অদিতি উজ্জ্বল দেবগণের বিশেষতঃ মিত্র ও বরুণের (ঋগ্বেদ, ১০ম, ৩৬, ৩), অর্য্যমার ও ভগের এবং অতঃপর সপ্ত বা অষ্ট আদিত্যের অর্থাৎ প্রাচী হইতে উদীয়মান সৌর দেবতাদের মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বেদে সূর্য্য আদিত্য (ঋগ্বেদ ৮ম,১০১,১১ বৎ মহান্ অসি সূর্য্যঃ বৎ আদিত্য মহান্ অসি; সূর্য্য! তুমি যথার্থই মহান্, আদিত্য তুমি যথার্থই মহান্।) ও আদিতেয়, উভয় নামেই কথিত হইয়াছে (ঋগ্বেদ ১০ম,৮৮,১১)।

প্রবন্ধ আছে। তাঁহার মতে অদিতি দা (বন্ধন) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি অদিতির অর্থ অবিনশ্বরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদিতি সর্ব্বগত অর্থ-দ্যোতক নয়।

(১) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬২, ৮।

(২) প্রাতঃকালের আলোক এবং সন্ধ্যালোকের বিভিন্নতা সুবর্ণের ও লৌহের বর্ণের বিভিন্নতার ন্যায় ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) ঋগ্বেদ ১ম, ৩৫, ২।

(৪) ঐ ১ম, ১১৩, ১৯।

পুত্রগণের নামোল্লেখ হইতেই প্রথমাবধি অদিতির স্ত্রী-চরিত্র বা স্ত্রীত্ব কল্পিত হইয়াছে। অদিতি প্রভাবশালী, ভয়ানক রাজসন্তানগণের প্রসূতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে অদিতিকে পুরুষ দেবতা বা লিঙ্গবিহীন বলিয়া কল্পিত হইতে দেখা যায়।

উষায় সহিত অদিতির নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও উহাকে কেবল প্রাতে নয়, মধ্যাহ্নে, এবং সায়াহ্নেও উপাসিত হইতে দেখা যায়। (১)

অথর্ব্ববেদে (অথর্ব্ববেদ ১০ম,৮,১৬) লেখা আছে "যেখান হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং যথায় তিনি অস্তমিত হন, আমার বোধ হয়, তাহাই সর্ব্ব প্রাচীন এবং উহা অতিক্রম কবিয়া কেহই অধিক দূর যাইতে পারে না"। প্রাচীন শব্দের ভাষান্তব কালে অদিতি শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অদিতি যে কেবল তিমিরনাশিনী এবং শত্রুনিহন্ত্রী বলিয়া পূজিত হন, তাহা নহে, তিনি মানবের পাপ-তাপ-হারিণী বলিয়াও স্তুত ও পূজিত হইয়া থাকেন।

অন্ধকার ও পাপ।

অন্ধকার ও পাপ এই দুইটী ধারণা অপাততঃ আমাদের নিকট অতি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও প্রাচীন আর্য্যগণের মনে উহাদের অতি নিকট সম্বন্ধ বোধ হইত। শত্রু-ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে পাপ-ভয় অর্থাৎ অতি ভয়ানক শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিম্নে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করা যাইতেছে!—"হে আদিত্যগণ! আমাদিগকে হস্ত-পদ-বদ্ধ তস্করের ন্যায় শার্দ্দূল-কবল হইতে রক্ষা কর (২)। "অদিতি, দিবা ভাগে আমাদের পশুগণকে রক্ষা করেন। যে অদিতি কখন প্রতারণা করেন না, তিনি যেন আমাদিগকে রাত্রি কালে রক্ষা করেন। তিনি যেন উন্নতির সহিত আমাদিগের দুরিত হইতে নিস্তার করেন (৩)।

---

(১) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬৯, ৩।
(২) ঐ ৮ম, ৬৭, ১৪।
(৩) ঐ ৮ম, ১৮, ৬৭।

(অংহসঃ শব্দগত ও অর্থানুসারে উদ্বেগ হইতে, পাপের প্রপীড়ন হইতে) "হে জ্ঞানস্বরূপা অদিতি! দিবাভাগে আমাদিগকে সহায়তা কর। অদিতি যেন সদয় হইয়া আমাদের সুখোৎপাদন করেন এবং আমাদের শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন।"

পুনশ্চ যথা (১);—হে অদিতি! মিত্র ও বরুণ! যদি আপনাদের প্রতিকূলে কোন পাপাচার করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমি যেন ভয়-নিবারক সুবিস্তীর্ণ আলোক লাভ করিতে পারি। হে ইন্দ্র! সুদীর্ঘ ও প্রগাঢ় তমোরাশি যেন আমাদিগকে অভিভূত না করে। 'অদিতি যেন আমাদিগকে নিষ্পাপত্ব প্রদান করেন' (২)।

অদিতি শব্দের ধারণা হইতে স্বভাবতঃই আর একটী ধারণার উদ্ভব হইতে থাকে। যেখানেই যাই না কেন, সূর্য্য ও অন্যান্য স্বর্গীয় পদার্থের দৈনিক গমনাগমন হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা উদ্ভূত হইতে দেখা যায় (৩)। "তাঁহার সূর্য্য অস্ত গিয়াছে" আমরা অদ্যাপি এইরূপ বলিয়া থাকি। তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রাতঃকালে সূর্য্যের জন্ম হয় ও সন্ধ্যাকালে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা এক বর্ষমাত্র সংক্ষিপ্ত জীবন তাহার সুদীর্ঘ জীবন বলিয়া কল্পিত হইত। বর্ষান্তে সূর্য্যের মৃত্যু হইত; আমরাও অদ্যাপি এইরূপ বলিয়া থাকি যে, বর্ষের মৃত্যু হইল।

অমরত্ব।

এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ধারণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাচ্য দেশ হইতে আলোক ও জীবনের আগমন দৃষ্টে অনেক প্রাচীনজাতির মধ্যে এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল দেবগণের আবাস-স্থান ও অমরগণের অনন্ত গৃহ। পুণ্যাত্মারা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের সহবাসসুখাধিকারী হন, একবার এইরূপ ধারণা জন্মিলে, পুণ্যাত্মাদের ঐ পূর্ব্বদিকে নীত বা স্থানান্তরিত হওয়াও স্বর্গবাস বলিয়া কল্পিত হইতে পারে।

---

(১) ঋগ্বেদ, ২য়,২৭, ১৪।
(২) ঐ ১ম, ১৬২, ২২।
(৩) H. Spencer, Sociology, I. p. 221.

এইরূপ তাৎপর্য্যে আমরা অদিতিকে "অমর গণের জন্মভূমি" বলিয়া উক্ত হইতে দেখি, এবং এইরূপ তাৎপর্য্যে কোন বৈদিক কবি গাইয়াছেন, (১) "কে আমাদিগকে মহৎ অদিতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিবে যে, আমি পিতা মাতাকে দেখিতে পাইব?" ইহাকে অমরত্বের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর একটী কল্পনা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ কল্পনার নিদান আমাদের দৈনিক জীবনের ঘটনাবলি ও মনুষ্য-হৃদয়ের স্বাভাবিক জ্ঞান-বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বেদ হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টী আমরা শিক্ষা করিতে পারি। চিন্তা, এমন কি অতি সূক্ষ্ম চিন্তানিচয়ও আমাদের দৈনিক ব্যাপার সমূহ হইতে স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। মানব, প্রকৃতির এই স্বরে অন্যমনস্ক থাকিতে পারে, কিন্তু যত দিন ঐ স্বর শ্রুত না হইবে, ততদিন কি দিন, কি রজনী উহার বিরাম বা বিশ্রাম হইবে না। একবার শ্রুত হইলে ঐ স্বরের অভিপ্রায় ক্রমেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে থাকে, এবং সর্ব্ব প্রথমে যাহা সূর্য্যোদয় বলিয়া বোধ হয়, পরিশেষে তাহা অনন্তের প্রত্যক্ষ উন্মেষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পক্ষান্তরে সূর্য্যাস্ত অমরত্বের প্রথম দৃশ্যাকারে পর্য্যবসিত হয়।

বেদে অপরাপর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভাব বা ধারণা।

এক্ষণে আর কয়েকটী ধারণার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। এই সমস্ত ধারণা সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকট অতি সূক্ষ্ম ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইলেও উহাদিগকে মানব-চিন্তার কোন প্রাচীন স্তরে আরোপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু পরে ইহা বেদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানব-হৃদয়ে উচ্চ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। বেদ যত প্রাচীন, তদপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি উহার গূঢ় অভিপ্রায়, উৎপত্তি ও

---

(৪) ঋগ্বেদ, ১ম, ২৪, ১।

বিষয় উত্তমরূপ বিদিত আছি। এই সুপ্রাচীন বেদবৃক্ষের বেষ্টন মধ্যে বেষ্টনান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশেষে আর অধিক গণনা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা মানব-চিন্তার সুদীর্ঘ ও ধীর ক্রমোন্নতি অবলোকন করিয়া বিষম জড়িত হইতে থাকি। কিন্তু আপাততঃ যাহা অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, তাহার পার্শ্বে ও সম্মুখে অনেক প্রাচীন ও আদিম বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে আমার মতে প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু প্রথম হইতে চিন্তার কালবিভাগ-পরম্পরার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করা অবিধেয়। পুরাণ সাহিত্যবিদেরা বহুকাল এইরূপে বলিতেন যে, সর্ব্ব প্রথমে একটী প্রস্তর কাল ছিল। এই কালে দস্তা বা লৌহ-নির্ম্মিত কোন অস্ত্র বা যন্ত্র ছিল না। এই কালের পর পিত্তল কালের আবির্ভাব অনুমিত হইত। পিত্তল কালের সমাধিস্থলে পিত্তল প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু লৌহের কোন চিহ্ন ছিল না। সর্ব্বশেষে আমরা তৃতীয় কালের আবির্ভাব-বার্ত্তা শুনিয়া থাকি। এই কালে লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্রের প্রভাব কিংবা আধিক্য বশতঃ উপল ও পিত্তল-বিষয়ক শিল্প-নৈপুণ্যের গৌরব একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।

এই ত্রিকাল ও উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ-বিষয়ক মতে যে কিছু না কিছু সত্য মিশ্রিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা প্রাচীন সাহিত্য-বিষয়ক জল্পনা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অন্যান্য জল্পনার ন্যায় স্বাধীন চিন্তার গতি বহুকালের জন্য অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল। অবশেষে ইহা জানা গিয়াছে যে, যে সকল ধাতু এক সময়ে বা ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিত, যেখানে উল্কা সম্বন্ধীয় বা খনিজ লৌহ সহজে পাওয়া যাইত, সেখানে পিত্তলজাত দ্রব্যাদির পূর্ব্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রাদিও পাওয়া যাইত।

সুতরাং মানবের জ্ঞানোদ্ভবের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আমাদের যে একটী পূর্ব্বস্থিরীকৃত মত আছে, তদ্বিষয়ে উপরি উক্ত অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে হয়। বেদে প্রাচীন অস্ত্রের ন্যায় মানবের

ভাব এবং চিন্তাও সামান্য ও অমার্জ্জিত দেখা গিয়া থাকে। আবার তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে পিত্তলের ন্যায় উজ্জ্বল ও লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ চিন্তা দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমরা কি এই উজ্জ্বল চিন্তা প্রভৃতিকে অমার্জ্জিত প্রস্তর অপেক্ষা আধুনিক জ্ঞান করিব? ফলতঃ এরূপ জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কর্ত্তা কে তাহা, এবং সর্ব্বকালেই যে প্রতিভা-সম্পন্ন লোক জন্মিয়া থাকে ও এই প্রতিভা যে কোন কাল বিশেষে আবদ্ধ নহে, তাহাও একবার আমাদের মনে রাখা উচিত। বাহ্য জগতে ও আপনাতে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তাঁহার পক্ষে একবার মাত্র নেত্র উন্মীলনই সহস্রবার অবলোকনের ন্যায় কার্য্যকারী। প্রকৃত দর্শন-বিদের নিকট সমস্ত স্বাভাবিক দৃশ্য উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম, এবং তাহাদের প্রতিনিধি দেবতাগণ প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকার ন্যায় একবার মাত্র চিন্তাতেই তিরোহিত হইয়া যায়, এবং তিনি বেদের সুমধুর ভাষায় এইরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন—"কবিরা বহু নাম দিলেও উহা এক, দ্বিতীয় নাই; "একংসৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি!"

আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এখন বলিতে পারি যে, দর্শনশাস্ত্র বিদ্‌গণ এই বহু নাম পরিহার করিবার পূর্ব্বে কবিগণ অবশ্যই সর্ব্ব প্রথমে এই বিবিধ নাম দিয়া থাকিবেন। ফলতঃ কবিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির স্তুতি করিয়া আসিতে ছিলেন এবং তৎকালে ভারতের দর্শনশাস্ত্র-বিদ্‌গণ হিরক্লিতসের ন্যায় বৃথা বহু দেবের নাম, বহু দেবালয় ও দেবতাদের বহু প্রবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন।

নিয়মের সম্বন্ধে ধারণা।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অসভ্য ও আদিম জাতিদের মধ্যে নিয়মের সম্বন্ধে ধারণা একমাত্র দুর্ল্লভ পদার্থ বা দুর্ল্লভ ব্যাপার ছিল। এমন কি গ্রীক ও লাতিনে নিয়মের শাসনের প্রকৃত পরিভাষা পাওয়া সুকঠিন। ডিউক অব আর্গাইল একদা কোন আবশ্যক গ্রন্থের ঐ নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই অপরিস্ফুট নিয়মের ধারণাও অতি

প্রাচীন পদার্থ। আজি কালি অজ্ঞাত মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অনেক লিখিত হইয়াছে, এবং উহার অত্যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি অনেক হইয়াছে, তথাপি মানসিক কার্য্য এ পর্য্যন্ত চলিতেছে। সে সকল মানসিক কার্য্য এপর্য্যন্ত ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়োপরি সহস্র সহস্র ধারণা অঙ্কিত হইতেছে। উহার অধিকাংশই অনবহিত ভাবেই তিরোহিত হইতেছে এবং মানস-পট বা স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়াও যাইতেছে, কিন্তু কোন বিষয়ই যথার্থতঃ একেবারে স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইতে পারে না; কেন না নৈসর্গিক রক্ষণশক্তি তাহার একান্ত বিরোধী। প্রতি অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রেখা পড়িতে থাকে, উপর্য্যুপরি এইরূপ হইতে হইতে অপরিস্ফুট রেখা হইতে উজ্জ্বল রেখা হইয়া উঠে এবং পরিশেষে সমস্ত উপরিভাগ আলোক ও ছায়া-সমন্বিত হইয়া আমাদের মানস-পট ক্রমে উজ্জ্বল ছবির ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতির যে সমস্ত বিচিত্র ও লোমহর্ষণ ব্যাপার বা দৃশ্য দর্শন করিয়া মনুষ্য-হৃদয়ে সম্মান, ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হইত, সেই সেই দৃশ্যের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব, দিবা রাত্রির অভ্রান্ত গমনাগমন, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের পরিবর্ত্তন, চন্দ্রের পরিবর্দ্ধন, ঋতুভেদ পরম্পরা, নক্ষত্র-গণের নৃত্য প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকনে মানবহৃদয়ে পরিত্রাণ, শান্তি ও নিরুদ্বেগের ভাব উদয় হইয়াছিল। এই ধারণা সর্ব্ব প্রথমে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব মাত্র ছিল অর্থাৎ ইহা ব্যক্ত করিবার সহজ উপায় ছিল না। সুতরাং উহাকে এক প্রকার সংজ্ঞাহীন, মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বলিলেও বলিতে পারা যায়। কারণ যে অসংখ্য অনুভূতি হইতে ঐ ভাবের উদয় হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া সংজ্ঞাযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই উহার ধারণা করা অসম্ভব হইয়া উঠে না।

গ্রীশ ও রোমের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রবিৎদিগের মধ্যে এই ভাব নানা রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা;—"সূর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবে না; করিলে সত্যের সহকারিগণ ধরিয়া তাহাকে বাহির করিবে!" হিরক্লিতসের এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি? ফলতঃ বিশ্বসংসার বা

প্রকৃতি ব্যাপিয়া একটী নিয়ম রহিয়াছে, সূর্য্য বা সৌর দেবতাকেও ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হয়, ইহা যে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই কথা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে এই ধারণাটী অত্যন্ত ফলবতী হইয়াছিল। ইহা হইতে গ্রীকদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথমাঙ্কুরস্বরূপ অদৃষ্ট-কল্পনার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

রোমের দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের অতি প্রাচীন ও আদিম ভাব বা চিন্তা জানিবার প্রয়াস বিফল হইলেও এস্থলে কিকেরোর লিখিত একটী প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে; এই ভাবটী হিরক্লেতসের মত হইতে ভিন্ন নহে; কিকেবো বলেন "মনুষ্যের কেবল স্বর্গীয় পদার্থের নিয়ম-বিষয়ক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকা উচিত নহে; প্রত্যুত তাঁহার জীবনের নিয়মেও ঐ সকল বিষয়েব অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।" বৈদিক কবিগণও তাহাদের সরল ভাষায় ঠিক ঐ রূপ কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রকৃতির কোন দেশে শৃঙ্খলা, পরিমাণ বা নিয়মের জন্ম-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, ইহার প্রথম নাম কি ছিল এবং ইহার প্রথম অভিব্যক্তিই বা কি ছিল।

ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রলেখকদের মধ্যে সংস্কৃত "ঋত" শব্দের ব্যবহার অতি বিরল হইলেও আমার মতে এই শব্দ ভারতের ধর্ম্ম-কবিতা-তন্ত্রীসমূহের একটী প্রতিঘাত তুল্য বলিয়া বোধ হয়।

সংস্কৃত ঋত।

দেবতামাত্রেই কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহারা সকলেই এই ঋত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেই দুইটী করিয়া ভাব প্রকাশ করে। উহার প্রথমটী এই যে, দেবতারা প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রকৃতি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী। দ্বিতীয়টী, একটী নৈতিক নিয়ম আছে যে, মনুষ্যমাত্রকেই ইহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, ইহা অবহেলা করিলে দেবতারা শাস্তি দিয়া থাকেন। দেবতাদের

কেবল নাম ও নৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অপেক্ষা এইরূপ বিশেষণ পদের আবশ্যকতাই অধিক, যেহেতু ইহা দ্বারা ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাদের সম্যক্ উপলব্ধি করা অতীব দুরূহ।

বেদে একই স্তোত্রে কখন কখন ঋত প্রভৃতি শব্দের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং অনেক স্থলে স্পষ্ট রূপে উহাদের প্রভেদ করিয়া না থাকিবেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং যাহা করেন নাই, প্রায় কোন টীকাকারই তাহা করিতে সাহস করেন না। যখন আমরা স্বয়ং নিয়মের কথা বলি, উহাতে কি বুঝায়, তাহা কি আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া থাকি? তখন আমরা কি এমন বলিতে পারি যে, প্রাচীন কবিগণ আধুনিক দর্শনশাস্ত্রবিৎদিগের অপেক্ষা সূক্ষ্ম-দর্শী ও যথার্থ বক্তা ছিলেন?

যেখানেই ঋত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানেই যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, পবিত্র, আচার, বলি প্রভৃতি কতকগুলি অস্পষ্ট ও সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা কোন বৈদিক স্তোত্রের অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং এই সকল দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই মহা বিপদ উপস্থিত হয়; তখন নিরাশ হইয়া গ্রন্থ বন্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। যদি অগ্নি অথবা অন্য কোন সৌর দেবতা "স্বর্গীয় সত্যের প্রথম জাত বিষয়" বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলে কিরূপ ধারণা জন্মিতে পারে? সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা অনেক স্থলেই ঋত শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই, এবং ইহা হইতেই এই শব্দের ও শব্দার্থের ক্রমোন্নতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হই।

এরূপ প্রাচীন গৃহসংস্কারে যে অনেক বিষয় অনুমান-সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি ঋত শব্দের মূলভিত্তি ও গঠন সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহাও অনুমান বা আমার প্রথম চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঋত শব্দের আদিম অর্থ।

আমার বোধ হয়, ঋত শব্দ দ্বারা পূর্ব্বে কেবল সূর্য্য এবং অন্যান্য পদার্থের নির্দ্ধারিত গতি বুঝাইত। ঋত এই কৃদন্ত শব্দ, ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে সংযোজিত, উপযুক্ত, এবং স্থির, অথবা গত, যাওয়া বা যাইবার পথ বুঝায়। উভয়ের মধ্যে আমি দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটীই সঙ্গত মনে করি। নির্ঋতি শব্দেও এই ধাতু দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত অর্থ, চলিয়া যাওয়া, হ্রাস, বিনাশ, মৃত্যু, বিনাশের স্থান, গভীর রন্ধ্র এবং আধুনিক (অনৃত শব্দের ন্যায়) নরক।

গমন, জাঁকজমকের সহিত চলন, মহৎ দৈনিক গতি, কিংবা যে পথ প্রতিদিন সূর্য্য কর্ত্তৃক তাহার উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত, অধিকন্তু প্রাতঃকাল দিবা, রাত্রি ও তাহাদের অন্যান্য প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পরিভ্রমণ করা হয়, এবং যে পথকে রাত্রি কিংবা অন্ধকার কখন প্রতিরোধ করিতে পারে না, তাহাই যথার্থ গতি, ভাল কার্য্য ও সরল পথ বলিয়া গণ্য হইয়াছে (১)।

যাহা হউক, ইহা সেরূপ দৈনিক গতি, বা যে পথে ইহা পরিভ্রমণ করিয়াছিল, সে পথ নয়। ইহা যে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে গতি আরম্ভ করিয়া সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, ঋতের বিষয় বলিবার সময় বৈদিক কবিদিগের মনে তাহাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহারা ঋত পথের কথা বলিয়া থাকেন, আমরা ইহাকে কেবল প্রকৃত পথ বলিয়া অনুবাদ করিতে পারি। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা সেই অজ্ঞাত শক্তি-কৃত পথ বলিয়া থাকেন, তাহাকেও তাঁহারা ঋত নামে অভিহিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

যে পূর্ব্বদিক্ প্রতিদিন প্রাতঃকালে অসীম দূরত্ব বিকাশ করিত, যে স্থান হইতে সূর্য্য দৈনিক গতির নিমিত্ত উদিত হইতেন, অদিতি শব্দে প্রথমে কিরূপে সেই পূর্ব্বদিক বুঝাইত আপনারা যদি তাহা স্মরণ করেন, তাহা হইলে যে ঋত শব্দে স্থান বা যে শক্তি সূর্য্যের পথ নিরূপণ করে বুঝায়, তাহা বেদে সময়ে সময়ে অদিতি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। যেমন উষাকে অদিতির মুখ বলা হইত, সেই রূপ সূর্য্যকেও ঋতের

(১) ঋগ্বেদ, ৭ম, ৪০, ৪।

মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত (১)। আমরা এরূপ প্রার্থনা দেখিতে পাই, যাহাতে মহৎ ঋত (২) অদিতি, স্বর্গ এবং পৃথিবী এই সকলের পরবর্ত্তী স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋতের বাসস্থান ঠিক পূর্ব্বদিকে (৩), একটী প্রাচীন উপন্যাস অনুসারে, এইখানে আলোক আনয়নকারী দেবতাগণকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে লুক্কায়িত দস্যুদিগের বাসস্থান অন্ধকার-পরিপূর্ণ গহ্বর সকল ভাঙ্গিয়া গাভী সকল(৪) আনিতে হইত, অর্থাৎ প্রতিদিনকে এক একটী গাভী স্বরূপ বিবেচনা করা হইত; এই সকল দিন অন্ধকার হইতে পৃথিবীর ও স্বর্গের উজ্জ্বল গোচারণ স্থান দিয়া ধীরে ধীরে আগমন করিত। যখন এই কল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়, যখন সূর্য্য পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার দৈনিক গতির জন্য প্রাতঃকালে অশ্ব-যোজনা করিতেন, তখন যে স্থানে তাহারা তাহার অশ্বসকলকে খুলিয়া দিত (৫), সেই স্থান ঋত বলিয়া অভিহিত হইত। উষা ঋতের গহ্বরে বাস করিত (৬)। কি প্রকারে এই উষা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কি প্রকারেই বা উষা স্বয়ং ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে, রাত্রির্ অন্ধকার-পরিপূর্ণ অশ্বশালায় লুক্কায়িত পশু, বা ধনসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিত, তাহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

সরমার উপাখ্যান।

বৈদিক উপাখ্যানের মধ্যে ইন্দ্রের উপাখ্যানটীই সাধারণের মধ্যে বিদিত। কথিত আছে, ইন্দ্র লুক্কায়িত গাভীগণের অন্বেষণ জন্য প্রথমে সরমাকে (উষা) প্রেরণ করেন। সরমা গাভীগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া, সেই বার্ত্তা

---

(১) ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫১, ১।

(২) ঐ ১০ম, ৬৬, ৪।

(৩) ঐ ১০ম, ৬৮, ৪।

(৪) কোন কোন সময়ে এই সকল গাভী পরিদৃশ্যমান আকাশ হইতে অন্ধকারে নীয়মান মেঘ অর্থেও প্রয়োজিত হয়।

(৫) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬২, ১।

(৬) ঋগ্বেদ, ৩য়, ৬১, ৭।

লইয়া ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করে। অতঃপর ইন্দ্র যুদ্ধে দস্যুগণকে পরাভব করিয়া গাভীদিগকে উদ্ধার করেন। অবশেষে এই সরমা ইন্দ্রের কুক্কুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহার অপত্যগণ সারমেয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অধ্যাপক কুঃন্ হারমেয়স্ ও হারমেস্ শব্দের সহিত সারমেয় শব্দের একত্ব কল্পনা করেন। এই মাতৃগত নাম হইতেই প্রাচীন আর্য্যগণের পৌরাণিক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে অবতরণ করিবার এক মাত্র পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে, সরমা এই ঋত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ঋত স্থানে অর্থাৎ প্রকৃত স্থানে যাইয়া গাভীগণের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল (১)। একজন কবি লিখিয়াছেন, সরমা যখন পর্ব্বতের বিদীর্ণ স্থান দেখিতে পাইল তখন সে এই প্রাচীন প্রশস্ত পথকে এক দেশাভিমুখে ফিরাইল এবং নিজেই দ্রুত-পদ-সঞ্চারে পথ প্রদর্শক হইল। এই সময় সরমা গাভীগণের শব্দ বুঝিতে পারিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। (ঋগ্বেদ ৩য়, ৩১,৬)।

পূর্ব্বোক্ত কবিতায় দেবগণ তাহাদের অনুচরবর্গ অর্থাৎ প্রাচীন কবিগণ সমভিব্যাহারে গাভীগণ অর্থাৎ গাভীরূপ দিবালোকের উদ্ধার মানসে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ঋত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু অপর এক স্থানে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত ঋত বা প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হইবার পর বল নামক দস্যুকে বা তাহার গুহাকে খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন (২)।

দেবতারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিতে পারেন। এরূপ স্থান যখন অন্বেষণ করা হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত নিশ্চল ও অনন্ত স্থানের সৃজনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরুণ স্বয়ংই বলিতেছেন যে, আমি ঋতের আসনে আকাশকে স্থাপিত রাখিয়াছি (৩)। ফলতঃ তৎপরে সত্যের ন্যায় ঋত শব্দও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অনন্ত আদি বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

(১) ঋগ্‌বেদ ৫ম, ৪৫, ৭।

(২) ঐ ১০ম, ১৩৮, ১।

(৩) ঐ ৪র্থ,৪২, ৪।

ঊষা, সূর্য্য, দিবা ও রাত্রি যে পথ অনুসরণ করিতেন, সেই ঋত পথের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণতঃ ন্যায়ের পথ বা ন্যায়পথ শব্দ দ্বারাই কেবল উহার অনুবাদ কবিতে সক্ষম হই।

ঊষাব বিষয়ে আমরা এই রূপ দেখিতে পাই, (১) "তিনি ঋত পথের অনুসরণ কবেন; তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই উহা বিদিত ছিলেন, তিনি কখন রাজ্যের সীমার বহির্ভূত হন না।"

"আকাশ-সম্ভবা ঊষা,(২) ন্যায়মার্গে উদিত হইয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রচার করতঃ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি প্রেতগণকে দূরীভূত ও অসুখকর অন্ধকারকে অপসারিত করিয়াছেন"

সূর্য্য সম্বন্ধে (৩) এইরূপ কথিত হইয়াছে ঃ—

সবিতৃ দেবতা, সত্য পথে পরিভ্রমণ করেন,ঋতের শৃঙ্গ সুদুর উর্দ্ধে উন্নত। ঋত সক্ষম যোদ্ধার শৌর্য্য-বোধ কবিয়া থাকেন।

কথিত আছে, সূর্য্য উদিত হইলে ঋত পথ আলোকমালায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠে (৪)। হিরক্লিতসও ঠিক এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। "হেলিয়স সূর্য্যসীমা অতিক্রম কবিবেন না। এই ভাবটী ঋগ্বেদের কোন কবিতাতে ব্যক্ত হইয়াছে। যথাঃ—সূর্য্য নির্দ্ধারিত স্থানের অপচয় করেন না" (৫)। এস্থলে যে পথ ঋত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য স্থলে 'গাতু' নামে উল্লিখিত দেখা যায় (৬)। এই ঋত শব্দের ন্যায় প্রভাতের প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে গাতু শব্দেরও ব্যবহার দৃষ্ট হয় (৭)। দিবা ও রাত্রি যে পথে পরিভ্রমণ কবে (৮), উহা স্পষ্টই সেই পথ। এই পথ দিন দিন

---

(১) ঋগ্বেদ, ১ম, ১২৪, ৩।

(২) ঐ ৭ম,৭৫, ১।

(৩) ঐ ৮ম, ৮৬, ৫; ১০ম, ৯২,৪; ৭ম, ৪৪, ৫।

(৪) ঐ ১ম,১৬৬,২; ১ম,৪৬, ১১।

(৫) ঐ ৩য়, ৩০,১২।

(৬) ঐ ১ম,১৩৬,২।

(৭) ঐ ৩য় ৩১, ১৫।

(৮) ১ম, ১১৩,৩।

পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা আরো এরূপ অনেক পথের কথা শুনিতে পাই, যে সকল পথে অশ্বিনৌ, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা পরিভ্রমণ করেন (১)।

ইহা জানা আবশ্যক যে, যে পথ সাধারণতঃ ঋত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কথিত আছে প্রাচীন বৈদিক দেবতা—বরুণ রাজা সূর্য্যের পরিভ্রমণ জন্য সেই পথ প্রস্তুত করিয়াছেন (১ম, ২৪. ৮)। এক স্থানে যাহা বরুণের বিধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই আবার অন্যত্র কি জন্য ঋতের বিধান (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা আমরা এই রূপে বুঝিতে পারি। সর্ব্বব্যাপী আকাশ-দেবতা বরুণ স্বাধীন শক্তির ন্যায় কিরূপে ঋত নির্দ্ধারণ-ক্ষম বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তাহাও উপলব্ধি করা যায়।

যখন দেবতারা ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া অন্ধকারের শক্তি জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন যে তাহাদের উপাসকেরা ঐ পথানুসরণ করিবার জন্য দেবতাদিগকে স্তুতি করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ঋগ্বেদে ইহার নিদর্শন আছে যথাঃ—"হে ইন্দ্র আমাদিগকে ঋত পথ প্রদর্শন করুন, বিপদ-নাশক, ন্যায়-পথে লইয়া চলুন (৩)।"

কিংবা "হে মিত্র! হে বরুণ! নৌকারোহী যেরূপ সমুদ্র পার হয়, তদ্রূপ আমরা যেন আপনাদিগের অবলম্বিত ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হই (৪)।" এই মিত্র ও বরুণ যে, আবার ঋতের স্তুতি করিয়াছেন, তাহাও দৃষ্ট হয় (৫)। অপর এক কবি লিখিয়াছেন, "আমি উত্তম রূপে ঋত পথ অনুসরণ করিতেছি (৬)।" পক্ষান্তরে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, দুষ্কর্ম্মান্বিতেরা কখনই ঋত পথে পদার্পণ করিতে পারে না (৭)।

---

(১) ঋগ্বেদ, ৮ম, ২২,৭।

(২) ঐ ১ম,১২৩,৮।

(৩) ঐ ১০ম ১৩৩, ৬।

(৪) ঐ ৭ম, ৬৫, ৩।

(৫) ঐ ৮ম, ২৫, ৪।

(৬) ঐ ১০ম, ৬৬, ১৩।

(৭) ঐ ৯ম, ৭৩, ৬।

ঋত, যজ্ঞ বা হোম।

কতকগুলি প্রাচীন যজ্ঞ সূর্য্যের গতির উপর নির্ভর করিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে (১) কি রূপে দৈনন্দিন যাগ হইত; পূর্ণিমা ও প্রতিপদে কি রূপ শ্রাদ্ধ হইত, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যজ্ঞ কি রূপেই বা সূর্য্যের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক গতি ও তিন ঋতুর অনুক্রমে নিষ্পন্ন হইত, তাহা মনে হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে কালসহকারে স্বয়ং যজ্ঞ প্রভৃতিও ঋত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)।

অবশেষে ঋত শব্দ সাধারণতঃ বিধি অর্থ ব্যঞ্জক হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, নদী প্রভৃতি ঋত পথ অনুসরণ করিয়া থাকে (৩)। অপরাপর স্তোত্রে আবার এরূপ দেখা যায় যে, নদীগণ বরুণের ঋত বা বিধি অনুসরণ করিতেছে। ঋত শব্দের আরও অনেক অর্থ ও অর্থাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এস্থলে তাহার সমালোচনা আবশ্যক হইতেছে না। কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ঋত শব্দ যেমন ন্যায়, উত্তম ও সত্য অর্থ ব্যঞ্জক ছিল সেইরূপ অনৃত শব্দ আবার মিথ্যা, মন্দ, অসত্য মাত্র বুঝাইত।

ঋত শব্দের পরিপুষ্টি।

বেদে ঋত শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীতি করাইতে সক্ষম হইয়াছি কি না সন্দেহ। আদৌ কিরূপে উহা পৃথিবী, সূর্য্য, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল ও দিবা রাত্রির সঞ্চরণ ও পরিভ্রমণ বুঝাইত, কিরূপে প্রাচীমূলে ঐ সঞ্চরণের মূল কল্পিত হইত, স্বর্গীয় গ্রহের পথে কিরূপেই বা তাহার আভাস লক্ষিত হইত এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া দেবতাগণ অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকে আনিয়াছিলেন পরিশেষে সেই পথ কিরূপে মনুষ্যের যাগ যজ্ঞের ও নৈতিক জীবনের

---

(১) মনু, ৪র্থ ২৫, ২৬।

(২) ঋগ্বেদ, ১ম ১২৮,২ ; ১০ম,৩১,২ ; ১০,২ ; ১১০,২ ; ইত্যাদি।

(৩) ঐ ২য়, ২৮,৪ ; ১ম,১০৫ ১২ ; ৮ম,১২,৩।

অনুসরণীয় পথ বলিয়া অবধারিত হইয়া উঠিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না (১)। এই প্রাচীন অনুভূতির পরিপুষ্টিতে চিন্তার সমধিক বিশুদ্ধি আশা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ ঐ সমস্ত কবিকল্পনা হইতে যদি চিন্তার শুদ্ধভাব বাহির করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে উহাদের পক্ষ ভগ্ন হইবে এবং উহাদের আত্মা বিলোড়িত হইয়া যাইবে। রক্ত, মাংস ও জীবন না পাইয়া আমরা কেবল শুষ্ক অস্থি মাত্র প্রাপ্ত হইব।

অনুবাদ করিবার কাঠিন্য।

এইরূপ পর্য্যালোচনা করা অতি সহজ নহে। উহার মহৎ বিঘ্ন এই যে, আমাদিগকে প্রাচীন আকারবদ্ধ ভাব বা চিন্তা সকলকে আধুনিক আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। এই ব্যাপারে যে কতকটা ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা অপরিহার্য্য। অর্থগৌরবযুক্ত ও নবভাব-প্রকাশ-ক্ষম বৈদিক ঋত শব্দের ন্যায় কোন কোমল ও অনায়াস-প্রয়োজ্য শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা আমরা চিন্তার আদি কেন্দ্র নির্ণয় করিতে পারি, এবং তৎপরে উহার নানা দেশ-বিক্ষিপ্ত রশ্মির অনুগমন করিতে সক্ষম হই। আমি এইরূপ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছি এবং এইরূপ করিতে গিয়া যদি পুরাতন বেশের উপর একটী নূতন বেশ পরাইয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের সকলের কেবল সংস্কৃত না কহিয়া বৈদিক সংস্কৃত বলা উচিত। নচেৎ উপায়ান্তর দেখিতে পাই না।

ইংলণ্ডের কোন দর্শনবিৎ ও প্রসিদ্ধ কবি প্রাচীন হিব্রুদিগের দেহবদ্ধ জেহোবায় বিশ্বাস স্থানে "অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস" এইরূপ অনুবাদ করায় সম্প্রতি অতি নিন্দিত হইয়াছেন। সমালোচকেরা এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম ও আধুনিক ইংরাজী ভাব হিব্রু ভাষায় ব্যক্ত হওয়া

---

(১) হিব্রু ভাষার যাষার শব্দেরও এইরূপ পরিপুষ্টি দেখা যায়। See Goldziher, 'Mythology among the Hebrews,' p. 123.

অসম্ভব। এ কথা মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রাচীন বৈদিক কবিগণ আজি কালি জীবিত থাকিতেন, আর যদি তাঁহারা আধুনিক ভাব ভাবিতেন ও আধুনিক ভাষা কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে তাঁহাদের প্রাচীন ঋত শব্দের স্থানে "অনন্ত শক্তি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

ঋত শব্দ আর্য্যদিগের একটী সাধারণ কল্পনা কি না?

কেবল আর একটী মাত্র বিষয় অবধারণ করিতে বাকি আছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, ঋত শব্দটী বেদে অতি প্রাচীন চিন্তার স্তর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ শব্দটী বিশুদ্ধ বৈদিক, কিংবা দ্যৌস্, জিউস্ জুপিতর প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একটী সাধারণ আর্য্য-কল্পনা কি না।

ইহা অবধারণ করা সহজ নহে। লাতিন ও জর্ম্মণ ভাষার কথা পরস্পর সম্বদ্ধ অনেক ভাব প্রকাশ করে। এই সকল শব্দ কেবল ar ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নাই যে, উহারা বৈদিক ঋত শব্দের ন্যায় কেবল স্বর্গীয় পদার্থের আহ্নিক সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক গতির ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

সংস্কৃত ঋত শব্দ ভিন্ন ঋতু এই সাধারণ শব্দ দেখা গিয়া থাকে। আদৌ এই শব্দে বৎসরের গতি বুঝাইত, জেন্দ ভাষায় ঐরূপ রতু শব্দ দেখা যায়; কিন্তু উহাতে কেবল আদেশ না বুঝাইয়া আদেশকারীকেও বুঝায়।

সংস্কৃত ঋতু ও ঋত শব্দের সহিত লাতিন rîte, rîtus শব্দের একত্ব কল্পনা দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু লাতিনের ri সংস্কৃতের "ঋ"র প্রতিরূপ নহে। এই "ঋ" অর্ এর সূক্ষ্ম আকার; তজ্জন্য লাতিনে or er এবং ur এর প্রতিরূপ হইতে পারে।

লাতিন ordo এর সহিত অর্, বা ঋ ধাতুর সংশ্রব দেখাইতে আর কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে, ordo, ordinis সংস্কৃত ঋৎবানের সমান। ordior (বয়ন) শব্দে প্রথমে বোধ হয় কোন সামগ্রীর বিশেষতঃ সূত্রের যথাসন্নিবেশ বুঝাইত।

লাতিন rătus শব্দকে ঋত শব্দের সমান বলা যাইতে পারে; লাতিনে rătus শব্দে আদৌ নক্ষত্রগণের গতি বুঝাইত। আমার মতে লাতিন rătus ও সংস্কৃত ঋত একমূল ও এক অভিপ্রায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, বৈদিক ঋত শব্দের অর্থ ক্রমোন্নত হইয়াছিল, লাতিন শব্দটির সেরূপ কিছু হয় নাই। আমি স্বয়ং এই মতাবলম্বী হইলেও উহার দুরূহত্ব গোপন করিতে ইচ্ছা করি না। ঋত শব্দ লাতিনে সংরক্ষিত হইলে উহা artus, ertus, ortus কিংবা urtus ইহার কোন একটা হইবার সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু ratus কিংবা অনবধারিত অর্থ-বোধক irrĭtus শব্দে rĭtus কখনই হইতে পারে না। অধ্যাপক কুহ্ন যে, লাতিন ratus ও সংস্কৃত "রাত" শব্দের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আমার মতে তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি উহা "রা", দান করা, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যেমন লাতিন দা (dá) ধাতু হইতে dătum, redditum পদ হইয়া থাকে, ঠিক্ সেই রূপ রা ধাতু rătum, irritum হইতে পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে অধ্যাপক কুহ্নের ধাতুর অর্থ লইয়াই বড় গোলযোগ। রাত শব্দে দত্ত বুঝায়, এবং যদিও ইহার স্বীকৃত, অবধারিত প্রভৃতি অর্থ দেখা যায়, এবং যদিও জেন্দ ভাষায় দা ধাতু-নিষ্পন্ন দাত শব্দে দান করা ও নির্দ্ধারণ করা বুঝায়, তথাপি লাতিনে rătum, পদের যে আদৌ ঐ অর্থ ছিল, কে ব্সেনের মতে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না।

লাতিন ratus ও সংস্কৃত ঋতের একত্ব কল্পনায় যে শব্দগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহাও অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। লাতিন rătis (ভেলা) শব্দের সহিত সংস্কৃত অর্ (দাড় বাওয়া) এবং লাতিন gracilis শব্দের সহিত সংস্কৃত কৃশ শব্দের সংশ্রব দেখা যায়। যদি লাতিন ratus আর সংস্কৃত ঋত একই কথা হইল, তবে উহাও যে আদৌ স্বর্গীয় পদার্থের নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত গতি বুঝাইত, তাহা মনে করা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। পরিশেষে considerare, contemplari প্রভৃতি আরও অনেক শব্দের ন্যায় ইহাও ভিন্নাত্মক হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে সংস্কৃত ঋত শব্দ কিরূপে আদৌ স্বর্গীয় পদার্থের গতি, নিয়ম, অর্থ হইতে নৈতিক

নিয়ম ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অর্থ-ব্যঞ্জক হইয়া উঠে, এবং লাতিন ratus শব্দ ঐ মূল হইতে উদ্ভূত হইয়া লাতিন ও জর্ম্মণ ভাষায় প্রজ্ঞা-বিষয়ক নয়ম ও যৌক্তিকতা অর্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা অতীব প্রীতিকর বলিতে হইবে। ratus শব্দের সহিত সম্বন্ধ একই ধাতু হইতে আমরা লাতিন ratio (নির্দ্ধারণ, গণন, যোগ, বিয়োগ, যুক্তি) গথিক ভাষায় rathjo (সংখ্যা) rathjan (গণনা করা) এবং আদিম জর্ম্মণ ভাষায় radja (কথা) এবং redjon (কথা কহা) প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই।

ঋত জেন্দ ভাষায় অষ।

অন্যান্য আর্য্যভাষায় বৈদিক ঋত শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিবার প্রয়াস নিষ্ফল হইলেও এবং তন্নিবন্ধন দ্যৌস্ ও জিউস শব্দের ন্যায় এই শব্দকে আর্য্যবংশ পৃথক হইয়া পড়িবার পূর্ব্বরচিত প্রাচীন শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সুকঠিন হইলেও আমরা এমন দেখাইতে পারি যে, যে ইরাণ-বাসিদের ধর্ম্ম জেন্দ-আবেস্তায় দেখা যাইতেছে, এবং যে ভারতবাসীর ধর্ম্ম বেদে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের পৃথগ্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে এই শব্দ ও ইহার কল্পনা উভয়ই বিদ্যমান ছিল। আমরা জানি যে, আর্য্যভাষার পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত এই দুইটী শাখা উত্তর পশ্চিমাভিমুখে বিস্তৃত অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক হইয়া পড়িবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত একত্র ছিল। এই দুই ভাষায় অনেক সাধারণ শব্দ ও ভাবের একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্য কোথাও তৎসদৃশ শব্দ বা ভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই দুই জাতির ধর্ম্মে ও কর্ম্মকাণ্ডে এমন অনেক শব্দ দেখা যায়, যাহাদিগকে পরিভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তথাপি সংস্কৃত ও জেন্দ উভয় ভাষাতেই একই রূপ পরিভাষার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। জেন্দ ভাষার অষ শব্দ সংস্কৃত ঋত শব্দের প্রতিশব্দ। শাব্দিক বৈষম্য দেখিয়া আপাততঃ ঋত ও অষ শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঋত যথার্থতঃ অর্‌ত সংস্কৃত "র্‌ৎ", জেন্দ ভাষার "ষ"তে

পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা।(১) এ পর্য্যন্ত জেন্দ ভাষার "অষ" শব্দ পবিত্র অর্থে অনুবাদিত হইয়াছে এবং আধুনিক পারসীকেরা উহার এই অর্থই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সুদক্ষ ফরাসী অধ্যাপক মঁসুর দরমসতেতর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ শব্দের এই অর্থটী পরে হইয়াছে। বেদে ঋত শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আবেস্তার অষ শব্দের সেই অর্থ কল্পনা করিলে উহার অনেক অংশ সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেদের ন্যায় আবেস্তায় অষ শব্দ যে পবিত্রতা অর্থে অনুবাদিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যথানিয়মে যজ্ঞাদি ব্যাপারের সমাধান প্রসঙ্গেই উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অষ শব্দ ভাল চিন্তা বা ভাল ভাব, ভাল শব্দ ও ভাল কার্য্য প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাল অর্থে আচারমতে "ভাল বা ঠিক" অর্থাৎ অভ্রান্ত আবৃত্তি, ও অভ্রান্ত যজ্ঞানুষ্ঠান। আবেস্তার অনেক স্থল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জরথুস্ত্র নিয়মবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড বা ঋতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি কেমনে যাইতেছে; তাহারা কেমনে নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের মৈত্রী অবলোকন করিয়া এবং জীবন্ত প্রকৃতির সুনিয়ম-পরম্পরা, জীবোৎপত্তির বিচিত্র ব্যাপার ও যথাসময়ে শিশুর জীবনোপায় মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে বিশ্ব যেমন ঋতের অনুগামী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, আবেস্তার মতেও বিশ্ব সেইরূপ অষর অনুগমন করিতেছে। জগৎ অষর সৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশ্বস্ত পুরুষেরা জীবদ্দশায় অষের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য উপাসনা করিয়া থাকেন এবং পরলোকে অষের বাসস্থান স্বর্গধামে যাইয়া অহুর্‌মজদের সহবাস সুখ-লাভ করেন। ধার্ম্মিক উপাসক অষকে রক্ষা করিয়া থাকেন, জগৎ অষ দ্বারাই বর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন ও হইতেছে। অষ জগতের অত্যুচ্চ নিয়ম ও অষবান্

(১) অর্‌ত (ঋত) ও অষের পরস্পর সাদৃশ্য প্রথমে de Lagarde ও Oppert সাহেব নির্দ্দেশ করেন। হোগ্ সাহেবও ইহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন। Hubschmann কেও এই পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা যায়।

(অঘকে যে পায়, অর্থাৎ ধার্ম্মিক) হওয়াই উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীর এক মাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ভারতবাসিদের ইরাণীয়গণ হইতে পৃথক হওয়ার পূর্ব্বে প্রকৃতির নিয়মে বা বিশ্ব-বিধানে এই বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। উহা যে প্রাচীন সাধারণ ধর্ম্মের একটী অংশ বলিয়া পরিগণিত, এবং তন্নিবন্ধন আবেস্তার প্রাচীনতম গাথা হইতে ও বেদের সর্ব্বপ্রাচীন স্তোত্র হইতেও প্রাচীন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। উহা আধুনিক চিন্তার ফল স্বরূপ বলা যাইতে পারে না, অথবা ভিন্ন দেবতাতে ও জগৎশাসনে তাঁহাদের অসীম প্রভাবে বিশ্বাস তিরোধান হইবার পর উহা কল্পিত হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। উহাকে এক প্রকার সহজজ্ঞান বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ দেশস্থ আর্য্যগণের প্রাচীন ধর্ম্মের মূলে উহা দেখা গিয়া থাকে। তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রকৃত অবধারণা করিতে হইলে উষা, ইন্দ্র, অগ্নি ও রুদ্রের উপাখ্যান অপেক্ষা উহা সমধিক আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

সূর্য্য কখনই তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবেন না; ঋত বা জগৎনিয়মে এইরূপ বিশ্বাস হইলেও উহা প্রথমে কিরূপ ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা একবার ভবিয়া দেখুন। নিয়মশূন্য তমোরাশির সহিত নিয়মবদ্ধ বিশ্বের যেরূপ প্রভেদ, অদৃষ্টের ক্রীড়ার সহিত বিবেকী বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানের যেরূপ প্রভেদ, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে। যে সকল লোক আর কোথাও শান্তি-সুখ অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাদের প্রিয় বাল্যসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহাদের মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস বিষদুষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা স্বার্থপরতা প্রভৃতি পাপের আপাততঃ প্রাবল্য ও কার্য্যকারিতা দেখিয়া অন্ততঃ ইহ জগতে সত্য ও ধর্ম্মের পক্ষ আদরের অযোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত শত লোক আজ পর্য্যন্ত ঋত চিন্তায়— এই ঋত বা জগৎনিয়ম নক্ষত্রগণের অপরিবর্ত্তনশীল গতিতেই ব্যক্ত হউক, অথবা অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের বৃন্ত, পাপড়ি বা কেশর প্রভৃতিতেই প্রকটিত হউক—অবশেষে শান্তি-সুখ পাইতেছে। কত লোক ইহা আর সমস্ত বিষয়ে

সন্নিহান হইয়াও এই নিয়মবদ্ধ বিশ্বকে—প্রকৃতির এই সুন্দর নিয়মকে আপনার আশ্রয় স্বরূপ ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ করিয়াছেন! আমাদের চক্ষে এই ঋত অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর আদিমবাসিদের ইহাই সমস্ত ছিল। তাঁহাদের দেবগণ, তাঁহাদের অগ্নি, তাঁহাদের ইন্দ্র প্রভৃতি হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ ছিল। যেহেতু এক বার অনুভূত ও এক বার জ্ঞাত হইলে ইহা কখনই তাঁহাদিগকে হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইত না।

এক্ষণে আমরা বেদ হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, ভারতের প্রাচীন আর্য গণ কেবল নদী, পর্ব্বত, আকাশ সূর্য্য, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতিতে ঐশ্বরিক শক্তির বিশ্বাস না করিয়া অনন্তের কল্পনা ও প্রকৃতির নিয়মের ধারণা, সর্ব্বধর্ম্মের অত্যাবশ্যক এই যে দুইটী উপাদান আছে, তাহারও কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একটী উষার পশ্চাৎস্থিত সুবর্ণ সমুদ্র হইতে ও অপরটী সূর্য্যের প্রাত্যহিক পথ হইতে প্রকাশিত হইত। এই দুইটী ধারণা শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক মনুষ্যকর্ত্তৃক অবশ্য পরিগৃহীত হইবে। সর্ব্বপ্রথমে উহারা একটী মাত্র ছিল; কিন্তু এই শক্তি প্রাচীন আর্য্যগণের মনে যত দিন না এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে, "সকলই নিয়মানুগত" ও "কিছুই নিয়মের বহির্ভূত হইবে না," ততদিন এই শক্তি স্থির হইতে পারে নাই।

ইষ্টেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ।

একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের আদিম অবস্থা কি না?

বেদের অন্তর্গত প্রধান দেব-নিচয়ের সৃষ্টি-কল্পনা কেমন সুন্দর ও কেমন স্বাভাবিক, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনারা আমার সহিত একমত অবলম্বন করিয়া কহিবেন যে, মানবজাতি সর্ব্ব প্রথমে, একেশ্বর কি অনেকেশ্বরবাদী ছিল, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন, বিশেষতঃ ভারতবাসী কি ইউরোপীয়গণের পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা কোন ক্রমেই কঠিন কথা নহে(১)। বর্ত্তমানকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে এরূপ একটী সাধারণ মত প্রচলিত ছিল যে, প্রথমেই ঈশ্বর-প্রচারিত সত্য-ধর্ম্ম—একেশ্বরবাদ বিকশিত হয়। ফলতঃ এই ভ্রম-সঙ্কুল মত অপ্রচারিত থাকিলে উক্ত প্রশ্ন সমুত্থিত হইতে পারিত না। অনেকের বিশ্বাস যে, ইহুদিগণ কেবল তাহাদের একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে নাই। ইহা ছাড়া আর সকল জাতিই ক্রমে অনেকেশ্বরবাদী হইয়া দাঁড়ায়, এবং পরিশেষে জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমে পুনরায় দার্শনিক ও একেশ্বরবাদী হইয়া উঠে।

এই প্রমাদ-সঙ্কুল মত বিনষ্ট হইতে কতকাল লাগিয়াছিল, ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। এই মত হয়ত কতবার খণ্ডিত হইয়াছে কতবার ধর্ম্মবিদ্‌গণ উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি নানা গ্রন্থে এমন কি বিদ্যালয়ের গ্রন্থেও যে, এই ভ্রমপূর্ণ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। ফলতঃ এই ভ্রমাত্মক মত কণ্টক বৃক্ষাকারে সমস্ত স্থানে ব্যাপৃত থাকিয়া পবিত্র ধর্ম্ম-সম্পত্তি বিনষ্ট করিতেছে।

---

(১) আদিম অনেকেশ্বরবাদের প্রতিকূলে ও অনুকূলে পিকটেট, ফি ডবব, সেরর, বেনফে ও রথ সাহেবের মত মুইর সাহেবের "সংস্কৃত মূল" গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪১২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। অনুকূল পক্ষে কোন কোন স্থলে আমার মতও গৃহীত হইয়াছে। আমি কোন্ অংশে এই অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা উপস্থিত প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইবে।

ভাষা-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

এসম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ এতদ্বিষয়ক বিশিষ্ট প্রমাণ বাইবেল, বেদ কি অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে না থাকায়, মধ্যকালের ও আধুনিক গ্রন্থকারগণ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্ম যেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাষার প্রথমোৎপত্তি ও ঠিক ঐরূপে হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারের মতে হিব্রুই আদি ভাষা। আর সকল ভাষা হিব্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রীক, লাতিন, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা যে হিব্রু হইতে উৎপন্ন, তাহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া এই সকল মহাত্মারা বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকে যে, কত পাণ্ডিত্য ব্যয় ও কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়! হিব্রু ভাষাকে অন্যান্য ভাষায় প্রসূতি বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পুনঃ পুনঃ বিফল হওয়াতে মানব-ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রমাণ অপক্ষপাতে সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহাকে ভাষার ঐতিহাসিক গবেষণা কহা যায়। ইহা দ্বারা জগতের সমস্ত ভাষাই শ্রেণীবদ্ধ হওয়াতে হিব্রু ভাষা অন্যান্য সেমিতিক ভাষার এক দেশে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক প্রস্তাব একটী নতুন প্রশ্নস্বরূপ হইয়া উঠে। প্রশ্নটী এই, প্রত্যেক মানব-ভাষার ধাতু ও ধারণার প্রাথমিক মূল কি? ভাষা-বিজ্ঞানের উদাহরণের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-বিজ্ঞান পাঠকেরাও ঠিক উক্তরূপ ফল লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সকল ধর্ম্মকে ইহুদি ধর্ম্মের অপভ্রংশ বা উহার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মূল হইতে আগত মনে না করিয়া জগতের সমস্ত পবিত্রগ্রন্থ-লব্ধ ধর্ম্মচিন্তার আদিম ইতিহাস, নানা জাতির আচার ব্যবহার, এমন কি তাহাদের ভাষা হইতেও ধর্ম্ম-ভাব-বিষয়ক সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে স্থির করিয়াছেন। এইরূপে সংগৃহীত সমস্ত বিষয়ের শ্রেণী ভাগ করিয়া তাঁহারা এক দিকে কেবল ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও অপর-দিকে বাহ্য জগৎ স্বীকার পূর্ব্বক কিরূপ নানা ধর্ম্মের মূল—অনন্তের ধারণা কল্পিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন।

এই উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে আর একটী সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাষার

উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার হ্রাস ও ক্ষয় দেখা যায়। বর্দ্ধনশীল বস্তুমাত্রেরই ধ্বংশ ও ক্ষয় আছে; তাহা না থাকিলে বর্দ্ধন-কার্য্য যে, সুন্দররূপ হইতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষার ন্যায় ধর্ম্মেরও উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং দূষিত পদার্থের দূরীকরণ ও নূতন পদার্থের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উহার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ধর্ম্ম আর পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব, তাহা প্রাচীন ভাষার ন্যায় কিছুকাল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু শেষে প্রচলিত ভাষার প্রবাহে যেমন প্রাচীন ভাষা বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলিয়া যাহা প্রচার করে, তাহার আঘাতে উক্ত অপরিবর্ত্তিত ধর্ম্মও প্রতাড়িত ও দূরীভূত হইয়া যায়।

আবার যখন কাহাকেও আর স্বাভাবিক কিংবা মূল ভাষায় কথা কহিতে শুনা যায়না, তখন উহাতে কি বুঝায়, তাহা ঠিক করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এইরূপে এমন এক সময় আসিবে, যখন স্বাভাবিক কি প্রকৃত ধর্ম্ম বলিলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। এক্ষণে মনুষ্যকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সকল বিষয়ই আয়ত্ত করিতে হয়। যে কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রম স্বীকার করিলেও কেবল কণ্টক-বৃক্ষ উৎপাদিত না হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হঠাৎ যদি স্বর্গ হইতে সুসম্পন্ন ব্যাকরণ ও অভিধান আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যে সকল প্রাণী নিজ নিজ অনুভূতি কল্পনায় পরিণত করিতে শিখে নাই এবং এক কল্পনার সহিত অপরের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই, উহা তাহাদের যে, কোন উপকারেই আইসে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। উহা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নিজ মাতৃভাষা না থাকিলে কেই বা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারে? আমরা বাহির হইতে নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে পারি; কিন্তু ভাষা ও ভাষা-সম্বন্ধে যাহা বুঝায়, তাহা অবশ্যই ভিতর হইতে আইসে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। ধর্ম্ম কি, যাহাদের তাহা বোধ নাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরা কি তাহাদিগকে একবারেই খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝাইতে সক্ষম হন? অতি অসভ্যজাতির হৃদয়ে যে কয়েকটী ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে; ধর্ম্ম প্রচার

সর্ব্ব প্রথমে তাহাই উদ্ধার করিতে থাকেন। যত দিন তাহাদের মানস-ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৰ্দ্ধিত না হয়, ততদিন তিনি উন্নত ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে সাহসী হন না।

ঈশ্বরের বিশেষণ।

যদি এই ভাবে ধর্ম্মালোচনা করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে অনেকেশ্বর কি একেশ্বরবাদী ছিলেন, এ প্রশ্ন আর উঠিতে পারে না। চিন্তার যে সোপানে মনুষ্য একবার আরোহণ করিয়া, একই হউক বা বহুই হউক, যে কোন পদার্থকে ঈশ্বর বলিতে পাবেন, সেই সোপানে উপস্থিত হইয়া তিনি অৰ্দ্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর শব্দটী বাহির করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ পদার্থে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ কোন্ বস্তুতে "ঈশ্বর" নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের এক্ষণে দেখা আবশ্যক, মনুষ্য কিরূপে সর্ব্ব প্রথমে স্বর্গীয় বিষয় অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন এবং কি কি উপাদান হইতেই বা এই অনুভূতি গঠিত হইল। তৎপরে প্রশ্ন এই যে, কিরূপে তিনি এক বা বহুকে স্বর্গীয় বলিতে শিখিলেন? ধর্ম্ম-বিষয়-লেখকেরা (১) কহিয়া থাকেন যে, "আদিম-লোকেরা তাঁহাদের চতুর্দ্দিকের মহান্ নৈসর্গিক পদার্থকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন"। একথা বলা আর মোম আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মোম-চর্চ্চিত-শব-রক্ষণ প্রথার কল্পনা করা, উভয়ই তুল্য।

---

১ "প্রাচীন আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতি যতই প্রগাঢ় ও স্বভাবাতীত বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তাঁহারা প্রকৃতি-রাজ্যের যে সকল মহৎ পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, যৎসমুদয় তাঁহাদের হৃদয়ে বিস্ময়মিশ্র ভীতি জন্মাইয়া দিত, তৎসমুদয়কেই দেবতা বলিতেন। এই সকল পদার্থের জ্ঞান; ঐ পদার্থগুলি সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছিল। এইজন্য আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতিকে তাঁহারা 'দেবতা বলিয়া মনে করিলেও তাহাদিগকে তাহাদের বাহ্য দৃশ্যের অনুযায়ি নামে বিশেষিত করিয়াছিলেন" ।—মুইর, 'সংস্কৃতমূল,' ৫ম খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা।

বেদ-দত্ত নব উপকরণ।

যাঁহারা এরূপ মনে করেন যে, বেদ ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের এই সমস্ত উপপাদ্যের মীমাংসা করিতে সক্ষম, আমি তাঁহাদের মধ্যে নই। ভারতবাসিদের মধ্যে যেরূপে ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছিল, জগতের অন্যান্য জাতির মধ্যেও যে ঠিক সেই রূপ হইয়াছে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রম। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক একের সহিত অপরের তুলনা করিতে যাইয়া আমরা ইহাই দেখিয়া চমৎকৃত হই যে, কত ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক একই উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায় সাধিত হইয়াছে। বেদ অনুশীলন করিলে ধর্ম্মোদ্ভেদের একটী অবিচ্ছিন্ন স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্রোতটী বড় আবশ্যক। পূর্ব্ব হইতে যদি কোন দৃঢ় আত্মসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া উহার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন কি না, এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়।

ইষ্টেশ্বরবাদ।

বৈদিক ভারতবাসিদের মধ্যে যে প্রাচীন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, একেশ্বরবাদ বা অনেকেশ্বরবাদ তাহার সাধারণ নাম হইতে পারে না। উহাকে ইষ্টেশ্বর-বাদ অর্থাৎ মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে যে সকল অর্দ্ধ-স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য এক একটী পদার্থে অদৃশ্য ও অনন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস ও তাহাদের পূজা, বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ঐ সকল পদার্থ ক্রমে অসীম, অনৈসর্গিক ও ধারণার অতীত হয়। পরিশেষে উহা অসুর, দেব ও অমর্ত্ত্য শব্দে বিশেষিত হইতে থাকে, সর্ব্বশেষে অমর, অনন্ত স্বরূপ হইয়া উঠে। ফলতঃ মানব-বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ কল্পিত হই-য়াছে, উহা তদ্গুণযুক্ত ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়।

ধর্ম্মভাবের এইরূপ মনোহর ও সুন্দর কল্পনা বেদ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ বেদ না থাকিলে এরূপ উচ্চ কল্পনার সুন্দর নিদর্শন চিরদিনই অবিদিত থাকিত।

সূর্য্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

নৈসর্গিক পদার্থ যে, অনৈসর্গিক ও অবশেষে স্বর্গীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সূর্য্য তাহার এক প্রধান উদাহরণ স্থল। সূর্য্যের বহু নাম কল্পিত হইয়াছে, যথাঃ—সবিতা, মিত্র, পূষা ও আদিত্য ইত্যাদি। এক্ষণে কিরূপে এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটী স্বাধীনরূপে কোন না কোন একটী সচেষ্ট জীবন্ত ভাবপূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে, তদ্বিষয় আলোচনা করা বড়ই প্রীতিকর কার্য্য। বৈদিক ধর্ম্মের অনুশীলন সময়ে উহাদের প্রত্যেকটীকে অপরাপর গুলি হইতে পরস্পর যত দূর সম্ভব, পৃথক রাখা উচিত। উহারা কিরূপে এক সাধারণ আদি মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে একই পদার্থকে বুঝাইত, আমাদিগের পক্ষে তাহাই অনুসন্ধান করা সমধিক প্রয়োজনীয়।

সবিতা, মিত্র প্রভৃতির মধ্যে যে কোন নামে সচরাচর সূর্য্যের যে সমস্ত বর্ণনা দেখা যায়, যে কোন ব্যক্তির কবি-কল্পনা বোধ আছে, তিনি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সূর্য্য আকাশের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)। উষা তাঁহার স্ত্রী (২) ও কন্যা (৩) উভয় নামেই বিশেষিত হইয়াছেন। উষা আকাশের কন্যা (৪) বলিয়া উক্ত হওয়ায় তাহাকে সূর্য্যের ভগিনী বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আবার ইন্দ্রকে কখন সূর্য্য ও উষা, উভয়েরই পিতা বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায় (৫)। অন্যপক্ষে উষা আবার সূর্য্যের প্রসূতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৬)। এই গুলি পুরাণ-গঠনের যথেষ্ট উপাদান। যাহা হউক আপাততঃ এতদ্বিষয়ক সবিস্তার বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীক কবিতায় সূর্য্যের যেমন রথ কল্পিত হইয়াছে, বেদেও সেইরূপ

---

১ ঋগ্বেদ, ১০ম, ৩৭, ১, দিবঃ পুত্রয়ঃ সূর্য্যস্ত সংসত।

২ ঐ ৭ম, ৭৫, ৫, সূর্য্যস্ত যোষা।

৩ ঐ, ৪র্থ, ৪৩, ২, সূর্য্যস্ত দুহিতা।

৪ ঐ, ৫ম, ৭৯, ৮, দুহিতা দিবঃ।

৫ ঐ, ২য়, ১২, ৭, যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান।

৬ ঐ, ৭ম, ৭৮, ৩, অজীজনং সূর্য্যং যজ্ঞং অগ্নিম্।

এক (১) বা সপ্তাশ্বযুক্ত রথ কল্পিত দেখা যায় (২)। নানা রূপ বিভিন্নতা থাকিলেও এই সপ্ত হরিৎযুক্ত রথকে গ্রীক রথের প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্য দেবতাদিগের মুখ (৩) এবং মিত্র, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি সাকার দেবগণের চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৪)। তিনি তাঁহার অশ্বগণকে যান হইতে মুক্ত করিলে পর রাত্রি তাহার আবরণ বিস্তার করিয়া থাকে (৫)। সূর্য্যের এইরূপ উপাখ্যান প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্য প্রসবিতা (৬) নামে উক্ত হইলেও সবিতা নামে উহাকে সমধিক স্বাধীন ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়। তিনি যখন সবিতা নামে উক্ত হন, তখন তিনি হিরণ্য রথারূঢ় (৭), হরিৎ কেশ (৮), হিরণ্যহস্ত (৯), হিরণ্যপাণি (১০), হিরণ্যাক্ষ (১১), এমন কি হিরণ্যজিহ্ব (১২) ও অয়োহনু (১৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। তিনি পিঙ্গলবর্ণ বর্ম্ম (১৪) ধারণ করিয়া অরেণু পথে পরিভ্রমণ করেন (১৫)।

---

১ ঋগ্বেদ ৭ম, ৬৩, ২, যৎ এতসঃ বহতি।
২ ঐ, ১ম, ১১৫, ৩, অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য। ৭ম, ৬০, ৩, অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ।
৩ ঐ, ১ম, ১১৫, ১, চিত্রং দেবানাং উদগাৎ অনীকম্।
৪ ঐ, ১ম, ১১৫, ১, চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ।
৫ ঐ, ১ম, ১১৫, ৪, ।
৬ ঐ, ৭ম, ৬৩, ২, প্রসবিতা যজ্ঞানাম্।
৭ ঐ, ১ম, ৩৫, ২, হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন।
৮ ঐ, ১০ম, ১৩৯, ১, হরিৎকেশঃ।
৯ ঐ, ১ম, ৩৫, ১০, হিরণ্যহস্তঃ।
১০ ঐ, ১ম, ২২, ৫, হিরণ্যপাণিঃ।
১১ ঐ, ১ম, ৩৫, ৮, হিরণ্যাক্ষঃ।
১২ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৭১, ৩, হিরণ্যজিহ্বঃ।
১৩ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৭১, ৪, অয়োহনুঃ।
১৪ ঐ, ৪র্থ, ৫৩, ২, পিসঙ্গং দ্রাপিং প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ।
১৫ ঐ, ১ম, ৩৫, ১১, পন্থা অরেণবঃ।

সূর্য্যের আর একটী নূতন নাম মিত্র (১)। তিনি প্রভাতের বা দিবার দীপ্তিমান্‌-ও প্রফুল্ল সূর্য্য (২)। আধুনিক ভাষাতেও দিবা ও সূর্য্যের একই অর্থ দৃষ্ট হয়। কখন কখন কোন কবি সবিতাকে মিত্র বলিয়াছেন (৩) অন্ততঃ তাঁহার মতে সবিতা ও মিত্র একই কার্য্য করিয়া থাকেন। মিত্রকে প্রায়ই বরুণের সহিত একত্র সমাহূত হইতে দেখা যায়। উভয়েই এক রথাসীন; ঐ রথ উষার আগমনে স্বর্ণবর্ণ এবং সূর্য্যাস্তসময়ে লৌহবর্ণ হয় (৪)।

সূর্য্যের অপর একটী নাম বিষ্ণু। বিষ্ণুও যে, আদৌ সৌর দেবতা ছিলেন, তাহা তাঁহার ত্রিপদ (৫) হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই ত্রিকালে অবস্থান তাঁহার ত্রিপদ। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য-গৌরবে শেষে তদীয় এই নৈসর্গিক চরিত্র শীঘ্রই তিরোহিত হয়।

পূষার অবস্থা আবার অতীব হীন। মেষপালকদের দৃষ্টিতে তিনিও আদৌ সূর্য্য ছিলেন। তিনি অজাশ্ব (৬) (অর্থাৎ অজাগণ তাঁহার অশ্ব ছিল), পশু-চালনার দণ্ড-ধারী (৭) এবং হিরণ্যবাসী (৮) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

---

১ মিত্র—মিৎ-ত্র—বৈয়াকরণদিগের মতে মিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর অর্থ, স্থূল হওয়া, স্থূল করা, দীপ্ত করা, আনন্দিত করা, ভালবাসা। স্নিহ্‌ ধাতুতেও এই সকল অর্থ পাওয়া যায়। মিদ্‌ ধাতু হইতে মেদ, মেদিন্‌ সিদ্ধ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ ১০ম, ১, ৩৩, সূর্য্যেণ মেদিনা। উক্ত বেদের ৫ম, ২০, ৮ শ্লোকের ইন্দ্রমেদী ও ঋগ্বেদের ৭ম, ৩৭, ২৪ শ্লোকোক্ত ইন্দ্রসখার অর্থ এক।

২ অথর্ব্ববেদ, ১৩শ, ৩, ১৩, স বরুণঃ সায়ং অগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্‌, স সবিতা ভূত্বান্তরীক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্‌; ঋগ্বেদ, ৫ম, ৩ দেখ।

৩ ঋগ্বেদ, ৫ম, ৮১, ৪, উত মিত্রঃ ভবসি দেবধর্ম্মভিঃ।

৪ ঐ ৫ম, ৬২, ৮, হিরণ্যরূপং উষসঃ ব্যুষ্টৌ অয়ঃস্থূনং উদিতা সূর্য্যস্য। হিরণ্য-রূপ সুবর্ণবর্ণ এবং অয়ঃস্থূন লৌহযুগ, এই দুইটী ভিন্নার্থবোধক শব্দ। সূর্য্যোদয়কালে প্রভাতের বর্ণ সুবর্ণবর্ণের ন্যায় এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে সন্ধ্যাকাল অন্ধকারময় হয় বলিয়া, উহা লৌহবর্ণের ন্যায় কল্পিত হইয়াছে। যেখানে অয়োহনু অর্থাৎ লৌহময় হনু উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে শক্তি অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

৫ ঐ, ১ম, ২২, ১৭; ১ম, ১৫৪।

৬ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৫৮, ২, অজাশ্বঃ।

৭ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৫৩, ৯, যা তে অষ্ট্রা গোওপশা আঘৃণে পশুসাধনী।

৮ ঐ, ১ম, ৪২, ৬, হিরণ্যবাসীমত্তম।

সূর্য্যা তাঁহার ভগিনী বা প্রিয়তমা (১)। সূর্য্যা বা উষা এস্থলে স্ত্রী দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অন্যান্য সৌর দেবতার ন্যায় তিনিও সর্ব্ব-দর্শন-ক্ষম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)।

আদিত্য শব্দটী শেষে সূর্য্যেরই সাধারণ নাম হইয়া উঠে। বেদে ঐ নাম কতগুলি সৌর দেবতার সাধারণ সংজ্ঞা রূপেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সূর্য্যও আদিত্য, সবিতাও আদিত্য, এবং মিত্রও আদিত্য। ঋগ্বেদের শেষ ভাগে উহা সামান্যতঃ সূর্য্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে (৩)।

এই সকল বিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সহজে বোধ্য। আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা শাস্ত্র ও পূরাণ পাঠে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

সূর্য্যের অনৈসর্গিক শক্তি-কল্পনা।

স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, বৈদিক স্তোত্রকারগণ সূর্য্যকে কেবল আকাশ-পবিভ্রমণকারী দীপ্তিমান্ দেবতা না বলিয়া সমধিক গুরুতর কার্য্যের সম্পাদক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এমন কি সূর্য্য জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন।

যে ক্রমোন্নতি-পরম্পরায় সূর্য্য একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে ক্রমে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, শাসন-কর্ত্তা ও পুরস্কার-দাতা, সংক্ষেপে স্বর্গীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থে পরিণত হইয়াছেন, আমরা বেদের স্তোত্র পাঠে তাহা জানিতে পারি।

প্রথমতঃ আমরা সূর্য্যের সামান্য আলোক-মহিমা ভুলিয়া, যে আলোক মানব ও সর্ব্বজগৎকে নব জীবন প্রদান করে, তাহারই স্তুতি করি। সুতরাং যিনি প্রভাতে আমাদিগকে জাগৃত ও সকল প্রকৃতিকে নবজীবনে আহূত করেন, তিনি 'দৈনিক জীবন দাতা' বলিয়া অবশ্যই উল্লিখিত হইতে পারেন।

---

১ ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫৫, ৪।

২ ঐ, ৩য়, ৬২, ৯।

৩ ঐ, ১ম, ৫০, ১৩।

দ্বিতীয়তঃ দৈনিক আলোক ও জীবন-দাতা সাধারণতঃ আলোক ও জীবন-দাতা হইয়া উঠেন। প্রতিদিন যিনি আলোক ও জীবন দেন, সৃষ্টির প্রথম দিনেও তিনিই জীবন ও আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন। আলোক যেমন জীবনের প্রারম্ভ, সেইরূপ উহা সৃষ্টিরও প্রারম্ভ, সুতরাং সূর্য্য কেবল আলোক ও জীবন-দাতা না হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে স্তুত হন। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন, তবে শাসন ও পালন-কর্ত্তা বলিয়াও স্তুত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ সূর্য্যের ভয়ঙ্কর অন্ধকার নাশকরণ ও পৃথিবীর উর্ব্বরতা-সম্পাদন-শক্তি আছে বলিয়া তিনি জীবলোকের রক্ষা-কর্ত্তা ও আশ্রয়-দাতা রূপে কল্পিত হন।

চতুর্থতঃ সূর্য্য ভাল মন্দ সকলই দেখিয়া থাকেন, সুতরাং পাপাচারীকে ইহা বলা অস্বাভাবিক নহে যে, সূর্য্য তোমার দুষ্ক্রিয়া দেখিতেছেন এবং নিরীহ নিরপরাধীর নৈরাশ্য কালে সূর্য্যকে এরূপ স্তুতি করা ও অস্বাভাবিক নহে যে, "হে সূর্য্য! তুমি আমার নিরপরাধের সাক্ষী"। বাইবেলে উক্ত আছে—"যাহারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করেন, আমার আত্মা তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতররূপে ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছে" (সাম ১৩০, ৬)।

এক্ষণে এই সমস্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের প্রত্যেকটী স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইলে কতিপয় স্থানের সমালোচনা করা আবশ্যক। সূর্য্যের সবিতা বলিয়া যে একটী নামের উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞান-দাতা। সূর্য্য "জ্ঞানানাং প্রসবিতা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

ঋগ্বেদের ৭ম, ৬৩, ১ কবিতায় উল্লেখ আছে:—

"সুখদাতা, সর্ব্বদ্রষ্টা সূর্য্য উদিত হইতেছেন। তিনি সকলের প্রতিই এক ভাবাপন্ন। তিনি মিত্র ও বরুণের চক্ষু স্বরূপ। যে দেব চর্ম্মের ন্যায় তিমিরকে লুণ্ঠন করিয়াছেন।

পুনশ্চ ৭ম, ৬৩, ৪ কবিতায়:—

"দীপ্তিমান সূর্য্য সর্ব্বত্র কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া আকাশ হইতে উঠিতেছেন। তিনি আলোকে পূর্ণ হইয়া দূরদেশে কার্য্যে যাইতেছেন। মনুষ্যও তাঁহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া নিজ নিজ স্থানে নিজ কার্য্যে রত হউক।"

---

১ ঋগ্বেদ ৭ম, ৬৩, ২।

অপর একটী স্তোত্রে (১ম, ৬০, ২) সূর্য্য এই বলিয়া স্তুত হইয়াছেন—"তুমি সচল, অচল ও অস্তিত্ববান সকল পদার্থের রক্ষা কর্ত্তা।"

সর্ব্বদাই সূর্য্যের সর্ব্বদর্শন-শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। নক্ষত্রগণ সর্ব্বদ্রষ্টা সূর্য্যকে দেখিয়া তস্করের ন্যায় পলায়ন করে (১)। সূর্য্য মনুষ্যের সৎ ও অসৎ কার্য্য দেখিতে পান (২)। যিনি এইরূপে জগতের সমস্ত বিষয় দেখিতে পান, তিনি মনুষ্যের মনের সমস্ত ভাবও জানিতে পারেন (৩)।

সূর্য্য যদি সমস্ত বিষয় দেখিতে পান ও সমস্ত বিষয় জানেন, তবে তিনি কেবল একাকী যাহা অবগত আছেন এবং যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ভুলিতে ও তাহার জন্য ক্ষমা করিতে স্তুত হইতেও পারেন।

ঋগ্বেদে এইরূপ উক্তি (৪র্থ, ৫৪, ৩) আছে, "আমরা আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা, ভ্রম, অহঙ্কার ও মনের প্রকৃতি বশতঃ স্বর্গীয়গণের সমক্ষে যে কিছু অপরাধ করিয়াছি, হে সবিতঃ! তজ্জন্য আমাদিগকে দেবতা ও মনুষ্যের সমক্ষে নিরপরাধ হইতে দিন্।"

"পীড়া ও দুঃস্বপ্ন দূরীকরণ জন্যও সূর্য্য স্তুত হইয়া থাকেন (৪)। সূর্য্যোদয়-কালে অবদ্য হইতে ও পাপ হইতে মনুষ্যকে মুক্ত করিবার জন্য অন্যান্য দেবতারাও এইরূপ স্তুত হন (৫)।

---

১ ঋগ্বেদ ১ম, ৫০, ২।

২ ঐ, ৭ম, ৬০, ২।

৩ ঐ, ৭ম, ৬১, ১।

৪ ঐ, ১০ম, ৩৭, ৪,

যেন সূর্য্য জ্যোতিষা বাধসে তমঃ,
জগৎ চ বিশ্বং উদিয়র্ষি ভানুনা,
তেন অস্মৎ বিশ্বং অনিরাং; অনাহুতিং,
অপ অমীবাং অপ দুঃস্বপ্ন্যং সুব।

হে সূর্য্য! তুমি যে আলোক দ্বারা অন্ধকার পরাজিত ও জগৎ জাগরিত কর, সেই আলোকে আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতা, সমুদায় ঔদাসীন্য, সমুদয় রোগ ও সমুদায় নিদ্রাভাব দূরীভূত করিয়া দাও।

৫ ঐ, ১ম, ১১৫, ৬।

এইরূপে সূর্য্য নানা গুণে জীবনদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া স্তুত হইয়া ক্রমে জগতের ও সমস্ত স্থিতিশীল বিষয়ের প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন (১)। পরিশেষে একবারে সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা (২) ও জীবমাত্রেরই প্রভু স্বরূপ প্রজাপতিরূপে উক্ত হইয়াছেন। কোন কবি লিখিয়াছেন (৩), "সবিতা পৃথিবীকে রজ্জুবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি স্বর্গ নিরবলম্বনে রাখিয়াছেন।" সবিতা স্বর্গের অবলম্বন ও জগতের প্রজাপতি (৪)। তিনি সুবর্ণকেশ সূর্য্যদেবের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বর্ম্ম-পরিহিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অন্য কোন কবি সূর্য্যকে স্বর্গের অবলম্বন ও সত্যকে জগতের অবলম্বন স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন (৫)। এইরূপে পরিশেষে সূর্য্যের গুণবাচক সংজ্ঞা ক্রমেই উচ্চতম হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য দেবতাগণের দেবতা (৬) ও স্বর্গীয়গণের এক মাত্র নেতা বা পরিচালক (৭) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সবিতাতে ব্যক্তিগত ও স্বর্গীয় উপাদান যে, ক্রমেই প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটী স্থলেই তাহা স্পষ্ট দেখান গিয়াছে। আর কয়েকটী স্থলে ইহা আরও পরিস্কার দেখা যায়। সবিতা জগতের একমাত্র শাসন-কর্ত্তা (৮)। তিনি যে সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি

---

১ ঋগ্বেদ ১ম, ১১৫, ১, সূর্য্যঃ আত্মা জগতঃ তস্থুষশ্চ।

২ ঐ, ১০ম, ১৭০, ৪।

৩ ঐ, ১০ম, ১৪৯, ১।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথ্বীং অরংমাৎ

অস্কম্ভনে সবিতা দ্যাং অদৃংহৎ।

৪ ঐ, ৪র্থ, ৫৩, ২, দিবঃ ধার্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ।

৫ ঐ, ১০ম, ৮৫, ১, সত্যেন উত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণ উত্তভিতা দ্যৌঃ।

৬ ঐ, ১ম, ৫০, ১০,

উত বয়ং তমসঃ পরিজ্যোতিঃ পশ্যন্তঃ উত্তরম্

দেবং দেবত্র সূর্য্যং অগন্ম জ্যোতিঃ উত্তমম্।

অন্ধকারের মধ্যে আলোকের ক্রমশঃ উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলোক, দেবতার দেবতা, সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

৭ ঐ, ৮ম, ১০১, ১২, মহ্না দেবানাং অসূর্য্যঃ পুরোহিতঃ।

৮ ঐ, ৫ম, ৮১, ৫

দৃঢ় (১)। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার কেবল উপাসনা করিয়াই ক্ষান্ত হন না (২), তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন (৩)। একস্থলে এরূপ কথিত হইয়াছে যে, তিনি দেবতাগণকে অমরত্ব (৪) ও মনুষ্যকে জীবন দান করিয়াছেন অর্থাৎ দেবগণের অমরত্ব ও মনুষ্যের জীবন উভয়েই সবিতৃসাপেক্ষ (৫)। এমন কি, যে গায়ত্রী ছন্দ সমগ্র বেদের মধ্যে অতি পবিত্র, তাহা সবিতার উদ্দেশে সম্বোধিত হইয়াছে ঃ— আমরা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি; তিনি আমাদের মনকে উত্তেজিত করুন। (৬)

কখন কখন পূষাকেও গ্রাম্য সৌর দেবতার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে

---

১ ঋগ্‌বেদ ৪র্থ, ৫৩, ৪

অদাভ্যঃ ভুবনানি প্রচাকশৎ
ব্রতানি দেবঃ সবিতা অভিরক্ষতে।

২ ঐ, ৭ম, ৩৮, ৩

অপি স্তুতঃ সবিতা দেবঃ অস্তু
যং আ চিৎ বিশ্বে বসবঃ গৃণন্তি।

৩ ঐ, ৫ম, ৮১, ৩,

যস্য প্রয়াণং অনু অন্যে ইৎ যযুঃ
দেবা দেবস্য মহিমানং ওজসা।

৪ ঐ, ৪র্থ, ৫৪, ২।

দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞীয়েভ্যঃ
অমৃতত্বং সুবসি ভাগং উত্তমম্।
আৎ ইৎ দামানং সবিত র্বিউর্ণুষে
অনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ।

তুমি উপাসক দেবগণকে তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান—অমরত্ব দিয়াছ, হে সবিতঃ! শেষে তুমি মনুষ্যদিগকে জীবন দিয়াছ।

৫ যখন আমরা দেখি সবিতা ঋভুদিগকে অমরত্ব দিয়াছেন, তখন অন্যরূপ বুঝিতে হইবে। ঋভুগণ প্রথমে মনুষ্য বলিয়াই পরিচিত হন।

৬ ঋগ্‌বেদ, ৩য়, ৬২, ১০, তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

দেখা যায়। এক স্থলে তিনি "মর্ত্ত্যগণের শ্রেষ্ঠ ও দেবতাগণের সমান" (১) বলিয়া উক্ত হইলেও অন্যত্র "সচল ও অচল পদার্থের প্রভু" (২) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অন্যান্য সৌর দেবতাদের ন্যায় তাঁহার ও সর্ব্ব-দর্শন-শক্তি কল্পিত হইয়াছে। সবিতার ন্যায় তিনিও মর্ত্ত্যগণের মরণান্তে তাহাদের আত্মাকে সুখময় স্বর্গধামে লইয়া যান (৩)।

এইরূপে মিত্র ও বিষ্ণুও যে, প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। মিত্র, পৃথিবী ও আকাশ হইতেও মহৎ (৪)। তিনি দেবগণের আশ্রয়ের নিদান-ভূত (৫)। বিষ্ণু সকল ভুবনের পালন-কর্ত্তা (৬)। তিনি যুদ্ধকার্য্যে ইন্দ্রের সহচর (৭)। অদ্যাবধি কেহ তাঁহার মহিমার অন্ত পায় নাই (৮)।

১। ঋগ্‌বেদ ষষ্ঠ, ৪৮, ১৯, পরোহি মর্ত্ত্যৈঃ অসি সমো দেবৈঃ।

২ ঐ, ১ম, ৮৯, ৫, তং ঈশানং জগতঃ তস্থুষঃ পতিং।

৩ ঐ, ১০ম, ১৭, ৩।

৪। ঐ, ৩য়, ৫৯, ৭।

৫। ঐ, ৩য়, ৫৯, ৮, স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্ত্তি।

৬। ঐ, ১ম, ১৫৪, ৪,

য উ ত্রিধাতু পৃথ্বীং উত দ্যাং একঃ দধার ভুবনানি বিশ্ব',

যিনি তিন স্থানে পৃথিবী ও আকাশ রক্ষা করিতেছেন, যিনি একাকী সমুদয় জীব পালন করিতেছেন।

৭ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৬৯।

৮ ঐ, ৭ম, ৯৯, ২,

ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতঃ
দেবমহিম্নঃ পরং অন্তং আপ,
অস্তভ্নাঃ নাকং ঋষং বৃহন্তং
দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ।

হে দেব! এখন যাহারা জীবিত আছে, এবং পূর্ব্বে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা কেহই তোমার মহত্ত্বের অন্ত পায় নাই; তুমি উজ্জ্বল ও মহৎ আকাশ রক্ষা করিতেছ, তুমি পৃথিবীর পূর্ব্ব অংশ ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

সূর্য্যের দ্বিতীয় অবস্থা।

যদি আমরা বেদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কবিতাব সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু না জানিতাম, তাহা হইলে সূর্য্যের উপাসনা ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া আমরা এমন মনে করিতাম যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এক সূর্য্যকেই তাঁহাদের প্রধান দেবতা বলিয়া না না নামে পূজা করিতেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তও হইত, যে, তাঁহারা একেশ্বরের উপাসক বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বস্তুতঃ এস্থলে সূর্য্যের প্রধান দেব-চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, অন্যান্য দেবতার ও রূপ চরিত্র কল্পিত না হইয়া কেবল সূর্য্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে সূর্য্যকে জুপিতর ও জিউস্ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বৈদিক কবিগণ যে সূর্য্যকে একবার সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরক্ষণেই আবার সেই সূর্য্যকেই সাগর-সন্তান, উষা-প্রসূত ও অন্যান্য দেবতাদের ন্যায় একটী সামান্য দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের এই বিশেষ প্রকৃতিকে ঈষ্টেশ্বরবাদ বলা গিয়াছে। অর্থাৎ ইহা একটী স্বপ্রধান দেবতাতে বিশ্বাস। কিন্তু অনেকেশ্বরবাদ কিংবা বহুদেবোপাসনা-প্রথা এরূপ নহে; ইহাতে সমস্ত দেবতাই কোন এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার অধীন বলিয়া পরিগণিত হন এবং একের শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হওয়ায় দ্বিতীয়ের অভাবও পূর্ণ হইয়া থাকে। বেদে এক দেবতার পর অপর দেবতার উপাসনা দেখা যায়। এই উপাসনাকালে স্বর্গীয় দেবতার সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, উপাস্য দেবতায় তাহার সমস্তই আরোপিত হইয়া থাকে। কবি যখন কোন দেবতাকে সম্বোধন করিয়াছেন, তখন যে, তিনি অন্য কোন দেবতাকে জানিতেন, এমন বোধ হয় না। কিন্তু স্তোত্রসংগ্রহ-মধ্যে কখন কখন একই স্তোত্রে অন্যান্য দেবতারও উল্লেখ দেখা যায়। ইহারাও যথার্থ স্বর্গীয়। ফলতঃ এইরূপে উপাসকের দৃষ্টি যেন হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিত এবং যিনি এক সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর শাস্তা সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। তিনি পরক্ষণেই আবার স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্য্যের ও অন্যান্য দেবতার পিতা মাতারূপে দেখিতে পাইতেন।

ধর্ম্ম-ভাবের এরূপ অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে কঠিন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এই অবস্থা কখনই বোধের অগম্য নহে। যখন স্বর্গীয়ের ধারণা এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত ও স্থিরীকৃত না হইয়া ক্রমেই উন্নতির অভিমুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন এরূপ অবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী বলিতে হইবে। কবিগণ সূর্য্যে অসাধারণ ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য ভৌতিক পদার্থেও ঠিক ঐরূপ শক্তির কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতির যতদূর গুণ কীর্ত্তন করা সম্ভব, ততদূর করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ সর্ব্বোচ্চ গুণ-কীর্ত্তন হইতেই উহার প্রতেকটী একে একে সর্ব্বোচ্চ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহারা যে, সকলকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এরূপ বলিলে তাঁহাদের উপর মানসিক দোষের আরোপ করা হয়। যে হেতু উক্তরূপ গুণ-কীর্ত্তন-সময়ে তাঁহারা ওরূপ কোন শব্দের বা ভাবের অধিকারী হন নাই। তাঁহারা এই সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বা পদার্থে নিঃসন্দেহ কোন অদৃষ্ট পদার্থের অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য পদার্থে সর্ব্বোচ্চ বিশেষণের আরোপ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। এই বিশেষণের আরোপ করিবার পর বা আরোপ করিতে করিতে, যে সমস্ত বিশেষণ উপাস্য পদার্থ মাত্রেই প্রযুক্ত হইত, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন ভাব ধারণ করে। যাহাকে আমরা স্বর্গীয় বলি, প্রথমে তাহার অনুভূতি এইরূপে জন্মে। যদি পর্ব্বত, নদী, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি অসুর, অজর, অমর্ত্ত্য বা দেব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ সমস্ত বিশেষণ শব্দ একশ্রেণীর জীবের নাম হইয়া উঠিবে, এবং উহা কেবল তাহাদের জীবনী-শক্তি, তাহাদের ধ্বংসের অভাব বা তাহাদের উজ্জ্বলতা না বুঝাইয়া শব্দ গুলির সমস্ত তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিবে। অগ্নি, "দেবগণসম্বন্ধীয় বা দেবতাদিগের শ্রেণী-ভুক্ত" এইরূপ কথা, আর "অগ্নি উজ্জ্বল" এই উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকাশ বা সূর্য্যকে অসুর বা অমর্ত্ত্য বলিলে যাহা বুঝায়, আকাশ সচেতন, গমনশীল বা অবিবর্ণ এরূপ কহিলে তদপেক্ষা আরও কিছু বুঝা গিয়া থাকে। অসুর, অজর, দেব প্রভৃতি

বিশেষণ শব্দ নানা বস্তুর একই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা আদিম একেশ্বরবাদের পোষকতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যদি কেবল এইরূপ বলা অভিপ্রায় হয় যে, 'ঈশ্বর' এই শব্দ অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে পাওয়া গিয়াছে এবং স্বর্গীয় এক বই দুই হইতে পারে না, তাহা হইলে এই মতের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

কিরূপে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা আমোদজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কয়টী ক্রম এবং কতগুলি নাম দ্বারা অনন্ত, ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হইল, অজ্ঞাত কিরূপেই বা নামযুক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে স্বর্গীয় কি রূপে পাওয়া গেল, তাহা জানা উচিত হইতেছে। বেদে যাহারা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে,অনেক স্থলে তাহারা গ্রীক দেবতা নহে। কারণ গ্রীকেরা হোমরের সময় হইতেই এরূপ সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে যে, আপাততঃ যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, তাহাদের সংখ্যা ও স্বভাব যাহাই হউক না কেন, অবশ্য কিছু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বরই হউক বা অদৃষ্টই হউক —আছেন, দেবতা ও মনুষ্যের এক মাত্র অদ্বিতীয় পিতা রহিয়াছেন। বেদের কোন কোন অংশে ঠিক এই ভাবের উদ্ভেদ দেখা যায়। ইহাতে আমরা মনে করি যে, গ্রীশ, ইতালি, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও একেশ্বর-তৃষ্ণা কেবল অনেকেশ্বরবাদ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু ভারতবাসি-গণের মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্যৌঃ, বরুণ ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা হইতেও কিছু উচ্চতর পদার্থের অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া ভারত-বাসীরা দেবগণকে অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন। বৈদিক দেবগণের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে উদ্ভূত হইয়া দেবতারা সর্ব্বপ্রথমে নির্লিপ্ত ভাবে পাশা পাশি বর্দ্ধিত হইতেন, এবং স্বস্ব প্রধান হইয়া কিছু কালের জন্য উপাসকগণের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতেন। ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে না।

বৈদিক স্তোত্র পাঠের আবশ্যকতা ও আনন্দ এই যে, আধুনিক ভাষায় বেদোক্ত উচ্চ ভাবের পূর্ণতাপ্রদর্শন করা একবারে অসম্ভব। বৈদিক কবিগণ যখন পর্ব্বতকে রক্ষা করিতে ও নদীকে জলদান করিতে সম্বোধন

করিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে দেবতা বলিয়াছেন। কিন্তু তখনও দেব শব্দ 'উজ্জ্বল' অপেক্ষা আরও কিছু বুঝাইলেও 'স্বর্গীয়' অর্থ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী ছিল।) আধুনিক ভাষায় শব্দ সমূহের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা কিরূপে আধুনিক শব্দ দ্বারা এই প্রাচীন ভাষার প্রকৃত অর্থ বিবৃত করিব? নদী পর্ব্বত প্রভৃতি আমাদের কাছে যেরূপ, বৈদিক কবিগণের কাছেও ঠিক সেইরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহারা উহাদিগকে সমধিক সচেতন ভাবিতেন; যেহেতু তাঁহাদের ভাষায় যে কোন বস্তুর নাম কল্পিত হইত তাহাতেই কোন না কোন মনুষ্য-সুলভ চেষ্টা বুঝাইত। তাঁহারা যখন উহাদিগকে সচেতন বলিয়া ভাবিতেন,কেবল তখনই উহারা তাঁহাদের মনে বিরাজ করিত। কিন্তু (প্রকৃতির কোন কোন অংশকে সচেতন ভাবা এবং পরিশেষে তৎসমুদয়কে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা, এই দুইয়ের মধ্যগত ব্যবধানও অধিক।) কবিগণ যখন সূর্য্যকে রথারূঢ়, সুবর্ণবর্ম্ম-পরিহিত ও প্রসারিত-বাহু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কেবল নিজ নিজ কার্য্য প্রণালীর কথা মনে করিয়া নৈসর্গিক পদার্থে তাহারই কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। (আমাদের নিকট যাহা কবি-কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয় তাঁহাদের নিকট তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইত।) আমরা যাহা কল্পনাময় বলিয়া ভাবি, তাহা তাঁহারা শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় বা হর্ষোৎপাদন মানসে নয়, কিন্তু তাহা আয়ত্ত করিতে এবং তাহার নামকরণ করিতে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত প্রকৃত ভাবিতেন। যদি আমরা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য কবিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম যে, তাঁহারা সূর্য্যকে প্রকৃতই হস্তপদবিশিষ্ট মানব মনে করিতেন কি না, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন, "যদিও তোমরা আমাদের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ, তথাপি আমাদের ভাব অবধারণ করিতে সক্ষম হও নাই"।

"সবিতা" শব্দে যাহা বুঝায়, প্রথমে তদপেক্ষা আর অধিক কিছু বুঝাইত না। উহা "সু" (প্রসব করা বা, জীবন দেওয়া) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সূর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহা কেবল সূর্য্যের জীবনদান ও উর্ব্বরতা-বিধান-শক্তিই বুঝাইত। তৎপরে সবিতা এক দিকে যেমন কোন পৌরাণিক দেবতার নাম হয়, এবং তৎসম্বন্ধে যেমন অনেক উপাখ্যান কল্পিত হইতে

থাকে, অন্য দিকে আবার উহা তেমনি সূর্য্যের একটী প্রবাদমূলক ও নিরর্থক নাম হইয়া উঠে।

সূর্য্যসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সকল দেবতা না হউক অন্ততঃ বেদের অধিকাংশ দেবতার সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে। নদী, পর্ব্বত, মেঘ, সমুদ্র, উষা, রাত্রি ও বায়ু প্রভৃতি অর্দ্ধ দেবতাগণকে কখনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার পদবীতে উঠিতে দেখা যায়না। কিন্তু অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, পর্জ্জন্য প্রভৃতি দেবতার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায় এবং তাহাদের প্রতি যে সমস্ত বিশেষণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার প্রতিই বক্তব্য ও নির্দ্দেশ-যোগ্য।

দ্যোঃ বা দীপ্তি-কারক।

এক্ষণে সমস্ত আর্য্য জাতির একটী প্রাচীন দেবতার উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। বেদে এই দেবতা "দ্যোঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গ্রীকেরা উহাকে "জিউস" বলিয়াছেন। বেদে এরূপ কোন দেবতা আছে কি না, অদ্যাপি অনেক পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভারতের শেষ সময়ের সাহিত্যে উক্ত রূপ কোন দেবতা বা পুংলিঙ্গ কোন বিশেষ্য পদের কোন চিহ্নই নাই। "দ্যোঃ" শব্দ কেবল স্ত্রীলিঙ্গে ও আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে দেবতা গ্রীশে "জিউস", ইতালিতে "জুপিতর", ইডায় "ত্যর" ও জর্ম্মণিতে "জিও" নামে বিদ্যমান ছিলেন, বেদেও যে উক্তরূপ কোন দেবতা আছেন, বৈদিক পণ্ডিতগণ গবেষণাবলে তাহা স্থির করিতে বিমুখ হন নাই। বহুকাল অলব্ধ থাকিবার পর প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রে হঠাৎ উহার দর্শন-লাভ অতীব বিস্ময়-সূচক বলিয়া বোধ হয়। বেদে "দ্যোঃ" শব্দ কেবল পুংলিঙ্গ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত না হইয়া পিতৃশব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা 'দ্যৌষ্-পিতা" লাতিনে উহার আকার জুপিতর। গণনা দ্বারা কোন অদৃষ্ট নক্ষত্র নির্ণয় করিয়া, পরে ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহা অবলোকন করা, আর 'দ্যোষ্-পিতা' শব্দের আবিষ্কার, একই রূপ।

যাহা হউক, বেদে দ্যৌস্ শব্দটী একটী হীনজ্যোতি নক্ষত্রের ন্যায় রহিয়াছে। সাধারণতঃ উহা আকাশ অর্থ-বাচক। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান, কারণ উহা দিব্ বা দ্যু ধাতু (দীপ্তি পাওয়া) হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। দ্যৌস্ অর্থে এই জগৎ-প্রদীপ্তকরণ-চেষ্টাই প্রকটিত হইত। কিন্তু এই দীপ্তিমান্ পদার্থ কে,ঐ শব্দদ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত না। তিনি কোন অসুর হইবেন, এইমাত্র বুঝা যাইত। তৎপর উহা কতকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের অন্তর্গত হইয়া উঠে এবং অবশেষে "সবিতা" শব্দের ন্যায় আকাশ-বাচক একটী নিরর্থক শব্দ হইয়া দাঁড়ায়।

এই দ্যৌঃ (আকাশ-দীপ্তিকারক) যে, প্রথমেই অন্যান্য দেবতার মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লাতিন জুপিতর ও গ্রীক জিউস, এই উভয়ে কেমন সুন্দররূপে এইরূপ প্রাধান্য-স্থাপন সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও আমরা বিদিত আছি। বৈদিক দ্যৌস্ শব্দেও ঠিক ঐ রূপ প্রবণতা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দেবতা প্রাধান্য স্থাপনে উন্মুখ হওয়াতে, সে প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল।

পৃথিবী ও অগ্নির সহিত প্রায়ই দ্যৌঃকে আহূত হইতে দেখা যায়, যথাঃ—(ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫১, ৫)

"পিতা দ্যৌঃ, দয়াবতী মাতা পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি, উজ্জ্বল বসুগণ! আপনারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

এস্থলে দ্যৌস্ শব্দটী সর্ব্ব প্রথমে বসিয়াছে এবং উহার সর্ব্বপ্রাধান্য দেখা যাইতেছে; প্রাচীন স্তোত্র মাত্রেই উহার এইরূপ প্রধান্য দেখা যায়। উহা প্রায়ই পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—(ঋগ্বেদ, ১ম, ১৯১, ৬,) দ্যৌঃ তোমার পিতা, পৃথিবী মাতা ও সোম তোমার ভ্রাতা, অদিতি তোমার ভগিনী। কিংবা (ঋগ্বেদ ৪র্থ, ১,১০) দ্যৌঃ, পিতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, "দৌষ্পিতা জনিতা"।

একাকী আহূত না হইয়া দ্যৌঃ প্রায়ই পৃথিবীর সহিত একত্র আহূত হইয়া থাকে।* ঐ দুটী শব্দ একত্র মিলিত হইয়া বেদে এক প্রকার দ্বিদেবতা হইয়া উঠিয়াছে যথা, দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গপৃথিবী।

বেদে এমন অনেক স্থল আছে, যেথানে স্বর্গ ও পৃথিবী সর্ব্ব প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবতাগণ ইহাদের পুত্র (১)। বিশেষেতঃ বেদের দুইটী প্রধান দেবতা ইন্দ্র (২) ও অগ্নি (৩) ইহাদের সন্তান বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই দুই পিতা মাতা হইতেই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে (৪), ইঁহারাই উহাকে রক্ষা করিতেছেন (৫) এবং ইঁহারাই নিজ শক্তি দ্বারা বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুর পালন করিতেছেন (৬)।

স্বর্গ ও পৃথিবী, অক্ষয়, সর্ব্বশক্তিমান, ও অনন্ত বলিয়া উক্ত হইবার পরেও হঠাৎ এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেবগণের মধ্যে কোন সুনিপুণ ব্যক্তি স্বর্গও পৃথিবীর সৃজন করিয়াছেন। এই স্বর্গপৃথিবী দ্যাবাপৃথিবী (৭) বা রোদসী (৮) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ইন্দ্র একবার আকাশ ও পৃথিবীর ধাতা ও জনিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৯), তিনিই আবার দ্যৌঃ ও পৃথিবীর সন্তান বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন (১০)।

দ্যৌঃ ও ইন্দ্রের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ।

বেদে সর্ব্বপ্রথমে এই দুইটী প্রধান দেবতার মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আদি দেব দেবী স্বর্গ ও পৃথিবী এক দিকে, ও আধুনিক দেবতা ইন্দ্র অন্য দিকে। ইন্দ্র আদৌ বৃষ্টি-দাতা বলিয়া পরিচিত। তৎপরে অন্ধকার, রাত্রি, শীত বিশেষতঃ মেঘচোরগণের প্রতিকূলে তাঁহার দৈনিক ও বার্ষিক যুদ্ধহেতু

১ ঋগ্‌বেদ, ১ম, ১৫৯, ১, দেবাপুত্রে।

২ ঐ, ৪র্থ, ১৭।

৩ ঐ, ১০ম, ২, ৭, যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বা আপঃ, ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।

৪ ঐ, ১, ১৫৯, ২, সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুঃ।

৫ ঐ, ১ম, ১৬০, ২, পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ।

৬ ঐ, ১ম, ১৮৫, ১।

৭ ঐ, ৪র্থ, ৫৬, ৩।

৮ ঐ, ১ম, ১৬০, ৪।

৯ ঐ, ৮ম, ৩৬, ৪।

১০ Lectures on the Science of Language vol. II. p. 473, note.

তাঁহার বীর-চরিত কল্পিত হয়। কথিত আছে, ইন্দ্র এই মেঘচোরদিগকে বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্বারা পরাজিত করেন। ইন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবীর পুত্র হইলেও ইন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন (১)। আবার দেখা যায় (ঋগ্বেদ ১ম, ১, ৩১, ১) যে "দ্যৌঃ ও পৃথিবী ইন্দ্র-সমীপে মস্তক নত করিয়াছিলেন। হে ইন্দ্র আপনি স্বর্গের শৃঙ্গকে কম্পিত করিয়া থাকেন" (২)। যে বজ্রীর সমক্ষে "স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পিত হইবে, সূর্য্য চন্দ্র অন্ধকারাবৃত হইবে এবং নক্ষত্রগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে," তাঁহার প্রতি উক্তরূপ উক্তি অসঙ্গত নয়। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ঐ সকল উক্তি নৈতিক ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। কোনও কবি কহিয়াছেন (৩), "ইন্দ্রের মহত্ত্ব পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়াছে"। অপর এক জন বলিয়াছেন, "ইন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তুলনা করিলে উহারা তাঁহার অর্দ্ধমাত্র হইতে পারেন" (৪)।

তৎপরে আবার এই পিতাপুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতার সম্বন্ধে অনেক কথা দৃষ্ট হয় এবং পরিশেষে দেখা যায়, ইন্দ্র বজ্র ও বিদ্যুতের বলে তাঁহার পিতা প্রসন্ন আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, মাতা অচলা পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। কোন কবি বলিয়াছেন—"অন্যান্য দেবতাগণ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় দুরীভূত হইয়াছেন, ইন্দ্র আপনি সকলের রাজা হইয়াছেন (৫)।" ইন্দ্র কি রূপে যে, একটী প্রধান দেবতা হইয়া উঠেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইতেছে আবার একজন স্তোত্রকার বলিয়াছেন, "আপনার উপর আর কেহ নাই আপনার ন্যায় বা আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই" (৬)। অতএব এখন বেদের অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রকে সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া উল্লিখিত দেখা যাইতেছে। তথাপি গ্রীক জিউসের প্রাধান্যের

---

১ Lectures on the Science of Language, vol. II. p. 473.

২ ঋগ বেদ, ১ম, ৫৪, ৪।

৩ ঐ, ১ম, ৬১, ৯।

৪ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৩০, ১।

৫ ঐ ৪র্থ, ১৯, ২।

৬ ঐ, ৪র্থ, ৩০, ১।

সহিত তাঁহার প্রাধান্যের তুলনা হইতে পারে না। অন্যান্য দেবগণকেও তাহার অধীন কি সমকক্ষ বলা যাইতে পারেনা। যদি কোন কোন স্থলে অনেক দেবতার একত্র অবস্থান দৃষ্ট হয় এবং কতকগুলি দেবতাকে বিশেষতঃ ইন্দ্রকে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়, তথাপি ঐ সকল দেবতার আপনার পূজা পাইবার এক একটী দিন আছে। যেথানে তাঁহারা বরদান জন্য স্তুত হইয়াছেন, সে থানেই স্তোত্রের ভাষা তাঁহাদের জ্ঞান ও শক্তির গৌরব বর্দ্ধন জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ইন্দ্রের স্তোত্র।

ইন্দ্র ও বরুণের উদ্দেশে যে স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার অনুবাদ করিলেই ইষ্টেশ্বরবাদের অর্থ বুঝা যাইবে। এই ধর্ম্মে দেবতাগণ যথনই আহূত হইয়াছেন, তথনই প্রত্যেক দেবতাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত গুণ আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে কবিকল্পনার আধিক্য প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। প্রাচীন কবিগণের কেবল শব্দ-গৌরব-প্রকাশ বা কাব্যালঙ্কার যোজনা করিবার সময় ছিল না। তাঁহাদের অভিপ্রেত ভাব গুলি যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতেই তাঁহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। ভাবগুলি সুন্দর রূপ ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাঁহারা পরমানন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতেন। এই সকল স্তোত্র আমাদের চক্ষে হীন বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহাদের চক্ষে অলৌকিক কার্য্য ও প্রকৃতযজ্ঞোপযোগী বলিয়া প্রতীত হইত। ফলতঃ তাঁহাদের প্রত্যেক কথারই গুরুত্ব ও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে আমাদিগকে একেবারে হতাশ হইতে হয়। ঋগ্বেদ, ৪র্থ, ১৭ :—

"হে ইন্দ্র! আপনি মহান্। কেবল আপনার কাছেই স্বর্গ ও পৃথিবী সহজে বশীভূত হইয়াছে। বীরত্ববলে আপনি যথন বৃত্রকে পরাজয় করেন, তথন ঐ রাক্ষস যে সমস্ত সরিৎ গ্রাস করিয়াছিল, তৎসমুদয় আপনি উদ্ধার করিয়াছেন"। (১)

"আপনার জন্ম হইলে স্বর্গ ও পৃথিবী তাহাদের নিজ পুত্রের ক্রোধভরে কম্পিত হইয়াছিল, সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ নৃত্য করিয়াছিল, মরুভূমি জলসিক্ত হইয়াছিল এবং সরিৎগণ প্রবাহিত হইয়াছিল। (২)

"তিনি বীর্য্যবলে বজ্রাঘাত করিয়া পর্ব্বতগণকে বিদারিত করতঃ নিজ শৌর্য্য ও মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বজ্রদ্বারা বৃত্রের প্রাণ বধ করেন। বৃত্রের নিধনের পর বন্দীকৃত সরিৎগণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। (৩)

"আপনার পিতা দ্যৌঃ আপনা হইতেই ক্ষমতাপন্ন বলিয়া পরিচিত হন। যিনি ইন্দ্রকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সুদক্ষ শিল্পী হইবেন, যেহেতু তিনি অতি তেজস্বী পুত্রের জন্ম দিয়াছেন। এই পুত্রের বজ্রাস্ত্র অতি সুন্দর। পৃথিবীর ন্যায় তাহাকে তাঁহার স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করা যায় না। (৪)

"ইন্দ্র সকলের দ্বারাই আহূত হইয়া থাকেন, তিনি সকল লোকের রাজা এবং তিনিই কেবল পৃথিবীকে চালিত করিতে সক্ষম। তিনিই এক মাত্র প্রকৃত ব্যক্তি, সকল প্রাণী তাঁহাতেই আনন্দিত হয়, এবং সকলেই এই প্রতাপশালী দেবতার বদান্যতার প্রশংসা করিয়া থাকে। (৫)

"সোম মাত্রেই তাঁহার অধিকার আছে, অতি প্রীতিকর আনন্দেও তাঁহার অধিকার আছে। হে ইন্দ্র! আপনি সর্ব্বরত্নের অধিপতি হইয়া সমস্ত লোককে তাহাদের নিজ নিজ অংশে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। (৬)

"হে ইন্দ্র! আপনার জন্ম হওয়ামাত্র সকল লোকেই আপনাকে ভয় করিয়াছিল। হে বীর! আপনি আপনার বজ্র দ্বারা সরিতের স্রোত-পথ-রোধী সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন। (৭)

"আমরা নির্ভীক, তেজস্বী, মহান্, অসীম, বজ্রধারী ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, তিনি শক্রধন অধিকার করিয়া থাকেন, এবং তিনি ধন দান করেন, তিনি ধনী ও সদাশয়। (৮)

"তিনি সমবেত শত্রুগণকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং তিনিই যুদ্ধে এক মাত্র বীর বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি বিলুণ্ঠিত সামগ্রী গৃহে আনয়ন করেন, তাঁহার সহিত মৈত্রী দ্বারা আমরা যেন তাঁহার প্রিয় হই।" (৯)

"তিনি শত্রু-নিধনকারী ও সমরবিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পশু গণকে যুদ্ধে আনয়ন করেন। ইন্দ্র যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন সমস্ত সুদৃঢ় পদার্থই কম্পিত হয় এবং তাঁহাকে ভয় করে। (১০)

"ইন্দ্র পশুগণকে জয় করিয়াছেন, এবং স্বর্ণ ও অশ্ব অধিকার করিয়াছেন; আপনার ক্ষমতাবলে তিনি দুর্গ সমূহ ভগ্ন করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষমতাশালী লোক-বলে বলী হইয়া ধন-সংগ্রহ ও ধন বিভাগ করেন। (১১)

"ইন্দ্র তাঁহার মাতা ও জন্ম-দাতা পিতাকেই বা কত খাতির করিয়া থাকেন। বজ্রনিনাদযুক্ত, মেঘমালা-সহপ্রবাহিত প্রবল বাত্যার ন্যায় তিনি ক্ষণকাল মধ্যেই আপনার শক্তি বর্দ্ধিত করেন। (১২)

"তিনি গৃহীকে গৃহ শূন্য করেন; তিনি ধূলাকে মেঘরূপে পরিণত করেন; তিনি দ্যৌর ন্যায় সমস্ত বস্তুকে ভগ্ন করেন। তিনি কি স্তবকারীকে ধন-মধ্যে স্থাপিত করিবেন? (১৩)

"তিনি সূর্য্যের চক্রকে চালাইয়াছেন, তিনি এতসকে গমনে স্থগিত রাখিয়াছেন এবং ফিরিয়া তাহাকে আকাশের জন্মস্থান—রাত্রির অন্ধকারময় গভীর রন্ধ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। (১৬)

"কূপ মধ্য হইতে যেমন জলপাত্র টানিয়া আনা যায়, সেইরূপ কবি—আমরা গাভী, অশ্ব, ধন, ও স্ত্রী অভিলাষ করিয়া ইন্দ্রকে আমাদের নিকট বন্ধু রূপে আনয়ন করি। তিনি আমাদিগকে স্ত্রী দেন। তাঁহার সহায়তা কখনও নিষ্ফল হয় না। (১৬)

"হে ইন্দ্র! আপনি বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়া আমাদের রক্ষক হউন। আপনি যাজ্ঞিকদিগের আনন্দদায়ক, আপনি আমাদিগকে দেখুন। যাহারা জীবন ও স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, আপনি তাহাদিগকে তাহা দিয়া থাকেন। আপনি বন্ধু, আপনি পিতা, আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা আর নাই। (১৭)

"যাহারা আপনার সহিত মৈত্রী কামনা করে, আপনি তাহাদের বন্ধু ও রক্ষক হউন। হে ইন্দ্র! যে আপনার প্রশংসা ও স্তব করে, তাহাকে জীবন দান করুন। হে ইন্দ্র! আমরা একত্র হইয়া আপনার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি এবং এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আপনার মহত্ব প্রচার করিতেছি।" (১৮)

"ইন্দ্র শৌর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া প্রশংসিত হন; যেহেতু তিনি একাকী অনেক প্রবল শত্রু নিধন করিয়া থাকেন। মনুষ্য বা দেবতা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারেনা, তাঁহার বন্ধু কবি স্বয়ং তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। (১৯)

"সর্ব্বশক্তিমান্, ক্ষমতাশালী, মনুষ্যের আশ্রয়ভূত, অটল ইন্দ্র যেন আমাদের জন্য যথার্থই এই সমস্ত করেন। হে ইন্দ্র! আপনি সর্ব্বজীবের রাজা, কবির যাহা গৌরবজনক, আপনি আমাদিগকে তাহাই দিন"। (২০)

শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া বরুণের স্তোত্র।

দ্বিতীয় স্তোত্রটী বরুণের উদ্দেশে রচিত হইয়াছে (ঋগ্বেদ, ২য়, ২৮):—

"এই জগৎ, জ্ঞানী রাজা আদিত্যের অধিকৃত; তিনি যেন বীরত্ববলে সর্ব্বজীবকে পরাভূত কবিতে পাবেন। যিনি যজ্ঞাদিতে প্রসন্ন ও বদান্য, আমি সেই বরুণ-দেবের প্রশংসা-স্তোত্র গান করি। (১)

"হে বরুণ! আমরা সর্ব্বদাই আপনার চিন্তা করি এবং আপনার প্রশংসা করিয়া থাকি। আপনি আমাদিগকে আপনার সেবায় সুখী হইতে দিন্। সমৃদ্ধিশালিনী উষার সমাগম-কালে আমরা প্রতিদিন বেদিস্থ অগ্নির ন্যায় আপনার অভ্যর্থনা করিয়া থাকি। (২)

"হে বরুণ! আপনি আমাদের পরিচালক, আমরা যেন সর্ব্বদাই আপনার আশ্রয়ে থাকি। আপনি বীরগণের মধ্যে বলী, আপনার প্রশংসার বিরাম নাই। হে অজেয় অদিতি-নন্দন দেবগণ! আপনারা আমাদিগকে আপনার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করুন। (৩)

"শাসনকর্ত্তা আদিত্য এই সকল সরিৎ প্রেরণ করিয়াছেন; ইহারা বরুণের নিয়মানুসারে চলিয়া থাকে। ইহারা ক্লান্ত হয় না বা থামেনা। ইহারা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রই সর্ব্বত্র গমন করে। (৪)

"হে বরুণ! বন্ধন স্বরূপ এপাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আমরা আপনার নিয়মের মূল সূত্র বিকাশ করিব। স্তোত্র-বয়ন কালে যেন আমার

তন্তু ছিন্ন না হয়। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে যেন এই কার্য্যকারকের শরীর পাতিত না হয়। (৫)

"হে বরুণ! আপনি আমার এই ভয় নিবারণ করুন। হে ন্যায়পরায়ণ রাজন্! আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। বৎস যেমন রজ্জু হইতে মুক্ত হয়, আমাকে সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত করুন; আপনা হইতে দূরে থাকিলে আমি এক নিমিষের জন্যও কোন বিষয়ে সক্ষম হইতে পারি না। (৬)

"হে বরুণ! আপনার ইচ্ছামাত্র যে অস্ত্র দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগকে প্রহার করে, আমাদিগকে তাহা দ্বারা প্রহার করিবেন না। আলোক যে স্থান হইতে তিরোহিত হইয়াছে, আমরা যেন সে স্থানে না যাই। আমাদের শত্রুগণকে ছত্রভঙ্গ করুন, যেন আমরা বাঁচিতে পারি। (৭)

"হে বরুণ! আমরা পূর্ব্বে আপনার প্রশংসা-স্তোত্র গান করিয়াছি, বর্ত্তমান কালেও গান করিতেছি, হে সর্ব্বশক্তিমন্! ভবিষ্যতেও গান কবিব। আপনি অজেয় বীর, সুদৃঢ় পর্ব্বতের ন্যায় আপনার উপর নিয়মাবলি অটল ভাবে রহিযাছে। (৮)

"আমার আত্মকৃত অপরাধ দূর করুন, হে রাজন্! অন্যকৃত অপরাধের জন্য আমাকে যেন কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। হে বরুণ! অদ্যাপি অনেক উষার উদয় হয় নাই, আমাদিগকে সেই সমস্ত উষায় জীবিত থাকিতে দিন। (৯)

"নিদ্রিতাবস্থায় যে আমার অনিষ্ট কামনা করে, সে সহচর হউক, কিংবা বন্ধুই হউক—আর যে আমাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা করে, সে তস্কর বা ব্যাঘ্রই হউক, হে বরুণ! আপনি আমাকে তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন"। (১০)

কোন গ্রীক কবি জিউসের স্তবসময়ে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। স্তোত্র হইতে এমন অনেক অংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে অগ্নি, মিত্র, সোম ও অনান্য দেবতারাও উক্ত রূপ বা তাহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবে স্তুত হইয়াছেন।

ইষ্টেশ্বরবাদ ধর্ম্মের বাক্‌কাল।

ইষ্টেশ্বরবাদ শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা উক্ত হইল। আমরা কেবল বেদের অলোচনাপ্রসঙ্গে ধর্ম্মের এই তত্ত্বটী প্রথমে জানিতে পারি। অন্যান্য ধর্ম্মও যে, এক সময়ে এই অবস্থাপন্ন ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৫৯ অব্দে মৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের যে ইতিহাস প্রকাশিত হয়, তাহাতে ধর্ম্মের এই অবস্থাটীর বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ৫৩২ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি, "যখন এই সকল দেবতার প্রত্যেকটী স্তুত ও আহুত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা অন্যান্যের ক্ষমতায় খর্ব্বীকৃত কিংবা উচ্চ কি অনুচ্চ পদারূঢ় বলিয়া কল্পিত হন নাই। উপাসকের মনে প্রত্যেক দেবতা অন্যান্য দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত। বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতার অবশ্যই ক্ষমতার সীমা থাকিবে, আমাদের মনে এরূপ বোধ হইলেও, উপাসক তাঁহার উপাস্য দেবতাকে তৎকালের জন্য প্রকৃত, স্বর্গীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অসীম ক্ষমতাপন্ন মনে করিতেন। উপাসনা-সময়ে তাঁহার উপাস্য দেবতা ভিন্ন আর কেহই তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইতেন না। এই উপাস্য দেবতাই উপাসকগণের চক্ষে তাহাদের প্রার্থনা পূরণ জন্য জাজ্জ্বল্যমান থাকিতেন। 'হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্র বা তরুণ নহেন, আপনারা সকলেই মহৎ,' এইরূপ ভাব বৈবস্বত মনু ভিন্ন অন্য কেহ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করিলেও বেদের মধ্যে এই ভাবের প্রচুর সন্নিবেশ দেখা যায়। যদিও কোন কোন স্থলে (ঋগ্বেদ ১ম, ২৭, ১৩) দেবতারা, ছোট বড় ও তরুণ বৃদ্ধ বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কোথাও অপরাপর দেবগণের দাস বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায় না। দেবগণের এই তারুণ্য ও বার্দ্ধক্যের কল্পনা তাঁহাদের স্বর্গীয় শক্তির বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়।

কেহ এমন মনে করিবেন না যে, কেবল ভারতবর্ষেই এই ইষ্টেশ্বরবাদ বর্ত্তমান ছিল। গ্রীশ, ইতালি, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেও উহার লক্ষণ লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জাতি হইতে সাধারণ জাতি সংগঠন-সময়ের পূর্ব্বে উহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহাকে রাজতন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী

অরাজকতা বলা যাইতে পারে। ইহাকে ধর্ম্মের বাক্‌কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই ঠিক হয়। সমাজের সাধারণ ভাষার পূর্ব্বে যেমন ভিন্ন ভিন্ন কথা ভাষাস্থানীয় হইয়া থাকে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। প্রথমে প্রতিগৃহেই উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমে যখন বিভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া জাতি হইয়া উঠে, তখন উহাও পল্লীর সাধারণ বেদীস্বরূপ হয়, এবং সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদী, সমুদয় জাতির পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরে পরিণত হইয়া উঠে। এইরূপ পদ্ধতি অতি স্বাভাবিক এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনীন। আমরা বেদ ভিন্ন অন্য কোথাও ইহার উৎপত্তি ও উন্নতি এত স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাধান্য।

কয়েকটী উদাহরণ দিলে এই বিষয়টী সমধিক স্পষ্টীকৃত হইতে পারে (১)। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম স্তোত্রে অগ্নি বিশ্ব-নিয়ন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি লোক-পাল বা মানব-প্রভু, বিজ্ঞ রাজা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও মানব-বন্ধু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এমন কি অন্যান্য সমস্ত দেবতার সমস্ত শক্তি ও নাম তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। স্তোত্রটী যে আধুনিক রচনার মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অগ্নি উক্তরূপে স্তুত হইয়াছেন, তথাপি অপরাপর দেবতার স্বর্গীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে যে, কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না।

ইন্দ্রের উদ্দেশে যাহা উক্ত হইতে পারে, ইন্দ্রের স্তোত্রে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। স্তোত্রে ও আধুনিক সময়ের ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অতি তেজস্বী ও দেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত শূর ও বীর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দশম গীতির শেষ ভাগে লিখিত আছে, "ইন্দ্রই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ"।

১। মৎ প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ৫৩২ পৃষ্ঠায় এবং মুইর সাহেবের "সংস্কৃত মূল" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় ও ৫ম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

সোম নামে অন্য দেবতার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মহৎ হইয়া জন্মিয়াছেন এবং সকলকেই জয় করিয়া থাকেন (১)। সোম সমস্ত জগতের রাজা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন (২)। তাঁহার মানবের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে (৩)। এমন কি দেবতারাও তাঁহাদের জীবন ও অমরত্বের জন্য তাঁহার নিকট ঋণী আছেন (৪)। তিনি স্বর্গ, পৃথিবী দেবতা ও মনুষ্যের রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছেন (৫)।

আবার বরুণের উদ্দেশে যে সমস্ত স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যে, কবির মনে যেন বরুণই একমাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন।

বরুণের সম্বন্ধে কবি কহিয়াছেন "কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, আপনি সকলেরই প্রভু" (১ম, ২৫,২০); আবার অপর স্তোত্রে (২য়, ২৭,১০) "আপনি দেবতা ও মনুষ্য, সকলেরই রাজা"। মানব-ভাষা, স্বর্গীয় ও শ্রেষ্ঠ শক্তির ধারণা ব্যক্ত করার সময়ে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রকাশ করিতে পারে? বরুণ "ধৃতব্রত" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বরুণের এই সংজ্ঞায় জানা যায় যে, তিনি কেবল প্রকতির প্রভু নহেন, প্রত্যুত প্রকৃতির নিয়ম-বেত্তা ও উহার পালন কর্ত্তা। পদার্থরাশি যেমন অটল শৈলোপরি সংস্থাপিত থাকে, তেমনি প্রকৃতির ব্রত বা নিয়ম সমূহ বরুণের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। দ্বাদশ মাস তাঁহার বিদিত আছে। তিনি বায়ু, পক্ষী ও অর্ণবপোতাদিরও গতি অবগত আছেন। প্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার তিনি জানেন। এমন কি ভূত ও ভবিষ্যতেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। ইহার উপর আবার বরুণের নৈতিক জগতের নিয়মাবলী তত্ত্বাবধান করাও যেন একটী ক্ষমতা। কবি কোন একটী স্তোত্রে বলিয়াছেন, তিনি বরুণের কার্য্যের অবমাননা করিয়াছেন, এবং

২ ঋগ্বেদ, ৯ম, ৫৯, ৪।

৩ ঐ, ৯ম, ৯৬, ১০।

৪ ঐ, ৮ম, ৪৮, ৪।

৫ ঐ, ৯ম, ৮৭, ২।

৬ ঐ, ৯ম, ৯৭, ২৪।

তাঁহার নিয়মের প্রতিকূলাচারী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং আত্মসমর্থন জন্য মানব-প্রকৃতির দৌর্ব্বল্যের দোষ দিতেছেন। তাঁহার মতে মৃত্যু পাপের পুরস্কার নয়। অশ্ব যেমন সদয় বাক্যে শান্ত হয়, সেইরূপ তিনিও তাঁহার দেবতাকে উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইতেছেন। তিনি পরিশেষে বরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন, "আপনি প্রসন্ন হউন এবং পুনর্ব্বার আমাদিগকে আপনার সহিত একত্র আলাপ করিতে দিন্" ইহা পাঠ করিলে বাই-বেলোক্ত সাম কাহার না মনে পড়ে?—"তিনি আমাদের শরীরোপ-করণের বিষয় অবগত আছেন। আমরা যে ধূলি মাত্র, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে"।

বরুণের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইলেও তিনি সর্ব্ব-প্রধান নহেন। এমন কি দ্বিতীয় বৈ একমাত্র ও অদ্বিতীয় নহেন। বরুণ প্রায়ই মিত্রের সহায়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মিত্র বরুণাপেক্ষা মহৎ, কি বরুণ মিত্রাপেক্ষা মহৎ, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

ইহাকেই ইষ্টেশ্বরবাদ বা এক একটী দেবতার পূজা বলা গিয়া থাকে। একেশ্বরবাদমতে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবতার অস্তিত্ব একবারে অস্বীকৃত হইয়াছে, আর অনেকেশ্বরবাদে সর্ব্বদেবতার উপর একের প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে। ইষ্টেশ্বরবাদের সহিত একেশ্বরবাদ ও অনেকেশ্বরবাদের এই প্রভেদ।

ইষ্টেশ্বরবাদের পরিপুষ্টি।

বৈদিক ইষ্টেশ্বরবাদের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণ দেখা যাউক।

আমরা প্রথমে এই সমস্ত স্বপ্রধান ও একস্থান-সম্ভূত দেবগণকে একত্র ধাবমান হইতে দেখিতে পাই। চিরবিরাজিত আলোক স্বরূপ আকাশের নাম দ্যৌঃ। সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ আকাশের নাম বরুণ, প্রাতঃকালের আলোকোজ্জ্বল আকাশের নাম মিত্র। আকাশে দেদীপ্যমান দেবতার

নাম সূর্য্য। আলোক ও জীবন-দাতা সূর্য্যের নাম সবিতা, ত্রিপদ, আকাশ-ব্যাপী সূর্য্যের নাম বিষ্ণু, আকাশে জল-দাতার নাম ইন্দ্র, আকাশে বজ্র ও ঝটিকার সঞ্চারকের নাম রুদ্র ও মরুৎ, বায়ুদেবের নাম বাত ও বায়ু, প্রাতঃকালের অন্ধকারোত্থিত আলোক বা সন্ধ্যাকালের অন্ধকার-নিমগ্ন আলোকের নাম অগ্নি। ইতর দেবতাদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ।

এই জন্যেই এক দেবতার সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইত, অন্য দেবতার সম্বন্ধে ঠিক তাহাই উক্ত হইবার কোন বাধা ছিলনা। কোন এক বিশেষণ বহু দেবতায় প্রযুক্ত হইত এবং একই দেবতার গল্প ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের সম্বন্ধেও কথিত হইত।

সূর্য্য প্রভৃতি সৌর দেবতাগণের ন্যায় জলদেব ইন্দ্র, ও ঝটিকাদেব মরুৎ প্রভৃতিও দ্যৌঃর (আকাশের) সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আকাশ পৃথিবীর স্বামী বলিয়া কল্পিত হওয়াতে পৃথিবী সমস্ত দেবতার প্রসূতি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সূর্য্য যখন উদিত হইতেন, তখন প্রাচীন কবিগণ তাঁহাকে কেবল আলোক-দাতা মনে না করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের প্রকাশক ও প্রসারক বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্য তৎপরে সহজেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের স্রষ্টা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতাতেও ঠিক ঐরূপ শক্তি ও গুণ আরোপিত হইয়াছে।

মতান্তরে অগ্নি আবার সূর্য্যের আনয়নকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য কবিগণ ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাতে ঐ শক্তি আরোপ করিয়াছেন।

যদিও মেঘ ও অন্ধকারের সহিত তুমুল সমরে প্রধানতঃ ইন্দ্রই ব্যাপৃত থাকেন, তথাপি দ্যৌঃকে বজ্র ধারণ করিতে, অগ্নিকে অন্ধকার-পিশাচ-গণকে বধ করিতে এবং বিষ্ণু, মরুৎ ও পর্জ্জন্য প্রভৃতি দেবগণকে এই সকল দৈনিক ও বাৎসরিক যুদ্ধে ইন্দ্রের সহযোগী হইতে দেখা যায়।

আমাদের ন্যায় প্রাচীন কবিগণও এই সমস্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক (১)। অর্থাৎ তাঁহারা

(১) মুইর, 'সংস্কৃত মূল,' ৫ম খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।

এক দেবতার সহিত অন্যান্য দেবতার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। যথাঃ—অগ্নিকে, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, পূষা ও অদিতি বলা হইয়াছে। এমন কি অগ্নি অনেক স্থানে সর্ব্বদেব বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন (১)। অথর্ব্ববেদের একস্থানে দেখা যায়, (১৩শ. ৩, ১৩):—

"সন্ধ্যাকালে অগ্নি বরুণ হইয়া উঠেন, প্রাতরুত্থান-কালে তিনি মিত্র হন, শেষে সবিতা হইয়া আকাশ-মার্গে পরিভ্রমণ করেন এবং মধ্যাহ্ন-কালে ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ উত্তপ্ত করেন"।

সূর্য্যের সহিত ইন্দ্র ও অগ্নির, সবিতার সহিত মিত্র ও পূষার, ইন্দ্রের সহিত বরুণের এবং দ্যৌঃর সহিত পর্জ্জন্যের একত্ব কল্পিত হইয়াছে। যদিও এইরূপ হওয়াতে স্বাধীন দেবতাগণের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া গিয়াছে, তথাপি অদ্বৈতবাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

প্রাচীন কবিগণ কর্ত্তৃক আর একটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তাঁহারা একত্র দুই দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বেদের একটী বিশেষ ধর্ম্ম (২)। একরূপ শক্তি-সম্পন্ন দুইটী দেবতার নাম একত্র দ্বিবচনান্ত হইয়া নূতন একটী দেবতার নাম হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মিত্র ও বরুণের ভিন্ন ভিন্ন স্তোত্র ব্যতিরিক্ত "মিত্রাবরুণৌ" নামে এক দেবতার স্বতন্ত্র স্তোত্র দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন ইহারা দুই মিত্র ও দুই বরুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

ইহার পর তৃতীয় উপায়ে সকল দেবতাকে সাধারণতঃ "বিশ্বদেব" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সকলেই একত্র স্তুত হইয়াছেন এবং একত্র সকলের উদ্দেশেই বলি প্রদত্ত হইয়াছে।

বহু দেবতার সহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে একেশ্বরের উপাসনা করার সম্বন্ধে আর একটী উপায় আমাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রীক ও রোমকেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। উপায়টী এই—বহু দেব-

---

(১) ঋগবেদ্ ৫ম, ৩।

(২) দ্বিদেবতাগণের মধ্যে এইগুলি প্রধান ;—

অগ্নিসোমৌ।	ইন্দ্রবৃহস্পতী।	পর্জ্জন্যবাতৌ।
ইন্দ্রবায়ূ।	ইন্দ্রাবরুণৌ।	মিত্রাবরুণৌ।
ইন্দ্রাগ্নী।	ইন্দ্রাবিষ্ণূ।	সোমাপূষণৌ।
ইন্দ্রপূষণৌ।	ইন্দ্রাসোমৌ।	সোমারুদ্রৌ।

তার মধ্যে এক দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা করা। লোকাচারের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া এবং প্রতিদেবতার উপাসনায় (যেমন জিউসের পার্শ্বে আপোলো, এথিনা প্রভৃতির উপাসনা) একবারে বিরত না হইয়া সর্ব্বেশ্বর-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার এই একটী সুন্দর উপায়। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে, যে জাতির মধ্যে রাজতন্ত্র প্রচারিত ছিল, তাঁহারাই কেবল দেবতাদের মধ্যে রাজতন্ত্র কল্পনা করিতে পারিতেন (১)। এই মত সত্য হইলে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের দেবতাদের মধ্যে রাজার অস্তিত্বের অভাব দেখিয়া স্থির করিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র-শাসনও প্রচলিত ছিল না।

একেশ্বরবাদের উপক্রম।

বৈদিক আর্য্যগণ তাঁহাদের দেবতাগণের মধ্যে একের প্রাধান্য কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই প্রয়াস গ্রীশ প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতে যে, ফলবতী হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সবিতা, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহাদের আলোকদ্বারা কেবল জগৎপ্রকাশক বলিয়া উক্ত না হইয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিস্তারক, পরিমাপক ও অবশেষে উহাদের স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। এইরূপে তাঁহারা কেবল বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বব্যাপক, বিশ্ববেদ নাম

১। 'Aristotelis Politica,' I. 2. 7:—'মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে যে, দেবতাদের মধ্যেও রাজা আছেন, যেহেতু পূর্ব্বেই হউক, বা এক্ষণেই হউক, তাহাদের মধ্যেও রাজা রহিয়াছেন। মনুষ্য আপনাদের কল্পনা অনুসারে দেবগণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কল্পিত দেবগণ কেবল তাহাদের আকারপ্রকারের অনুসারী হয় না, অধিকন্তু তাহাদের আচার ব্যবহারেরও অনুগত হইয়া থাকে।"

(১) ঋগ্বেদ, ৫ম, ৮৫, ৫, "মানেন ইব তস্থিবান্ অন্তরীক্ষে বি য়ঃ মমে পৃথিবী সূর্য্যেণ" মানদণ্ড দ্বারা যেমন পরিমাণ করা যায়, সেইরূপ তিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া সূর্য্য দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ করেন।

পরিগ্রহ করেন নাই, অধিকন্তু বিশ্বকর্ম্মা (১) ও প্রজাপতি বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। শেষোক্ত দুটী নাম সময়ক্রমে আবার দুইটী নূতন দেবতার নাম হইয়া উঠে। বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি যে, সৌরবীজ হইতে উদ্ভূত, তাহার যৎসামান্য প্রমাণ তাঁহাদের উদ্দেশে উক্ত কতিপয় স্তোত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল স্তোত্র পাঠ করিলে বাইবেলোক্ত সামের ভাষা মনে পড়ে। এই সকল স্তোত্র দেখিলে মনে হয় যে, প্রজাপতি কিংবা প্রজাপতির ন্যায় কোন দেবতা দ্বারা একেশ্বরবাদ-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইতে পারিত এবং প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণের ধর্ম্মোন্নতির চরম সীমা লব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক যে, সে রূপ হয় নাই, তাহা পরে দেখান যাইবে।

বিশ্বকর্ম্মা।

ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তোত্র হইতে কতিপয় স্থান এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; উহাতে জগৎস্রষ্টা ও জগৎশাস্তা একেশ্বরের ধারণা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মাকে উদ্দেশ করিয়া যে কয়েকটী স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছে, প্রথমতঃ এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল (১):—

"সে কোন্ স্থান, তাহার অবলম্ব কি, এবং কোথাই বা তাহা, যেথান হইতে সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা জগৎসৃষ্টিকালে স্বীয়শক্তি-বলে স্বর্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন? (২)

"একেশ্বর সেই বিশ্বকর্ম্মা—যাঁহার মুখ, বাহু ও পদ সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সৃষ্টি সময়ে তাঁহার নিজ বাহু ও পক্ষ দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কে একত্র গঠিয়াছেন। (৩)

"সে বনই বা কোন্ বন, সে বৃক্ষই বা কি বৃক্ষ, যাহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে? হে বিজ্ঞগণ! আপনারা মনে মনে

---

(১) ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা নামেও উক্ত হন। ঋগ্বেদ, ৮ম ৯৮, ২।

(২) ঋগ্বেদ ১০ম, ৮১, ২।

সেই স্থান অন্বেষণ করুন, জগৎরক্ষাকালে তিনি যাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। (৪)

“যে বাচস্পতি বিশ্বকর্ম্মা আমাদের মনকে অনুপ্রাণিত করেন, যুদ্ধ-কালে আমাদের রক্ষার জন্য অদ্য তাঁহাকে আহ্বান করা যাউক। যিনি সকলেরই মঙ্গল স্বরূপ, যিনি আমাদের নিরাপদের জন্য সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি যেন আমাদের সমস্ত উপহার গ্রহণ করেন” (৭)

বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশে অন্য একটী স্তোত্রে (১) দেখা যায়ঃ—

“যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি সমস্ত নিয়ম ও জগৎবেত্তা, যিনি শাস্তা ও যিনি দেবগণের নাম রাখিয়াছেন, অপর সাধারণ সমস্ত জীবই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে (৩)

“আকাশের অতীত, পৃথিবীর অতীত, দেবের অতীত ও অসুরের অতীত সেই আদি বীজ কি, জল যে বীজ বহন করিয়াছিল, সমস্ত দেবতাকে যাহাতে দেখা গিয়াছিল? (৫)

“জল সেই আদি বীজ বহন করিয়াছিল, যাহাহইতে সমস্ত দেবতাই একত্র আসিয়াছেন। সেই একমাত্র বস্তু—যাহাতে সমস্ত জীবই অধিষ্ঠিত ছিল—অজাতের ক্রোড়ে স্থাপিত ছিল (৬)

“যিনি এই সমস্ত বিষয় সৃজন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কখনই জানিতে পারিবে না, তাঁহার ও তোমার মধ্যে কোন পদার্থের ব্যবধান আছে। কবিগণ আনন্দপূর্ণ জীবনে, কুহেলিকায় আবৃত হইয়া, কম্পিত স্বরে তাঁহার স্তুতি গান করেন। (৭)

প্রজাপতি।

সর্ব্বজীবের প্রভু প্রজাপতি দেবতা অনেক বিষয়ে বিশ্বকর্ম্মার সদৃশ (২) তথাপি ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে বিশ্বকর্ম্মার অপেক্ষা সমধিক স্বাধীনতা ভোগ

১ ঋগ্‌বেদ, ১০ম, ৮২।

২ শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮ম, ২,১,১০, প্রজাপতির্বৈ বিশ্বকর্ম্মা।

করিতে দেখা যায়। বেদের কোন কোন স্তোত্রে 'প্রজাপতি' সবিতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—

"স্বর্গের আশ্রয়ভূত, জগতের প্রজাপতি তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ পরিধান করেন, সবিতা দীপ্তি পাইয়া সকল স্থান প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করিয়া পরম সুখ উৎপাদন করেন;" (১)।

অপিচ প্রজাপতি সন্তানসন্ততিদাতা বলিয়াও আহূত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের (১০, ১২১) স্তোত্রে তিনি বিশ্বস্রষ্টা, দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও হিরণ্য-গর্ভ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা;

"সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভ উত্থিত হন; তিনিই এই সমস্তের এক মাত্র প্রভু হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশ স্থাপন করেন; সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব? (১)

"যিনি শ্বাস প্রদান করেন, যিনি বল দান করেন, উজ্জ্বল দেবতারা যাঁহার আদেশ মান্য করেন, অমরত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু ও যাঁহার ছায়া, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব? (২)

"যিনি নিজ মহিমাবলে জাগ্রত ও নিদ্রিত সমস্ত জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, যিনি মনুষ্য ও পশু সকলকেই শাসন করিয়া থাকেন, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব। (৩)

"যাঁহার মহিমাবলে আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ়ীভূতা হইয়াছে এবং যাঁহার মহিমায় স্বর্গ এমন কি সর্ব্বোচ্চ স্বর্গও সংস্থাপিত রহিয়াছে, যিনি আকাশপ্রদেশের পরিমাণ করিয়াছেন, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব? (৪)

"যাহার মহিমা-বলে তুষারাবৃত পর্ব্বতগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সরিৎ, সমুদ্র যাঁহার ক্ষমতায় অবস্থিতি করিতেছে; এই সমস্ত প্রদেশ যাঁহার দুই বাহু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে;—সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব"? (৫)

"যাঁহার ইচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবী দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে এবং সভয়ে যাঁহার

---

১ ঋগ্‌বেদ, ৪র্থ, ৫৩,২।

প্রতীক্ষা করিতেছে; উদীয়মান সূর্য্য যাহার উপর কিরণজাল বর্ষণ করিতেছেন; সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (৬)

"বীজ বহন করিতে ও অগ্নি উৎপাদন করিতে করিতে জলরাশি যখন সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াছিল, তখন যিনি দেবগণের একমাত্র জীবন, তিনি তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (৬)

" যিনি মহিমাবলে ক্ষমতাশালী ও হোমাগ্নি-প্রসবকারী জলরাশির উপরে কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্ব দেবতার উপর একমাত্র দেবতা, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?" (৮)

" যিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও উজ্জ্বল প্রভাশালী জলরাশির সৃজন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ যেন আমাদিগকে আঘাত না করেন, সেই দেবতা কে যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?" (৯)

" প্রজাপতি! আপনি ভিন্ন আর কেহ এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে আলিঙ্গন করেন না; আপনাকে আহুতি প্রদান কালে আমরা যাহা প্রার্থনা করি, তাহাই যেন আমাদের হয়; আমরা যেন ধনেশ্বর হইতে পারি"। (১০)

বৈদিক কবিগণের মনে উপরোক্ত ভাবের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা সহজেই এরূপ মনে করিতে পারি যে, তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে একেশ্বরবাদের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল; অর্থাৎ উহা ক্রমে এক সর্ব্বপ্রধান দেবতার পূজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। নানা আকার ও নানা নাম অকার্য্যকর হওয়ার পর, মানুষ অনন্তকে যে সর্ব্বোচ্চ আকার দিতে ইচ্ছা করেন, ভারতবর্ষেও এইরূপে তাহা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। যে সকল স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ঋগ্বেদে ও রূপ স্তোত্রের সংখ্যা অতিকম এবং তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-কালে, উহাদের অপেক্ষা সমধিক নিশ্চিত ও সমধিক সারবান্ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্তোত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণে যে, দেবতা ও অসুরগণের (১) পিতা প্রজাপতির প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেস্থলেও তাঁহার পৌরাণিক চরিত্রের কথা বর্ণিত হইতে দেখা

১ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১ম, ৪, ১, ১।

যায়। সেখানে তিনি অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও উষার পিতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন (১)। তাঁহার নিজ কন্যা উষার সহিত সেখানে তাঁহার প্রণয়ের উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই উপাখ্যানটীই প্রজাপতির উপাসকগণের উপাসনা-নিবর্ত্তনের হেতু হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণের কোন কোন অধ্যায় পাঠ করিলে কাহারও এমন মনে হইতে পারে যে, একেশ্বর-তৃষ্ণা পরিশেষে প্রজাপতিতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এবং অপরাপর দেবতারা প্রজাপতির নব-জ্যোতিপ্রভাবে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই——

"সর্ব্ব প্রথমে এক প্রজাপতিই এই সমস্তস্বরূপ ছিলেন (২)। প্রজাপতি ভরণ-কর্ত্তা। কারণ তিনিই এই সমস্ত ভরণ করিতেছেন (৩)। প্রজাপতি সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চতর শ্বাস বায়ু হইতে তিনি দেবতাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। নিম্নতর শ্বাস হইতে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। তৎপর তিনি জীবমাত্রের নাশক স্বরূপ মৃত্যুকে সৃজন করিয়াছেন। এই প্রজাপতির একার্দ্ধ মরণশীল, অপরার্দ্ধ অমর, মরণ-ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ থাকায় তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন (৪)।

নিরীশ্বরবাদের উপক্রম।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থকারেরা প্রজাপতিতেও মরণধর্ম্মশীল কোন স্বভাব অনুভব করিয়াছিলেন। এক স্থানে তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি পরিশেষে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হন এবং মন্যু ভিন্ন আর সমস্ত দেবতারাই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যান (৫)।

---

১ সাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ৬ষ্ঠ, ১।

২ শতপথ ব্রাহ্মণ, ২য়, ২, ৪, ১।

৩ ঐ ৬ষ্ঠ, ৮, ১, ১৪।

৪ ঐ ১০ম, ১, ৩, ১।

৫ ঐ ৯ম, ১, ১, ৬।

উপাসকদের অভিপ্রেত বিষয়ে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইলেও এতৎসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, তাহা মিথ্যা নহে।

দিন দিন হিন্দুগণের মন ক্রমেই উন্নত ও দৃঢ়তর হইতেছিল। অনন্তের অন্বেষণে ইহা কিছুকাল পর্ব্বত, নদীর আশ্রয় চাহিয়া ও তাহাদের অসীম মহিমার কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত ছিল। কিন্তু যাহা অন্বেষণ করা যাইতেছে, এই সকল যে, তাহার চিহ্ন মাত্র, হিন্দুদের এ জ্ঞান কখনও বিচলিত হয় নাই। তৎপরে আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ আকাশ, সূর্য্য ও উষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখেন এবং তথায় অর্দ্ধউন্মেষিত ও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত কোন জীবন্ত শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে অভ্যাস করেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ আপনাদের বিষয়াতীত কোন পদার্থের ধারণা করিতে এ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল।

আর্য্যগণ এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা উজ্জ্বল নভোমণ্ডলে একজন দীপ্তিকারক, সর্ব্বব্যাপী আকাশে একজন ব্যাপ্তকারক, বজ্র নিনাদে ও প্রচণ্ড ঝটিকাতে একজন শব্দকারী ও দুরন্ত আঘাতকারীর অস্তিত্ব অনুভব করেন, এবং বৃষ্টি হইতে বৃষ্টিদায়ক ইন্দ্রের সৃজন করিয়া লন।

এই শেষোক্ত কার্য্যের সহিত কার্য্যের প্রতিঘাত ও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। যত দিন প্রাচীন আর্য্যগণের মন প্রত্যক্ষ ও স্পৃশ্য পদার্থে ব্যাপৃত ছিল, তত দিন যে, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-লালসায় দৃষ্ট পদার্থের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথাপি কেহই এই সমস্ত কাল্পনিক দেবতার অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান হইতে সাহসী হন নাই। নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি চিরকালই বিদ্যমান ছিল, ইহাদের স্তোত্রে উচ্চভাব দৃষ্ট হইলে তাঁহারা উহা খর্ব্ব করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতেন না। আকাশ, সূর্য্য ও উষা সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ হইত। তাহারাও বিদ্যমান ছিল। যদিও তাহাদিগকে কেবল দর্শন-যোগ্য পদার্থ বলা যাইতে পারে, তথাপি মানব মন এরূপে গঠিত হইয়াছে যে, আবির্ভূত পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিয়া উহার আবির্ভাব স্বীকার করে না। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত অর্থাৎ অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য দেবতাদের সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ও বজ্রধারী রুদ্র মানব-মনের কল্পনা-সিদ্ধ পদার্থ মাত্র। বৃষ্টি ও বজ্র মাত্র দৃষ্ট হইত, কিন্তু যাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের আকার বলা যাইতে পারে, প্রকৃতিতে তাহা কিছুই দেখা যাইত না। বজ্র ও বৃষ্টি স্বর্গীয় বলিয়া পরিগণিত না হইয়া অবয়ব-বিহীন অদৃশ্য দেবতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনুষ্য কেবল আপনাদের কার্য্য মাত্র দেখিতেন। কেহই ইন্দ্র ও রুদ্রের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে আকাশ, সূর্য্য উষা বা অন্য কোন প্রকার দৃশ্য পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন না। ইতিহাসের দূরবর্ত্তী সময়ে মানব-জীবন ও মানব-চেষ্টার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে নরকপাল বা প্রস্তর ব্যবহার করা যে রূপ, ইহাও ঠিক সেইরূপ। উপাসকের মনে ইন্দ্রের অস্তিত্ব ও ইন্দ্রের উন্নতির সম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা রোধ করিতে পারে, প্রকৃতিতে এরূপ কোন পদার্থ না থাকায় ইন্দ্র যে, অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা সমধিক পৌরাণিক দেবতা হইয়া উঠেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অন্য বৈদিক দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রের সম্বন্ধেই অধিক যুদ্ধ ও উপাখ্যান বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিগণ কি রূপে যে, ইন্দ্রকে দ্যোঃর পরাভবকারী ও প্রাধান্য-বিলুপ্তকারী মনে করিতেন, ইহা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখনও "নেমিসিস্" বা বৈরদেবীর আগমন হয় নাই।

যে ইন্দ্র কিছু কালের জন্য এইরূপে অন্যান্য দেবতার গৌরব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে অনেকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও অন্ততঃ বেদের অতি প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন, প্রথমে সেই ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়েই অনেকে সন্দিহান হইয়া উঠেন।

ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রের প্রতি সংশয়।

বৈদিক স্তোত্রে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রের প্রতি যে, অধিক শ্রদ্ধা দেখা যায়, ইহা বড় বিস্ময়জনক বোধ হয়। বেদে আমরা এই ভাব দেখি, "অগ্নিময় ইন্দ্র যখন তাঁহার বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন লোকে তাঁহাকে

শ্রদ্ধা করে” (১) আবার দেখা যায় (২) যে, “তাঁহার এই মহৎ ও অলৌকিক কার্য্য অবলোকন কর এবং ইন্দ্রের শক্তিতে বিশ্বাস কর”। “হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের আত্মীয়বর্গকে আঘাত করিবেন না, যেহেতু আমরা আপনার মহৎ শক্তিতে বিশ্বাস করি” (৩)। “হে ইন্দ্র! আমাদের শ্রদ্ধা জন্মিবে বলিয়া চন্দ্র সূর্য্য যথানিয়মে পর্য্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করিতেছেন” (৪)। এইরূপ উক্তিসমূহকে ধর্ম্ম বিষয়ক যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। এত প্রাচীন কালেও যে,এইরূপ ভাব উপস্থিত হইবে, তাহা কখনই আশা করা যায় নাই। কিন্তু মানব-মনের ইতিহাসেও আমরা এই নীতি শিখিতে পারি যে, নূতন বস্তু মাত্রেই পুরাতন ও পুরাতন বস্তুমাত্রেই নূতন। জগৎ ও মনুষ্যের চিন্তা কেমন একত্র সংলগ্ন রহিয়াছে; তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। এস্থলে যে শ্রদ্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, লাতিনে তাহা credo ও ইংরাজীতে creed। রোমকেরা যেখানে Credidi পদ ব্যবহার করিতেন, ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক সেখানে ‘শ্রদ্ধধৌ’ পদ ব্যবহৃত হইত। আবার রোমকেরা যেখানে Creditum পদ ব্যবহার করিতেন, ব্রহ্মণেরা তথায় ‘শ্রদ্ধিতম্’ পদ প্রয়োগ করিতেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যবংশ পৃথক হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে ও সংস্কৃত সংস্কৃত হইবার এবং লাতিন, লাতিন হইবার পূর্ব্বে ঐ শব্দ ও ঐ ভাব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। মনুষ্য এই প্রাচীন কালেও ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত ও জ্ঞানের অগোচর বস্তুতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন; কেবল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বিশ্বাস অর্থ-বাচক একটী শব্দ প্রণয়ন করিয়াছেলেন, অর্থাৎ এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, তাঁহারা কি করিতে-ছিলেন, তাহা তাঁহারা মনে মনে জানিতেন। এই মানসিক ব্যাপারকে

---

১ ঋগ্‌বেদ, ১ম, ৫৫, ৫।

২ ঐ ১ম ১০৩, ৫।

৩ ঐ ১ম, ১০৪, ৬

৪ ঐ ১ম, ১০২, ২।

তাঁহারা "শ্রদ্ধা" (১) নামে অভিহিত করেন। Credo আর শ্রদ্ধা শব্দ-দ্বয়ের একত্বে যে কতদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়, এস্থলে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিবার অবকাশ নাই, এই একটী শব্দ আমাদের সম্মুখে আল্পস্ ও ককেশস্ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত যে অসীম বিস্তৃতি বিকাশ করে, আপনা-দিগকে কেবল তাহারই প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি।

অন্যান্য দেবতার বিশ্বাস সত্ত্বেও যে ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস করা একান্ত আবশ্যক, সেই ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়েও তাঁহার উপাসকেরা সন্দিহান হন (২)। যথা—

"যদি ধন চাহ, ইন্দ্রের উপাসনা কর, যদি ইন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে থাকেন, তবে প্রকৃতরূপে তাঁহার প্রশংসা কর। কেহ কেহ বলেন ইন্দ্র নাই। কেই বা তাঁহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহারই বা প্রশংসা করিব?"

নিম্নলিখিত স্তোত্রে কবি স্বয়ং ইন্দ্রকে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং বলাই-তেছেন, "হে উপাসক! এই আমি, আমাকে দেখ, আমি পরাক্রমে সর্ব্ব-জীবকে পরাজয় করিয়া থাকি (৩)"।

অপর একটী স্তোত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয় (৪):—

লোকে যে ভয়জনকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, "তিনি কোথায়? এবং যাঁহার সম্বন্ধে তাহারা কহে যে, তিনি নাই, ক্রীড়াকালে যেমন পণ গৃহীত

---

১ শ্রদ্ধার অন্তর্গত শ্রৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ আমার স্পষ্ট বোধ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রৎ শব্দ হৃৎ (অন্তঃকরণ), শব্দের অনুরূপ, শ্রদ্ধার অর্থ, যাহা হৃদয়ে গৃহীত হইয়াছে। আমি এই মতের অনুমোদন করিতে পারি না। কেবল শব্দগত বৈষম্য নয়, ঋগ্বেদে যে শ্রৎ শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থও একরূপ নয় যথা, "শ্রৎ বিশ্বা বার্য্যা ক্রিধি"। বেন্‌ফির ন্যায় আমারও বিশ্বাস যে শ্রু, (শ্রবণ করা) ধাতুর সহিত শ্রৎ শব্দের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ইহার প্রকৃত অর্থ, যাহা সত্য বলিয়া শ্রুত হইয়াছে, বিদিত হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহার ব্যুৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

২ ঋগ্‌বেদ, ৮ম, ১০০, ৩।

৩ অয়মস্মি জরিতঃ পশ্যমা ইহা বিশ্বা জাতানি ইত্যাদি।

৪ ঐ, ২য়, ১২, ৫।

হয়, সেইরূপ তিনি শত্রুর ধন হরণ করিয়া থাকেন। হে মনুষ্যগণ! তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর, কারণ তিনিই প্রকৃত ইন্দ্র।"

এইরূপে যখন আমরা দেখি যে, প্রাচীন দেবতা "দ্যৌঃ" অপ্রচলিত হইলেন, ইন্দ্র স্বয়ং অস্বীকৃত হইলেন, প্রজাপতি খণ্ডীকৃত হইয়া পড়িলেন, এবং অন্য এক কবি দেবতাগণকে নামমাত্র দেবতা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন আমাদের মনে উদয় হয়, যে ধর্ম্ম-চিন্তার স্রোত পর্ব্বত নদী হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে আকাশের ও সূর্য্যের উপাসনা করিতেছিল, শেষে ইন্দ্র ও রুদ্রপ্রভৃতি অদৃশ্য দেবতাগণের পূজা করিতে থাকে, তাহা প্রায় তাহার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। আইসলণ্ডস্থ ইডর্ কবিগণ বারংবার বলিয়াছেন যে, জগৎ ধ্বংশ হইবার পূর্ব্বে দেবতারা হীনপ্রভ হইবেন, আমরা ভারতবর্ষেও সেইরূপ কোন দুর্দ্দিবের আশঙ্কা করিতে পারি। যে অবস্থায় ইষ্টেশ্বরবাদ একদিকে বহু দেবতার উপাসনায় ও অপরদিকে একেশ্বরের উপাসনায় পর্য্যবসিত না হইয়া নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল, বোধ হয় আমরাও সেই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

প্রকৃত ও সাধারণ নাস্তিকতার প্রভেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থাবিশেষে নিরীশ্বরবাদ উপলব্ধ হইলেও ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের উহা শেষ ফল নহে। ভারতের ধর্ম্মসম্বন্ধে এই শব্দটী প্রয়োগ করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে হোমরীয় গায়ক বা ইলিয়ার দার্শনিক, এতদুভয়ের কিছুই ছিল না। তাঁহাদের নিরীশ্বরবাদকে বরং প্রাচীন দেবতাদের অস্তিত্বের অস্বীকারকরণ বলা যাইতে পারে। এক সময়ে যাহা বিশ্বাস করা যাইত, তাহা অস্বীকার করা বা তাহাতে বিশ্বাস করিতে বিরত হওয়াকে ধর্ম্মের বিনাশ বা ধ্বংস না বলিয়া, ধর্ম্মের জীবনী-শক্তিই বলিতে হইবে। প্রাচীন আর্য্যগণ প্রথম হইতেই কোন অসীম, অনন্ত ও স্বর্গীয় বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকেন এবং এক নামের পর নামান্তর কল্পনা

করিয়া উহা অবধারণ করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা মনে করিতেন, পর্ব্বতে, নদীতে, উষায়, সূর্য্যে, আকাশে, স্বর্গে ও স্বর্গপিতায় তাঁহারা উহা পাইয়াছেন। কিন্তু একে একে সকলই বৃথা হইয়া আসিল। তাঁহারা যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা প্রথমতঃ পর্ব্বতের ন্যায়, নদীর ন্যায়, উষার ন্যায়, আকাশের ন্যায়, পিতার ন্যায় ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে বোধ হইল, তাহা পর্ব্বত নহে, উষা নহে, নদী নহে, আকাশ নহে এবং পিতাও নহে। অথচ সমুদয়েই উহা আছে—কিন্তু উহা এ সমস্ত হইতে উচ্চতর ও এ সমস্তের অতীত। এমন কি অসুর, দেবতা প্রভৃতি সাধারণ নামেও তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারা বলিতেন, অসুর দেবতারা থাকিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক চাই, আমরা উচ্চতর শব্দ ও পবিত্রতর ভাব চাই। তাঁহারা কম বিশ্বাস ও কম অভিলাষ করিতেন বলিয়া যে উজ্জ্বল দেবতাদিগকে ভুলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা উজ্জ্বল দেবতা অপেক্ষা উন্নত বিষয়ে অভিলাষ করিয়া উহাদিগকে অবশেষে অনাদর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের মনে ক্রমে একটী নূতন কল্পনা জাগিতেছিল এবং তাঁহাদের নৈরাশ্যের চীৎকারেই অভিনব ভাবের সূচনা করিতেছিল।

ধর্ম্মের উন্নতি এই ভাবেই হইয়া থাকে, ভবিষ্যতেও এই ভাবে হইবে। আমরা দ্বিবিধ নিরীশ্বরবাদ দেখিতে পাইয়া থাকি। একরূপ নাস্তিকতায় সত্য মৃত্যু তুল্য। কিন্তু আর এক প্রকার নাস্তিকায় প্রকৃত বিশ্বাসমাত্রেই জীবন ও শোণিত সদৃশ। যখন কোন বিষয় একান্ত অসত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আমরা এই শেষোক্ত নাস্তিকতা-বলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি। কোন অসম্পন্ন বিষয় আমাদের নিকট নিতান্ত প্রিয় ও পবিত্র হইলেও আমরা এই নাস্তিকতা-বলেই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাততঃ জগতের অনাদৃত সুসম্পন্ন বিষয় পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই। ইহাই প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ, ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, ইহাই সত্যে প্রকৃত বিশ্বাস ও ইহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। এরূপ নাস্তিকতা না থাকিলে ধর্ম্ম অনেক পূর্ব্ব হইতেই কঠোর কপটতা হইয়া উঠিত। ইহা ব্যতীত নূতন ধর্ম্ম, কোন সংস্কার বা কোনরূপ বিপ্লব

একবারে অসম্ভব হইয়া উঠিত। ইহা ব্যীতত আমাদের মধ্যে কেহই নবজীবনের অধিকারী হইতে পারিতেন না।

একবার ধর্ম্মের ইতিহাসপ্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কত লোকেই নাস্তিক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা দৃশ্য ও সীমাবদ্ধের অতীত পদার্থ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ উক্ত হন নাই, কিংবা কারণ ব্যতীত, অভিপ্রায় ব্যতীত ও ঈশ্বর ব্যতীত জগৎ বুঝিতে পারা যায় বলাতেও উক্ত রূপ নিরীশ্বরবাদী নামে অভিহিত হন নাই। তাঁহারা উক্তরূপ মত অস্বীকার বা প্রচার না করিলেও কেবল বাল্যকালে শিক্ষিত, লোকবিদিত ও সাময়িক ঐশ্বরিক ধারণা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উচ্চতর ও পবিত্রতর ধারণা করিতে অভিলাষী হওয়াতেই নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণদের মতে বুদ্ধ এক জন নাস্তিক। অনেক বৌদ্ধ-দর্শনের মত নাস্তিকতা-পূর্ণ বটে, কিন্তু স্বয়ং গৌতম শাক্যমুনি নাস্তিক ছিলেন কিনা, সন্দেহ। ফলতঃ তিনি লোক-বিদিত দেবগণকে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে নাস্তিক বলা যাইতে পারে না (১)।

এথেনীয় বিচারপতিদের মতে সক্রেতিশ্‌ও একজন নাস্তিক। কিন্তু সক্রেতিশ গ্রীশের দেবদেবী অস্বীকাব কবিতেন না। তিনি কেবল হিফেইস্তস্‌ ও অফ্রদাইত প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষা কোন উচ্চতব ও প্রকৃত স্বর্গীয় পদার্থে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইহুদিদিগের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি একজন দেবদ্বেষ্টা, এবং যে কেহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের দেবতাকে ঐ নূতন পদ্ধতিতে পূজা করিতেন, তিনি বিধর্ম্মী বলিয়া অভিহিত হইতেন। এমন কি খ্রিষ্টীয় এই নাম গ্রীক ও রোমকদের নিকট নাস্তিকদের নাম বলিয়া পরিগণিত হয়।

খ্রিষ্টীয়গণও উক্ত রূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এথনসিয়স্‌সের মতে এরিয়ানেরা খ্রিষ্ট-বিদ্রোহী, ইহুদি, উন্মত্ত, বহুদেবোপাসক ও নাস্তিক বলিয়া পবিগণিত হইযাছেন। এরিযস যদি এথন-

১ বুলর সাহেবের "অশোকের তিনটী নূতন অনুশাসন," ২৯ পৃষ্ঠা দেখ। বোম্বাই, ১৮৭৭।

সীবদিগকে অপেক্ষাকৃত ভাল চক্ষে না দেখিয়া থাকেন, আমাদের তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তথাপি এথনসিয়স্ ও এরিয়স্ উভয়েই নিজ নিজ মতে ঈশ্বরের সর্ব্বোচ্চ ধারণা চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এরিয়স এই ভয় করিতেন যে, পাছে জেণ্টাইলদিগের ভ্রমে ইহার গৌরব ও সত্য খর্ব্ব হয়, এবং এথনসিয়স এই ভয় করিতেন, পাছে ইহুদিদিগের ভ্রমে উক্তরূপ বিপত্তি ঘটে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ধর্ম্মতত্ব নিয়া যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতেও উক্ত রূপ কদর্য্য ভাব দেখা গিয়া থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সরবিতস্, কলবিনকে ত্রিদেবোপাসক ও নাস্তিক বলিয়াছেন, কলবিন এদিকে সরবিতস্‌কে বধের যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক মত ভিন্ন রূপ ছিল।

পরবর্ত্তী শতাব্দীর একটী ঘটনা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। আধুনিক সময়ে এই ঘটনার বিষয় বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে। যদিও অনেকে বানিনিকে পাষণ্ড-শিরোমণিমাত্র বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিচারপতি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে ও তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিতে আদেশ দেন (১৬১৯)। আধুনিক লেখকেরাও বানিনির প্রতিপক্ষীয়গণের পক্ষ সমর্থ করিয়াছেন, কিন্তু এই নাস্তিক ঈশ্বরসম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনা আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন "তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, ঈশ্বর কি, আমি যদি তাহা জানিতাম, তাহা হইলে আমি নিজেই ঈশ্বর হইতাম। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। যদিও মেঘের মধ্য দিয়া সূর্য্য দেখার ন্যায় আমরা তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য-দ্বারা কোন প্রকারে বুঝিতে পারি, তথাপি উক্ত রূপে আমরা তাঁহার সম্যক্ অবধারণা করিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যে, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মঙ্গলময়, সর্ব্বপ্রথম-সম্ভূত, সর্ব্বসম্পূর্ণ, অনন্ত, ন্যায়বান্, নিত্য-সন্তুষ্ট, সুখময় ও ধীর; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, সমদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি পিতা, রাজা, প্রভু, দাতা, শাস্তা, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই মধ্য ও অনন্ত; তিনিই

প্রণেতা, জীবন দাতা, তিনিই দর্শক, কুশলী, বিধাতা, হিতকারী, তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা।"

যিনি এইরূপ লিখিয়াছেন তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নাস্তিকতার প্রকৃত অর্থসম্বন্ধে এত দূর মত-ভেদ ও গোলমাল দেখা যায় যে, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা নগরের পার্লিয়ামেণ্ট নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ করেন (১), এবং স্পাইনোজা ও আর্ক বিশপ টিলোটসন্ প্রভৃতির ন্যায় লোক ভস্মসাৎ না হইলেও নাস্তিক অপবাদগ্রস্ত হন (২)।

অষ্টাদশ শতাব্দীও একবারে উক্তরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহে। যাঁহারা স্বপ্নেও কখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তাঁহারা কেবল মানব-প্রকৃতি-সুলভ ভ্রম ও বাগাড়ম্বর হইতে ঈশ্বরের ধারণা পবিত্র রাখিতে অভিলাষী হওয়াতে নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

আজি কালি আমরা নাস্তিক শব্দের অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। আর বিশেষ না ভাবিয়া চিন্তিয়া, উহার ব্যবহার করি না। তথাপি যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি আপনার ও অপরের প্রতি সাধুতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ইহা মনে থাকা আবশ্যক যে, তাঁহাদের সমক্ষে যাহারা ঈশ্বরনিন্দক, পাষণ্ড ও নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহারা কি রূপ লোক ছিলেন।

যাঁহারা একান্তচিত্তে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময় আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত মনে করেন। তখন তাঁহারা "তবে আমি, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করি কি না করি," কদাচিৎ এইরূপ প্রশ্ন আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইয়া থাকেন।

তাঁহারা যেন নিরাশ না হন এবং আমরা ও যেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কঠোর বিচার না করি। তাঁহাদের নৈরাশ্য অনেক ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যাঁহার আত্মা অনন্তধামে গমন করিয়াছে, যাঁহার সাধুতা ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন, এস্থলে সেই মহামান্য সহৃদয় ধর্ম্মোপদেষ্টার কয়েকটী মাত্র কথা উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবের

---

১ Macaulay, 'History of England,' chap. XXII.

২ Macaulay, 'History of England,' chap. XVII.

উপসংহার করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বর এই বাক্যটী অতি মহৎ, যিনি তাহা অবধারণ করিযাছেন ও বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি 'ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে', যাঁহাদের এরূপ বলিতে সাহস হয না, সমধিক ধীরতা ও সমধিক ন্যায়পরতার সহিত তাঁহাদের বিচার করিতে পারিবেন।"

আমি এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহা এক্ষণে বলিলাম, তাহা তাহার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হইবে না এবং সম্ভবতঃ তাহা অসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। আমি যে, নিরীশ্বরবাদের সমর্থন করিয়াছি এবং নিরীশ্বর-বাদকে গৌরবান্বিত করিয়া ধর্ম্মভাবোৎপত্তির মনুষ্যলভ্য চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে যে নিন্দিত হইব, তাহাও বেশ জানি। কিন্তু পাঠকবর্গের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃত নাস্তিকতার অর্থ বুঝিয়া থাকেন এবং প্রকৃত ও সাধারণ নাস্তিকতার প্রভেদ স্পষ্টরূপে জানিতে সমর্থন হন, তাহা হইলেই আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব। কারণ আমি জানি যে, কেবল এই প্রভেদ-জ্ঞানই নিতান্ত প্রয়োজনেয় সময় আমাদের সাহায্য করে। ইহা আমাদিগকে বলিয়া দিবে যে, সুখদ মধুর বসন্তের পত্র ক্রমে শীতসমা-গমে বৃন্তচ্যুত হইয়া নিপতিত হইলেও আবার নব বসন্তাগমের প্রত্যাশা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগকে শিখাইয়াদিবে যে, সাধুসন্দিগ্ধ-ভাব, সাধু বিশ্বাসের গভীর উৎস স্বরূপ।

ভারতবাসিগণেব মন কিরূপে এই অবস্থায় উপনীত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক এই সুমহৎ উপপাদ্যের অনুশীলন করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা লউকুনের ন্যায় নাস্তিকতা-রজ্জুচ্ছেদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আমাদের শেষ প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্ম।

দেবগণের তিরোধান।

ভারতবর্ষের আর্য্য অধিবাসিগণের যখন বিশ্বাস জন্মিল যে, দেবতাগণ কেবল নামমাত্র; তখন আমরা বুঝিতে পারি, যাহাদিগকে তাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে স্তুতি ও পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন নৈরাশ্য ও উপেক্ষার সহিত তাঁহারা সেই দেবগণের পূজা ও স্তুতিগান হইতে বিমুখ হইলেন। গ্রীকেরা যখন তাঁহাদের পবিত্র দেবমন্দির বিনষ্টপ্রায় দেখিল, জর্ম্মণেরা যখন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র ওক বৃক্ষ ভূপতিত দর্শন করিল, আপোলো কিংবা ওদিন দেব যখন এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন না, তখন সেই গ্রীক ও জর্ম্মণদিগের হৃদয়ে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইন্দ্র অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নামমাত্র বলিয়া অবধারিত হইলে পর আর্য্যগণেরও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরিণামে আমরা যেরূপ ফলের আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে সেরূপ ফল দেখা যায় নাই। গ্রীক, রোমক ও জর্ম্মাণদের মধ্যে দেবতাগণ একবারে অন্তর্হিত অথবা তাহা-দের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার্য্য হইয়া উঠিলে তাহারা কুকর্ম্মক্ষম প্রেত-শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মানব-হৃদয়ের অদমনীয় ধর্ম্ম-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য খ্রিষ্ট ধর্ম্ম ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হইতেছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন অভিনব ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই, এরূপ কোন অভিনব ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের সম্মুখে আইসে নাই যে, ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রাচীন দেবতাগণের উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা গ্রীক ও রোমকদিগের পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ হন নাই। অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান করিলে কৃতকার্য্য

হইতে পারা যাইবে, এই আশায়, যে ধর্ম্ম তাঁহাদের জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে কিংবা যাহার নামকরণ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না, সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-পথেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

তাঁহারা উপাস্য দেবতার প্রাচীন নাম গুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাহার নাম নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা যত্নবান্ ছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন দেবগণের বেদি ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদি লইয়া অজ্ঞাত অনামকৃত তথাপি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের এক নূতন বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আর তখন পর্ব্বত, নদী, আকাশ, সূর্য্য, বৃষ্টি বা বজ্র প্রভৃতিতে ঈশ্বর দেখিতেন না। তাঁহারা তখন আপনাদের সম্মুখে, আপনাদের চারিদিকে, আপনাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিলেও সেই ঈশ্বরকে আর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববিষয়ালম্ব বরুণ বলিয়া মনে করিতেন না।

স্বর্গীয় নামের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন বৈদিক কবিগণ কখনও বলেন নাই যে, মিত্র বরুণ ও অগ্নি কেবল নাম মাত্র—নাম মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন (১), "তাঁহারা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির কথা কহিতেছেন। তিনি স্বর্গীয় পক্ষী গরুত্মৎ, তিনি সৎ ও অদ্বিতীয়, কবিগণ তাঁহাকেই নানা রূপে কহিয়া থাকেন; তাঁহারা যম, অগ্নি বায়ুর কথাও কহিয়া থাকেন।"

এস্থলে আমরা এই তিনটী বিষয় দেখিতেছি। প্রথমতঃ, সৎ অনির্ব্বচনীয় কিছু যে, আছে, কবিগণ তাহাতে কখনই সন্দেহ করিতেন না। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি কেবল ঐ কিছুর নাম মাত্র।

(১) ঋগ্বেদ, ১ম, ১৬৪, ৪৬,
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,
অগ্নি যমং মাতরিশ্বিনামাহুঃ।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকৃত অনির্ব্বচনীয় কিছু একমাত্র, ইহার দ্বিতীয় নাই। তৃতীয়তঃ এই সৎ অনির্ব্বচনীয় কিছু প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের ন্যায় পুংলিঙ্গে উক্ত না হইয়া ক্লীবলিঙ্গে উক্ত হয়।

ক্লীবলিঙ্গ নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নাম হইতে মহৎ।

ক্লীব নাম যে, পুং বা স্ত্রী নাম অপেক্ষা মহৎ ও প্রশস্ত, ইহা শুনিতে ভাল বোধ হয় না। স্বর্গীয় নাম যে, ক্লীবলিঙ্গে কল্পিত হইবে, ইহা আমরা দেখিতে পারি না। ক্লীবলিঙ্গ শব্দে আমাদের নিকট কোন জড়, নিশ্চেষ্ট বা মৃত পদার্থ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন ভাষায় বা প্রাচীন চিন্তায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দে ঐ রূপ বুঝাইত না; আজি কালি অনেক আধুনিক ভাষাতেও উহা প্রথম অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না। প্রাচীন আর্য্যগণ ক্লীবলিঙ্গ মনোনীত করিয়া উহা দ্বারা এরূপ কোন বিষয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উহা কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রী হইবে না, উহা দুর্ব্বল মানব-প্রকৃতির অতীত হইবে এবং উহা স্ত্রী, পুরুষ বা তদপেক্ষা কোন অপকৃষ্ট পদার্থ না বুঝাইযা কোন উচ্চতর ও উৎকৃষ্ট পদার্থ বুঝাইবে। তাঁহারা সজীব অথচ লিঙ্গবিহীন ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেন। এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কবিগণ বহুনামযুক্ত এক ঈশ্বরের পুংলিঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন। সূর্য্যের উদ্দেশে যে স্তোত্র উক্ত হইয়াছে—যে স্তোত্রে পক্ষীর সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে (১), তাহাতে এই পুংলিঙ্গেরই নির্দ্দেশ দেখা যায়ঃ—"বিজ্ঞ কবিগণ ঐ একমাত্র পক্ষীকে বাক্য দ্বারা নানা রূপে বর্ণন করেন।" আমাদের চক্ষে এই স্তোত্র পৌরাণিক গল্প মাত্র বলিয়া বোধ হয়।

নিম্নলিখিত কবিতায় পরমদেবতা অল্প পৌরাণিক অথচ সাকারভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেনঃ—(২)

---

১ ঋগ্‌বেদ, ১০ম, ১১৪, ৫,
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ঃ বাচোভিঃ
একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

২। ঐ, ১৬৪, ৪।

"কে তাহাকে প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছে? যাঁহার অস্থি নাই, কে তাঁহাকে অস্থিবিশিষ্ট পদার্থ ধারণ করিতে দেখিয়াছে?

জগতের প্রাণ, রক্ত, ও আত্মাই বা কোথায় ছিল? যিনি ইহা জানিতেন, কে ই বা তাঁহার নিকট ইহা জানিতে গিয়াছিল?"

উপরোক্ত শ্লোকের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপূর্ণ। যিনি আকার-শূন্য বা নিরাকার, এই ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা যেমন "যাঁহার আকার নাই" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, উপস্থিত স্থলে সেই রূপ "যাঁহার অস্থি নাই" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে "যাহার অস্থি আছে" এই বাক্য, "যাহার আকার আছে," বা "যিনি আকারবদ্ধ" এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যে অজ্ঞাত বা অদৃশ্য শক্তি জগৎ পালন করিতেছে, তাহা জগতের প্রাণ ও রক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আজি কালি আমরা যাহাকে জগতের মুল পদার্থ বা সারাংশ বলিয়া থাকি, তাহা "প্রাণ" শব্দ দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

অন্তরাত্মা।

প্রাণ—সংস্কৃত 'আত্মন্' শব্দ সচরাচর ইংরেজী self শব্দে ভাষান্তরিত হইয়া থাকে। আদৌ এই শব্দে শ্বাস তৎপরে জীবন এবং কখন কখন শরীরও বুঝাইত। কিন্তু প্রায়ই ইহা "আত্মা" অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইহা ক্রমে self শব্দের ন্যায় একটী সাধারণ বৈয়াকরণিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। যাহা হউক, ইহা কেবল এই সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের—এমন কি সমস্ত জগতের একটী অত্যুচ্চ দার্শনিক সংজ্ঞার অন্তর্গত হইয়া উঠে। ইহা কেবল "অহম্" বা "আমি" অর্থে প্রযুক্ত হইত না। যেহেতু এই "অহম্" বা "আমি" ইহ জীবনের অনিত্য উপাদানে সংগঠিত। ইহাতে "অহম্" বা "আমি"র অতীত অথচ অহংএর আশ্রয়-স্বরূপ কোন পদার্থ বুঝাইত। ইহা কিছুকাল পরে মানব-প্রকৃতি-সুলভ অহংএর অবস্থা ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বলিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য ভাষাতে যে যে শব্দ আদৌ শ্বাস্ বুঝাইয়া পশ্চাৎ জীবন, জীবনী শক্তি ও আত্মা বুঝাইয়াছে, সেই সকল শব্দের সহিত আত্মন্ শব্দের প্রভেদ দেখা যায়। অতি প্রাচীন কালে উহার শ্বাস অর্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পশ্চাৎ উহা উহার প্রথমার্থ-বর্জ্জিত হইয়া এবং সর্ব্ব নামের কার্য্য করিয়া লাতিন amima বা amimus এবং সংস্কৃত অসু বা প্রাণ শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম বস্তুর গতির উপায়ভূত উঠে। উপনিষদে "আত্মায় বিশ্বাস" অপেক্ষা "প্রাণে বিশ্বাস" কথা দার্শনিক জ্ঞানের অধিকতর হীনাবস্থা বিকাশ করিয়া থাকে। ইংরেজীতে যেমন I অপেক্ষা selfএর প্রাধান্য অধিক, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ প্রাণ অপেক্ষা আত্মার প্রাধান্য অধিক ছিল। পরিশেষে আত্মাতে প্রাণ বিলীন হইয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শেষে এইরূপে তাঁহাদের জীবনের আশ্রয়ভূত অহম্এর অতীত অনন্ত অন্তরাত্মা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বাহ্যাত্মা।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতীয় আর্য্যগণ কি রূপে বাহ্য জগতে অনন্তের আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বৈদিক কবিগণ কিছুকাল একমাত্র অদ্বিতীয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন। এই এককে তাঁহারা একেশ্বর মনে কবিতেন, কিন্তু এই ঈশ্বরের সম্বন্ধেও কখন কখন পৌরাণিক গল্প কথিত হইত এবং ইনিও পুংলিঙ্গে উক্ত হইতেন। বস্তুত ইনি স্বর্গীয় আত্মা বলিয়া পরিগণিত না হইয়া স্বর্গীয় অহং বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আবার আমরা হঠাৎ বেদের ভিন্ন প্রকৃতির কবিতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হই। এই সকল কবিতা পাঠে বোধ হয়, যেন আমরা এক নূতন জগতে বিচরণ করিতেছি। এখানেপৌরাণিক কথা-মূলক প্রত্যেক দেহ, প্রত্যেক নামই যেন আত্মসমর্পণ করে, এখানে কেবল সৎ কিংবা একমাত্রের বিকাশ দেখা যায়। ইহাই যেন অনন্ত অব-ধারণের শেষ চেষ্টা। বেদে এক, অদ্বিতীয় ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহার পর বৈদিক কবিগণকে আর আকাশ, উষা প্রভৃতির স্তুতি করিতে দেখা যায় না। তাঁহারা আর ইন্দ্রের ক্ষমতায় মুগ্ধ হন না, এবং বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতির জ্ঞান-বিকাশেও প্রীত হন না। তাঁহারা স্বয়ংই কহেন, তাঁহারা "যেন কুজ্ঝটিকা ও বৃথা বাক্যে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছেন (১)। অপর কবি বলেন (২), "আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে, আমার কর্ণ ক্ষীণ হইতেছে, আমার হৃদয়ের আলোক ক্ষীণতর হইতেছে, আমার দুরাশাগ্রস্ত মনও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে, আমি কি ই বা বলিব, কি ই বা ভাবিব" ?

তাহার পর আর একস্থলে দেখা যায়, "কিছুই না জানিয়া,—অনভিজ্ঞ, আমি জ্ঞানী ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি এই ষড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই কি সেই এক, যিনি অজাত ও যিনি নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন" (৩) ?

যে ঝটিকার অবসানে আকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, অভিনব বসন্তের সমাগম দেখা যাইবে, উল্লিখিত ভাব সকল সেই ঝটিকার প্রারম্ভ।

পরিশেষে বেদে (৪) অদ্বিতীয়ের বিষয় সাহসসহকারে সমর্থিত হইয়াছে। এই এক, অদ্বিতীয় সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের পূর্ব্বে, সমুদয় দেবগণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেবতারাও অবগত নহেন।

আমরা বেদে দেখিতে পাই, সমুদর বস্তুব পূর্ব্বে, মৃত্যু ও অমরত্বের পূর্ব্বে এবং দিবা রাত্রির প্রভেদের পূর্ব্বে, কেবল সেই এক, অদ্বিতীয়ই বিদ্যমান ছিলেন। এই এক, অদ্বিতীয় স্বয়ং শ্বাসবিহীন হইলেও শ্বাস প্রশ্বাস লইতেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। প্রথমে সমস্তই ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। সমুদয়ই আলোক-শূন্য সমুদ্রের ন্যায় বোধ

১। ঋগ্বেদ ১০ম, ৮২, ৭।

২। ঐ ৬ষ্ঠ, ৯, ৬,

৩। ঐ ১ম, ১৬৪, ৬,

৪। ঐ ১০ম, ১২৯, ২।

হইত। অনন্তর তুষারাবৃত বীজ—সেই এক অদ্বিতীয় তাপপ্রভবে আবির্ভূত হন"। এইরূপে কবি সৃষ্টির প্রারম্ভবিষয়ক কঠিন সমস্যার উদ্ভেদ করিয়াছেন, এক কিরূপে বহুত্ব প্রাপ্ত হইল, অবিদিত কিরূপে বিদিত ও নামযুক্ত হইল, এবং অনন্ত কিরূপে অন্তবান্ হইয়া উঠিল, তাহা এইরূপে উল্লেখ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরিশেষে তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইয়াছেঃ—

"কে এই সকল গুপ্ত বিষয় অবগত আছে? কেই বা ইহা প্রচার করিয়াছে? এই সুবিশাল বিশ্ব কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইল? দেবগণ পরে সৃষ্ট হইয়াছেন, কে জানে তাঁহারা কোথায় সৃষ্ট হইয়াছেন? যাঁহা হইতে এই বিশাল বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা সেই সর্ব্বদর্শী, স্বর্গবাসী ঈশ্বরই জানেন। হয়ত তিনি ইহা নাও জানিতে পারেন"।

ঋগ্বেদের স্তোত্রে এই প্রকার যে সকল ভাব প্রথমোদিত ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হয়, কালসহকারে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কালসহকারে তাহাদের এই ক্ষীণ আলোক অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরিশেষে তৎসমুদয় উপনিষদে একটী সম্পূর্ণ ছায়াপথে সম্মিলিত হয়। এই উপনিষদ বৈদিক কালের অন্তর্গতও বৈদিক কালের শেষাংশে রচিত। কিন্তু এই সীমার বাহিরেও উহা আপনার প্রভাব বিকাশ করিয়া থাকে।

উপনিষদের দার্শনিক ভাব।

স্তোত্র-কালের পরেই ব্রাহ্মণ-কাল। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত, প্রাচীন যাগ যজ্ঞের বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণকালের পর "আরণ্যক" দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যের নিভৃত প্রদেশ আশ্রয় করেন, এ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য।

এই আরণ্যকের শেষে বা ইহার সঙ্গে প্রাচীন "উপনিষদ" দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপনিষদের প্রকৃত অর্থ গুরু-সন্নিধানে ছাত্রসমূহের সমাগম। এই সকল উপনিষদে বৈদিক কালের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দার্শনিক মত সংগৃহীত হইয়াছে। উপনিষদের গভীর ভাব—চিন্তার অপূর্ব্ব বিকাশ যাহাতে আপনাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়, তাহার জন্য উপস্থিত প্রস্তাবে উপনিষদের সমস্ত মত গুলিই ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; এই সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমার নিকট সংগৃহীত ছিল; কিন্তু সময় অল্প থাকাতে আমি অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি।

প্রকৃত দার্শনিক পদ্ধতিতে যাহা বুঝায়, তাহা উপনিষদে কিছুই নাই। উপনিষদ সত্যের অনুমান মাত্র, পরস্পর বিষংবাদী হইলেও এই সকল সত্যকে এক দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায়। "আত্মজ্ঞান-লাভ"ই—প্রাচীন উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য, এই "আত্মজ্ঞান-লাভের" অর্থ অতি গভীর। উপনিষদের "আত্মজ্ঞান-লাভ" শব্দে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বুঝায়, যাহা "অহং"এর অন্তর্নিবিষ্ট তাহার জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্ত আত্মাতে সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত একমাত্র অদ্বিতীয়ের জ্ঞানই উপনিষদের মতে প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান।

অনন্ত, অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও স্বর্গীয়ের জন্য অনুসন্ধানের ইহাই শেষ ও চূড়ান্ত ফল। এই অনুসন্ধান প্রথমে বেদের অতি সামান্য স্তোত্রে আরম্ভ হইয়া পরিশেষে উপনিষদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদ বেদান্ত বা বেদের শেষভাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ভারতের—এমন কি সমস্ত জগতের এই অনুপম, মনোহর, সারগর্ভ ও অদ্বিতীয় সাহিত্য হইতে এ স্থলে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

প্রজাপতি ও ইন্দ্র।

প্রথমে ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে (৮ম,৭-১২) কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা একটী উপাখ্যান মাত্র। ইহাতে দেবগণের অধিনায়ক ইন্দ্র ও অসুরগণের অধিনায়ক বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপদেশ লাভ করি-

তেছেন। ঋগ্বেদের স্তোত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে ইহা কখনই আধুনিক নহে। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে বৈরভাব যে, পরবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে বিশেষতঃ উহার শেষ ভাগে এই বৈর-ভাবের চিহ্ন দেখা যায়। "অসুর" শব্দ আদৌ প্রকৃতির বিশেষতঃ আকাশের কোন শক্তির বিশেষণ-বাচক ছিল। কোন কোন স্থলে কেহ কেহ "সজীব দেবতা" শব্দ দ্বারা "দেবাসুর" শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন। কিছুকাল পরে অসুর শব্দ কোন প্রেতাত্মার বিশেষণ হইয়া উঠে এবং পরিশেষে বহু-বচনে প্রযুক্ত হইয়া সদাত্মা দেবগণের অসদৃশ দুষ্ট যোনির নাম হয়। ব্রাহ্মণে এই প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে কেবল যুদ্ধ দ্বারাই প্রায় সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র যে, দেবগণের অধিনায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা অতি স্বাভা-বিক। বিরোচন নামটী আধুনিক। স্তোত্রে উহার উল্লেখ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথমে বিরোচনের আবির্ভাব দেখা যায়। উক্ত ব্রাহ্মণের ১ম, ৫, ৯, ১ শ্লোকে বিরোচন প্রহ্লাদ ও কয়াধুর পুত্র বলিয়া পরিচিত হই-য়াছেন। এই উপাখ্যানে প্রজাপতির প্রধান দেবত্ব কল্পিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ম, ৫, ৯, ১) প্রজাপতি ইন্দ্রের পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা দেখাইবার জন্যই এই উপাখ্যানের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। প্রজাপতি প্রথমে অস্পষ্ট ভাবে কহিতেছেন,—"যে পুরুষ চক্ষুমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা"। ইহা দ্বারা তিনি চক্ষুর অনধীন দর্শক বুঝাইলেন। কিন্তু তাহার ছাত্রেরা তাহা বুঝিতে পারিল না। বিরোচন মনে করিলেন, যে ক্ষুদ্র দেহ দর্পণের ন্যায় চক্ষুর তারাতে দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা। পক্ষান্তরে ইন্দ্র বুঝিলেন, দর্পণে কিংবা জলে যে ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই আত্মা হইবে। বিরোচন নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র আপনার ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় জ্ঞান-রহিত ও স্বপ্নগত কোন পদার্থে আত্মার অনুসন্ধানে যত্নবান হইলেন, তৎপরে

যে ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে বিরত হইয়াও সম্পূর্ণ অচেতন রহিয়াছে, তাহাতে আত্মার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা একবারে সর্ব্বধ্বংস অর্থাৎ নির্ব্বাণ বলিয়া বোধ হওয়ায় ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে দেখিলেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ ইন্দ্রিয়গণ হইতে যিনি পৃথক্, তিনিই আত্মা; যিনি চক্ষুমধ্যে দৃষ্ট হন, অর্থাৎ যিনি চক্ষুমধ্যে দর্শকরূপে অনুভূত হন, অথবা যিনি আপনাকে বোদ্ধা বা বেদিতা বলিয়া জানেন, এবং স্বর্গীয় চক্ষুরূপ মন যাঁহার যন্ত্র স্বরূপ, তিনিই আত্মা। অরণ্যবাসীরা যেরূপে সত্যের চরমোৎকর্ষের বিকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং যেরূপে অনন্তের জন্য গভীর অন্বেষণ করিয়া, অনুসন্ধেয় বিষয়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।

সপ্তম খণ্ড।

'প্রজাপতি বলিলেন, "যাহা পাপ হইতে বিমুক্ত, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, যাহা কামনার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই কামনা করে না, যাহা চিন্তার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই চিন্তা করেনা, তাহাই আত্মা। এই আত্মা আমাদের অনুসন্ধেয় এবং এই আত্মা উপলব্ধি করিতে আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি এই আত্মার অনুসন্ধান করিয়া, তাহাকে জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বজগৎ ও কামনা লাভ করিতে সক্ষম হন"। ১।

'দেবতা ও অসুরগণ ইহা শুনিয়া বলিল, "আমরা এবংবিধ আত্মার অনুসন্ধানে তৎপর হই, যিনি অনুসন্ধান করিয়া ইহা জানিতে পারিবেন, তিনি ইহা দ্বারা সর্ব্বজগৎ ও সর্ব্বকামনা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন"।

'এই রূপ কহিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট হইতে ও বিরোচন অসুরগণের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং পরস্পর পরস্পবের সহিত কোন রূপ আলাপ না করিয়া, গুরুসমীপে উপনীত হইবার প্রথা অনুসারে সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন"। ২।

'তাঁহারা তথায় ছাত্ররূপে বত্রিশ বৎসর অবস্থিতি করিলে প্রজাপতি

তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি জন্য এখানে অবস্থান করিতেছ ?"

'তাঁহারা বলিলেন, আপনি কহিয়াছেন, "যাহা পাপ হইতে বিমুক্ত, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, যাহা কামনার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই কামনা করে না, যাহা চিন্তার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই চিন্তা করে না, তাহাই আত্মা। এই আত্মা আমাদের অনুসন্ধেয় এবং এই আত্মা উপলব্ধি করিতে আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যিনি অনুসন্ধান কবিয়া ইহা জানিতে পারেন, যিনি সর্ব্বজগৎ ও সর্ব্বকামনা লাভ করিতে সক্ষম হন, আমরা এই আত্মা লাভ করিবার ইচ্ছায় এখানে অবস্থান করিতেছি" ৩।

'প্রজাপতি কহিলেন "যে পুরুষ চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হন (১), তিনিই আত্মা। আমি তাহাই বলিয়াছি। ইহাই অমর ও অভয় এবং ইহাই ব্রাহ্মণ"।

"তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! যিনি জলে ও দর্পণে দৃষ্ট হন, তিনি কে' ?

'প্রজাপতি উত্তর করিলেন; "তিনি স্বয়ং কেবল এই সকলের মধ্যে দৃষ্ট হন' (২)। ৪।

---

১ টীকাকার যথাযথরূপে,ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি চক্ষে দৃষ্ট হন, যিনি দৃষ্টির যথার্থ কারণ, জ্ঞানীরা চক্ষু নিমীলিত করিয়াও যাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, প্রজাপতি সেই পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারেন নাই। ছাত্রেরা বুঝিয়াছেন, যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আত্মা, যে পুরুষ দেখেন, তিনি নহেন। চক্ষে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইহার অর্থ তাঁহাদেব নিকট চক্ষু-প্রতিফলিত ক্ষুদ্র আকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহারা জল কিংবা দর্পণের মধ্যগত ছায়া আত্মা কিনা, তাহাই প্রজাপতিকে জিজ্ঞাস করেন।

২। প্রজাপতি যে, মিথ্যা বলেন নাই, টীকাকার তাহা সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পুরুষ অর্থে দেহসম্বন্ধীয় "আত্মা" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ছাত্রেরা যে, উহা সামান্য মনুষ্য বা শরীর অর্থে বুঝিয়াছে, তাহা তাঁহার দোষ নয়।

অষ্টম খণ্ড।

'জলপূর্ণ পাত্রে তোমার আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তদ্বিষয়ে যাহা বুঝিতে না পাব, আমায় জিজ্ঞাসা কর।'

'তাঁহারা জল পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তামরা কি দেখিলে"?

'তাঁহারা বলিলেনঃ—"আমরা উভয়েই আত্মার দর্শন লাভ করিলাম। উহা কেশ ও নখ বিশিষ্ট প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হইল"। ১।

'প্রজাপতি কহিলেনঃ—"তোমরা গাত্র ধৌত করিয়া ও বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার জল-পাত্রে দৃষ্টিপাত কব।"

'তাহারা গাত্র ধৌত করিয়া উত্তম বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক পুনরায় জল-পাত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।'

'প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা কি দেখিতেছ"? ২।

'তাঁহারা কহিলেনঃ—"আমরা যেমন বেশভূষায় সজ্জিত ও যেমন ধৌত-কলেবর হইয়াছি, আপনাদিগেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, মহাশয়! আমরা উত্তম রূপে অলঙ্কৃত, উত্তম বস্ত্র-পরিহিত ও উত্তম রূপে পরিষ্কৃত রহিয়াছি।"

'প্রজাপতি কহিলেনঃ—"উহাই আত্মা, উহাই অমর ও অভয় এবং উহাই ব্রাহ্মণ।"

'তখন উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন! অনন্তর প্রজাপতি তাহা-দের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহারা আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়া এবং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ না হইয়া, চলিয়া গেল, এক্ষণে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যে কেহ এই উপনিষদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারই মৃত্যু হইবে"।

'এদিকে বিরোচন হৃষ্টচিত্তে অসুরগণের নিকট উপনীত হইয়া তাহা-দিগকে এই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল যে, আত্মা (শরীর)ই কেবল উপাস্য এবং আত্মাই (শরীর) একমাত্র সেবার যোগ্য। যাহারা আত্মার উপাসনা করেন এবং সেবায় তৎপর, হন, তাহারা ইহ ও পর জগৎ, উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন।'

'এজন্য যে ব্যক্তি ভিক্ষা না দেয়, যাহার বিশ্বাস নাই, এবং যে বলি প্রদান না করে, সে অসুর বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু এটী অসুরদিগের উপনিষৎ। তাহারা গন্ধদ্রব্য পুষ্প ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মৃত শরীরের শোভা সম্পাদন করে এবং মনে করে যে, তাহারা এইরূপে পর জগৎ জয় করিতে পারিবে'। ৫।

নবম খণ্ড।

'এ দিকে ইন্দ্র দেবগণসমীপে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলেন, যখন শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা (জল-মধ্যগত ছায়া)ও (১) অলঙ্কৃত হয়, শরীর উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলে আত্মাও উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়, এবং শরীর পরিষ্কৃত হইলে আত্মাও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তখন শরীর অন্ধ হইলে আত্মাও অন্ধ হইবে, শরীর খঞ্জ হইলে আত্মাও খঞ্জ হইবে, শরীর বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও বিকলাঙ্গ হইয়া উঠিবে, শরীরের ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইবে, সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা কিছুই দেখিতেছি না' ১।

"তিনি পুনরায় সমিধ্‌হস্তে প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি কহিলেনঃ—"মঘবন্‌! তুমি সন্তুষ্টহৃদয়ে বিরোচনের সহিত এই কতক্ষণ হইল গিয়াছ, আবার এখন তোমার প্রত্যাগমনের কারণ কি" ?

'ইন্দ্র কহিলেন, যখন শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা (জল-মধ্যগত-ছায়া) অলঙ্কৃত হয়, শরীর উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলে আত্মাও উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, এবং শরীর পরিষ্কৃত হইলে আত্মা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তখন শরীর অন্ধ হইলে আত্মাও অন্ধ হইবে, শরীর খঞ্জ হইলে আত্মাও খঞ্জ হইবে, শরীর বিকল হইলে আত্মাও বিকল হইয়া উঠিবে এবং শরীরের ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইবে; সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্য কারিতা কিছুই দেখিতেছি না।'

১। টীকাকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র ও বিরোচন, উভয়েই প্রজাপতির কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বিরোচন শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আর ইন্দ্র শরীরের ছায়াকে আত্মা ভাবিয়াছিলেন।

'প্রজাপতি উত্তর করিলেম:—"ইন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক, তুমি আর বত্রিশ বৎসর আমার নিকট অবস্থান কর, আমি তোমাকে প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে আরও অনেক শিক্ষা দিব"।

ইন্দ্র আর বত্রিশ বৎসর সেখানে থাকিলে, তৎপরে প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন:—৩।

দশম খণ্ড।

"যিনি স্বপ্নে সুখে সঞ্চরণ করেন তিনিই আত্মা, তিনিই অমর ও অভয় এবং তিনিই ব্রাহ্মণ"।

'তখন ইন্দ্র সন্তুষ্টহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপনীত হইবার পূর্ব্বে আবার তাঁহার সন্দেহ হইল। যদিও এক্ষণে শরীর বিকল হইলে আত্মার বৈকল্য হয় না, শরীর দুষ্ট হইলে আত্মা দুষ্ট হয় না এবং শরীর আহত হইলে আত্মা আহত হয় না, তথাপি আত্মা স্বপ্নাবস্থায় ঠিক যেন আহত ও দূরীকৃত হইতে থাকে, যেন কষ্ট অনুভব করিতে ও অশ্রুপাত করিতে থাকে। সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা দেখি না'। ১।

"ইন্দ্র পুনরায় সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির সমীপে উপনীত হইলে প্রজাপতি কহিলেন:—"ইন্দ্র! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে এখান হইতে গিয়াছে, আবার তোমার প্রত্যাগমনের কারণ কি?"

'ইন্দ্র কহিলেন, "মহাশয়! যদিও এক্ষণে শরীর বিকল হইলে আত্মার বৈকল্য হয় না, শরীর দুষ্ট হইলে আত্মা দুষ্ট হয় না, এবং শরীর আহত হইলে আত্মা আহত হয় না, তথাপি আত্মা স্বপ্নাবস্থায় ঠিক যেন আহত ও দূরীকৃত হইতে থাকে, যেন কষ্ট অনুভব করিতে ও অশ্রুপাত করিতে থাকে। সুতারাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা দেখিতেছি না।"

"প্রজাপতি কহিলেন, "মঘবন্! যাহা কহিলে, সকলই সত্য। আমার নিকট তুমি আরও বত্রিশ বৎসর অবস্থান কর; আমি প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিব।"

ইন্দ্র আর বত্রিশ বৎসর অবস্থান করিলে প্রজাপতি কহিলেন:—৪।

একাদশ খণ্ড।

"যখন মনুষ্য স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হয় এবং স্বপ্ন দেখিতে বিরত থাকে, তখন তাহাই আত্মা, তাহাই অমর ও অভয় এবং তাহাই ব্রহ্মণ।"

'ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবগণসমীপে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আবার তাঁহার সন্দেহ হইল। যিনি আর আপনাকে (আপনার আত্মাকে) 'আমি' বলিয়া জানিতে পারেন না, অথবা বর্ত্তমান কোন বস্তুই জানিতে সমর্থ হন না, তিনিত একবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা দেখিতেছিনা। ১।

'ইন্দ্র পুনরায় সমিধ্‌হস্তে প্রজাপতির সমীপে উপনীত হইলেন। প্রজাপতি তাহাকে কহিলেন, "মঘবন্! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে গিয়াছ, আবার তোমার প্রত্যাগমনের কারণ কি?'

'ইন্দ্র কহিলেন, তিনি এই উপায়ে আপনাকে (আপনার আত্মাকে) আমি' বলিয়া জানিতে পারেন না, অথবা তিনি বর্ত্তমান কোন বস্তুও জানিত সমর্থ হন না। তিনিত একবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। আমি এই উপনিষদের কার্য্য-কারিতা দেখিতেছি না।'

'প্রজাপতি কহিলেনঃ—'ইন্দ্র! তুমি যাহা কহিলে, সকলই সত্য। তোমাকে এবার কেবল প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দিব (১)। তুমি এখানে আর পাঁচ বৎসর অবস্থিতি কর।'

ইন্দ্র আর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে এক শত পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। কথিত আছে, ইন্দ্র ছাত্ররূপে প্রজাপতির নিকট ১০৫ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর প্রজাপতি কহিলেনঃ—

১। শঙ্করের মতে প্রকৃত আত্মা, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

দ্বাদশ খণ্ড।

"মঘবন! এই শরীর নশ্বরও মৃত্যুর অধীন। ইহাতে সেই অমর ও শরীর-বিহীন আত্মা বাস করিয়া থাকেন (১)। এই শরীরেই (এই শরীর আমি, এবং আমি এই শরীর এই ভাবিয়া) আত্মা সুখ দুঃখের অনুভব করেন। যত দিন আত্মা শরীরে থাকে, তত দিন উহা সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যখন শরীর হইতে মুক্ত হয়, (যখন আপনাকে শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে) তখন সুখ দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে পারে না (২)।" ১।

"বায়ু, শরীর-শূন্য। মেঘবিদ্যুৎ ও বজ্রও শরীর শূন্য, হস্তপদাদি-বিহীন। ইহারা যেমন স্বর্গীয় স্থান হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ আলোকের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ আকার ধারণ করে, ২।

"এই নির্ম্মল আত্মাও সেইরূপ শরীর হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ আলোক (৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক নিজ আকার ধারণ করে, এই অবস্থায় তাহাকে 'উত্তম পুরুষ" বলা যায়। এই অবস্থায় তাহা নিজ জন্মস্থান শরীরকে ভুলিয়া গিয়া, স্ত্রীলোকের সহিত, আপনাদের আত্মীয়গণের সহিত হাসিয়া খেলিয়া আমোদ উপভোগ করিতে থাকে (৪)

১। কাহারও মতে শরীর আত্মার পরিণাম মাত্র। ক্ষিতি, অপ্ তেজ আত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, শেষে আত্মা উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে।

২। সাধারণ সাংসারিক সুখ।

৩। প্রাচীন উপমাগুলি যেমন হৃদয়-গ্রাহিণী, উপস্থিত উপমাটী সেরূপ নহে। আত্মার সহিত বায়ুর তুলনা করা হইয়াছে। আত্মা যেমন দেহে থাকে, বায়ুও তেমনি আকাশে থাকে। শেষে উভয়েই মহত্তর আলোকের নিকট উপস্থিত হয়। এক দিকে গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্যালোক, অপর দিকে জ্ঞানালোক।

৪। আত্মা যে সুখ ও শান্তির অধিকারী, এই সকল সুখ তৎসমুদয়ের তুল্য নহে। এই অংশ 'প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। অথবা এরূপ হইতে পারে, আত্মা অভ্যন্তরীণ দর্শক রূপে এই সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। সুখ ও দুঃখের সহিত তাঁহার একত্র থাকে না। তিনি স্বর্গীয় চক্ষু দ্বারা এই সমস্ত দেখিয়া থাকেন। আত্মা এই সকলের মধ্যে আপনার আত্মার অনুভব করেন মাত্র।

'অশ্ব যেমন রথে সংযুত থাকে, সেইরূপ প্রাণ (১) এই শরীরে সংযোজিত রহিয়াছে।' ৩।

"দৃষ্টি যেখানে (চক্ষুতারকায়) প্রবিষ্ট হইয়াছে, চক্ষুর পুরুষ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। চক্ষু স্বয়ং কেবল দর্শনের যন্ত্রমাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনিই আত্মা। নাসিকা কেবল আঘ্রাণ-বোধ-সাধক যন্ত্র মাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা কহিতেছি, তিনিই আত্মা। জিহ্বা কেবল কথা বলিবার যন্ত্র মাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা শুনিতেছি, তিনিই আত্মা। কর্ণ কেবল শ্রবণযন্ত্র মাত্র"। ৪।

"যিনি জানেন, আমি ইহা চিন্তা করিতেছি, তিনিই আত্মা। মন তাঁহার স্বর্গীয় চক্ষুমাত্র (২)। আত্মা তাঁহার এই দিব্য চক্ষুদ্বারা পরমানন্দ (যাহা মৃত্তিকা-প্রোথিত স্বর্ণের ন্যায় অপরের নিকট লুক্কায়িত রহিয়াছে) লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন"।

'দেবগণ এই আত্মার (প্রজাপতি যাহা ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইন্দ্র যাহা দেবগণকে শিখাইয়াছেন) আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত জগৎ ও সুখ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যিনি এই আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং ইহার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সমস্ত জগৎ ও সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছেন"। প্রজাপতি এইরূপ কহিলেন, প্রজাপতি এইরূপ কহিলেন।'

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী।

দ্বিতীয় অংশ বৃহদারণ্যক হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। এই উপনিষদে উক্ত অংশের দুইবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অংশদ্বয়ের বিভিন্নতা অতি সামান্য।

১। দেহের সহিত প্রাণের একত্ব নাই। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত হয়, ইহাও সেইরূপ দেহে সংযুক্ত হয় মাত্র। অথবা সারথি যেমন রথ চালনা করে, ইহাও সেইরূপ দেহ চালনা করিয়া থাকে। অন্যান্যস্থলে ইন্দ্রিয়গণ ঘোটকস্বরূপ, বুদ্ধি সারথিস্বরূপ, মন বল্গাস্বরূপ। চেতনকর্ত্তৃক প্রাণ রথে (দেহে) সংযুক্ত হয়।

২। যেহেতু ইহা কেবল বর্ত্তমান বিষয় অনুভব করে না, ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ও জানিয়া থাকে।

ইহা প্রথমবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়বার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (১)।

'যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই স্ত্রী ছিল (২)। ইহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী বেদের ব্রাহ্মণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কাত্যায়নীর কেবল স্ত্রীজাতি সুলভ জ্ঞান মাত্র ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশকালে মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—"আমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে চলিলাম, অতএব তোমার ও কাত্যয়নীর মধ্যে একটী নিয়ম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি"। ১।

'মৈত্রেয়ী কহিলেনঃ—"স্বামিন্! বলুন দেখি, যদি আমি এই ধনসম্পত্তিপূর্ণ পৃথিবীর অধীশ্বরী হই, তাহা হইলে কি অমর হইতে পারি" (৩)?

'যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেনঃ—"না, তাহা হইলে তোমার জীবন ধনবান লোকদের জীবনের ন্যায় হইবে। ধনদ্বারা অমরত্বের কোন আশা নাই"। ২।

'মৈত্রেয়ী কহিলেনঃ—"যাহাতে অমরত্বের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? স্বামিন্! আপনি অমরত্বের সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমায় বলুন"। (৪)। ৩।

'যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেনঃ—"তুমি আমার প্রিয়তমা, তুমি যথার্থই প্রিয় কথা কহিয়াছ। আইস, এই খানে উপবেশনকর, (৫)। আমি তোমার কথার উত্তর দিতেছি, যাহা কহিতেছি, তাহাতে অবধান কর"। ৪।

'অনন্তর তিনি কহিলেনঃ—"বস্তুতঃ স্বামীকে ভাল বাস বলিয়া স্বামী তোমার প্রিয় নহে। তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই স্বামী তোমার প্রিয়।

১। এই অংশের দ্বিতীয় বার উল্লেখের সময় পাঠের কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। দ্বিতীয় পাঠের মর্ম্ম খ চিহ্নিত করা গেল।

২। এই ভূমিকা কেবল দ্বিতীয় পাঠে আছে।

৩। আমি অমর হইতে পারিব কি না? খ।

৪। আমায় পরিষ্কার করিয়া বলুন। খ।

৫। তুমি আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর, অতএব উপবেশন কর। খ।

"বস্তুতঃ স্ত্রীকে ভাল বাস বলিয়া স্ত্রী তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই স্ত্রী তোমার প্রিয়।

"বস্তুতঃ পুত্রগণকে ভাল বাস বলিয়া, পুত্রগণ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই পুত্রগণ তোমার প্রিয়।

"বস্তুতঃ ধনসম্পত্তি ভাল বাস বলিয়া ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয় (১)।

"বস্তুতঃ ব্রাহ্মণজাতিকে ভাল বাস বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ব্রাহ্মণ জাতি তোমার প্রিয়।

"বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় জাতিকে ভাল বাস বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ক্ষত্রিয় জাতি তোমার প্রিয়।

"বস্তুত জগৎকে ভাল বাস বলিয়া জগৎ তোমার প্রিয়নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই জগৎ তোমার প্রিয়।

বস্তুতঃ দেবগণকে ভাল বাস বলিয়া দেবগণ তোমার প্রিয় নহেন, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই দেবগণ তোমার প্রিয় (২)।

"বস্তুতঃ প্রাণিগণকে ভাল বাস বলিয়া প্রাণিগণ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস তজ্জন্যই প্রাণিগণ তোমার প্রিয়।

'বস্তুতঃ সমস্ত বিষয় ভাল বাস বলিয়া সমস্ত বিষয় তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই সমস্ত বিষয় তোমার প্রিয়।

"হে মৈত্রেয়ি! বস্তুতঃ আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করা হয়। যখন আমরা আত্মাকে দর্শন করি, শ্রবণ করি, অনুভব করি ও জানি (৩), তখন এই সমস্ত আমাদের বিদিত হয়। ৫।

"যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র ব্রাহ্মণ জাতির অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ-জাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র ক্ষত্রিয় জাতির অন্বেষণ করিবেন, তিনি ক্ষত্রিয় জাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা

১। ইহার পর ঋতে উল্লেখ আছে "বস্তুতঃ গবাদি গৃহপালিত পশুকে ভাল বাস বলিয়া," ইত্যাদি।

২। ঋতে উল্লেখ আছে, "বস্তুতঃ বেদকে ভাল বাস বলিয়া" ইত্যাদি।

৩। যখন আত্মা দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয়, অনুভূত হয়, এবং পরিজ্ঞাত হয়। ঋ।

ভিন্ন অন্যত্র জগৎ অন্বেষণ করিবেন, তিনি জগৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র দেবগণের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন (১)। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র প্রাণিগণের অন্বেষণ করিবেন, তিনি প্রাণিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র সমস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সমস্ত বিষয়কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই জগৎ, এই দেবগণ (২) এই প্রাণিগণ এবং এই সমস্তই আত্মা"। ৬।

"যেমন বাদ্যমান ঢক্কা বা উহার বাদনকারীকে না ধরিলে বাদ্যমান ঢক্কার শব্দ ধরা যাইতে পারে না; ৭।

"যেমন শব্দায়মান শঙ্খ বা উহার ধ্বনি-কারককে না ধরিলে শঙ্খের ধ্বনি ধরা যাইতে পারে না"; ৮।

"যেমন বংশী বা বংশি-বাদকে না ধরিলে বশিং-ধ্বনি ধরা যায় না"; ৯।

"যেমন আর্দ্র কাষ্ঠের অগ্নি শিখা হইতে ধূমস্তূপ আপনা আপনিই উদ্গত হইতে থাকে; হে মৈত্রেয়ি! সেইরূপ এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনু-ব্যাখ্যা ও ব্যাখান প্রভৃতি সমস্তই (৩) প্রসৃত হইয়াছে। ১০।

"যেমন সকল সরিৎই সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, যেমন ত্বকে স্পর্শ, জিহ্বায় আস্বাদ, নাসিকায় ঘ্রাণ, চক্ষুতে বর্ণ, কর্ণে শব্দ, হস্তে কার্য্য, মনে অনুভূতি, হৃদয়ে জ্ঞান, পদে সঞ্চরণ এবং ভাষায় বেদাদি—১১।

"যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে উহা জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং আর তুলিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু স্বাদ লইলে লবণের আস্বাদন পাওয়া যায়, হে মৈত্রেয়ি! সেইরূপ অনন্ত, অসীম ও জ্ঞানময় (৪) পরমাত্মা এই

১। শ্রুতে উল্লেখ আছে, যিনি আত্মাভিন্ন অন্যত্র বেদের, ইত্যাদি।

২। এই বেদ। শ্র।

৩। শ্রুতে উল্লেখ আছে, যজ্ঞ, উপহার, খাদ্য, পানীয়, ইহ জগৎ ও পর জগৎ এবং সমস্ত প্রাণী।

৪। যেমন ঘনীভূত ও বিশুদ্ধ লবণ স্বাদভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ হে প্রিয়তমে! সংহত, বিশুদ্ধ ও সমস্ত আত্মা জ্ঞানভিন্ন কিছুই নহে। শ্র।

সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হন, এবং এই সকল ভূতেই আবার অন্তর্হিত হইয়া যান। হে মৈত্রেয়ি! তাঁহার অন্তর্ধানের পর আর কোন জ্ঞান থাকে না"। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কহিলেন'। ১২।

'তখন মৈত্রেয়ি বলিলেনঃ—"স্বামিন্! আপনি "অন্তর্ধানের পর কোনও জ্ঞান থাকে না" বলিয়া আমায় বড় গোলযোগে ফেলিলেন" (১)।

'যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেনঃ—"হে মৈত্রেয়ি! আমি বোধের অতীত কিছুই তোমাকে বলি নাই; প্রিয়তমে! জ্ঞানার্থে ইহাই যথেষ্ট" (২)। ১৩।

"যখন দ্বৈতভাব থাকে, তখন একে অপরকে দেখিতে পায়, একে অপরের আঘ্রাণ পায়, একে অপরকে শ্রবণ করে (৩), একে অপরকে অভিবাদন করে (৪), একে অপবকে অনুভব করে (৫) এবং একে অপরকে জানে; কিন্তু যখন আত্মাই এই সকল, তখন কিরূপে তাহা অপরকে আঘ্রাণ করিবে (৬), কিরূপে অপরকে (৭) দেখিবে (৮), কিরূপে অপরকে শ্রবণ করিবে (৯), কিরূপে অপরকে অভিবাদন করিবে (১০), কিরূপে অপরকে অনুভব করিবে (১১) এবং কিরূপে অপরকে জানিবে? যিনি আপনা দ্বারা

১। 'আমাকে গোলযোগে আনিয়া ফেলিলেন, আমি আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না'। খ।

২। প্রিয়তমে! আত্মা অক্ষয়, এবং ধ্বংসাতীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। খ।

৩। একে অপরকে আস্বাদন করে। খ।

৪। একে অপরকে শ্রবণ করে। খ।

৫। একে অপরকে স্পর্শ করে। খ।

৬। খ দেখ।

৭। খ এর পাঠ, স্পর্শ করিবে।

৮। আস্বাদন করিবে।

৯। অভিবাদন।

১০। শ্রবণ।

১১। খ এর পাঠ, 'কিরূপে অপরকে স্পর্শ করিবে?'

এই সকল] জানিতেছেন, তিনি কিরূপে আপনাকে জানিবেন? হে প্রিয়তমে! কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ আপনাকে জানিবেন (১)?"

যম ও নচিকেতা।

উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষৎ অতি প্রসিদ্ধ। স্বদেশ-হিতৈষী—অধিক কি সমস্ত মানবজাতির পরমহিতাকাঙ্ক্ষী স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই উপনিষৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে প্রকাশ করেন। তদবধি ইহা বারংবার ভাষান্তরিত ও সমালোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও দার্শনিক ভাবের উন্নতির আলোচনায় আমোদিত হন, তাঁহাদের ধীরতার সহিত এই উপনিষৎ পাঠ করা উচিত। এই উপনিষদে যখন আধুনিক বিষয়ের সমাবেশ আছে, তখন ইহা যে, ইহার আদিম অবস্থায় রহিয়াছে, এমন বোধ হয় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩য়, ১১, ৮) যে উপাখ্যান কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই উপাখ্যান দেখা যায়; কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে কোন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, আর উপনিষদের মতে কেবল জ্ঞান দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।

এই উপনিষদে যম ও নচিকেতা নামে একটী বালকের কথোপকথন আছে। নচিকেতার পিতা সর্ব্বযাগ করিয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার পুত্র পিতার অঙ্গীকার শুনিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি আপনার অঙ্গীকার অবাধে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কি না, পিতা প্রথমে উত্তর দানে বিলম্ব করিতে

১। এই শেষোক্ত পংক্তির স্থলে শ্রুতে (৪র্থ,৫, ১৫) এইরূপ উল্লেখ আছে;—'আত্মা "কিছুই না" ইহা আয়ত্তের অতীত, যেহেতু ইহা আয়ত্ত করা যায় না; ধ্বংসের অতীত, যেহেতু ইহা ধ্বংস হয় না; ইহা স্পর্শের অতীত, যেহেতু ইহা স্পর্শ করা যায় না; ইহা কম্পিত হয় না, ইহা অকৃতকার্য্য হয় না। হে প্রিয়তমে! কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ—আপনাকে জানিবেন? হে মৈত্রেয়ি, তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিলাম। অমরত্ব এইরূপ,"। ইহা কহিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বনে গমন করিলেন।'

লাগিলেন, পরে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন:—"হাঁ! তোমাকেও মৃত্যু মুখে দিব"।

পিতা যখন এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহাকে অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য পুত্রকে মৃত্যুর নিকট বলিদান করিতে বাধ্য হইতে হইল। পিতাকে এই কঠোর অঙ্গীকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রও মৃত্যু-সদনে যাইতে ইচ্ছা করিল।

পুত্র কহিল—'যাহারা অতঃপর মৃত্যু মুখে পাতিত হইবে, আমি তাহাদের অগ্রে এবং যাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে চলিলাম, যমের যাহা কর্ত্তব্য, অদ্য তিনি আমার প্রতি তাহাই করিবেন।

'ফিরিয়া দেখুন, যাহারা পূর্ব্বে আসিয়াছে, তাহাদেরই বা কি হইয়াছে, এবং সম্মুখে দেখুন, যাহারা পরে আসিতেছে, তাহাবাই বা কি হইবে। নশ্বর মানব শস্যের ন্যায় জীর্ণ হয় এবং শস্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।"

নচিকেতা যখন যম-ভবনে প্রবেশ করিল, যম তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার নূতন অতিথি—নচিকেতাকে যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার ব্যতিরেকে তিন দিন অতিবাহিত করিতে হইল।

সেই অনাদরের পরিপূরণ জন্য, যম প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে তিনটী বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

নচিকেতা প্রথম এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা যেন তাঁহার উপর আর ক্রুদ্ধ না হন (১)।

দ্বিতীয়বর এই, যম যেন তাঁহাকে কোন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দেন (২)।

ইহার পর তৃতীয় বর প্রার্থনার সময় উপস্থিত হইল।

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, তাহার প্রথম বর এইরূপ ছিল যে, সে যেন জীবিত অবস্থায় পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে পারে।

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে তাহার দ্বিতীয় বব এই যে, তাহার সৎকার্য্য যেন বিনষ্ট না হয়, ইহাতে যম তাহাকে একটী বিশেষ যজ্ঞেব কথা বলেন, এই যজ্ঞ তাহার নামানুসারে নচিকতা নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

নচিকেতা কহিল (১) "মনুষ্যের মৃত্যু হইলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি আছেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি নাই; আপনার কাছে এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। এই আমার তৃতীয় বর" ২০।

'যম উত্তর করিলেন:—"পূর্ব্বে দেবতাদেরও এবিষয়ে সংশয় ছিল। ইহা জানা বড় সহজ নহে। এই বিষয়টী অতি দুরূহ। হে নচিকেত! অন্য কোন বর-প্রার্থনা কর; আমাকে আর এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিও না, এই বর প্রার্থনা পরিত্যাগ কর"। ২১।

"মানবের পক্ষে যে সকল অভিলাষ সিদ্ধ করা দুর্ঘট, তোমার ইচ্ছানুসারে তদনুরূপ কোন অভিলাষ-সিদ্ধির বিষয় প্রার্থনা কর। পরমসুন্দরী বিদ্যাধরীগণ তাহাদের রথ ও বীণা লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, নশ্বর মানব ইহাদিগকে লাভ করিতে পারে না। আমি ইহাদিগকে তোমায় দিলাম। কিন্তু মৃত্যুর সম্বন্ধে আমার নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না"।

'নচিকেতা কহিল:—"ইহারা অচির-স্থায়ী, আজ আছে, কা'ল নাই। হে মৃত্যু! ইহারা ইন্দ্রিগণের শক্তি ক্ষয় করে। একেত মানবের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। অশ্ব ও নৃত্যগীতাদি তোমার জন্যই থাকুক। কেহই ধন-সম্পত্তিতে সুখী হইতে পারে না। হে মৃত্যু! আমরা যখন তোমার সম্মুখীন হইব, তখন কি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ধনসম্পত্তির অধিকারী থাকিব? হে মৃত্যু! যাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাই বলুন। নচিকেতা এই বর ভিন্ন আর কোন বর চাহে না"। ২৯।

পরিশেষে যম নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে তাঁহার আত্মজ্ঞানের পরিচয় দিতে সম্মত হইলেন।

তিনি কহিলেন—"নির্ব্বোধেরা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকিয়া আপনাদের চক্ষে আপনাদিগকে জ্ঞানী দেখে এবং বৃথা জ্ঞানে স্ফীত হইয়া অন্ধকর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়"। ২য়, ৫।

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, তাহার তৃতীয় বর—কিরূপে মৃত্যুকে জয় করিতে হয়, তাহা যেন যম তাহাকে বলেন। ইহাতে যম তাহাকে পুনর্ব্বার নচিকেতা যজ্ঞের কথা কহেন।

"অবোধ বা অসাবধান শিশু ধন-মদে মত্ত হইয়া ভবিষ্যতের প্রতি অন্ধ থাকে। সে মনে করে, এই জগৎ ব্যতীত অন্য জগৎ নাই। এইরূপে সে পুনঃপুনঃ আমার অধীন হইয়া থাকে"। ৬।

"যে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মচিন্তা দ্বারা পুরাতনকে—যিনি দুর্লক্ষ্য, যিনি অন্ধকারে লুক্কায়িত, যিনি গুহায় বিলীন, যিনি অন্ধকারাবৃত গভীর রন্ধ্রবাসী—ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই সুখ দুঃখকে পশ্চাতে ফেলিয়া থাকেন।" ১২।

"জ্ঞানী আত্মার জন্ম ও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কিছুই হইতে আইসে না এবং কিছুই হয় না। ইহা পুরাতন ও অজাত। শরীরের ধ্বংস হইলেও ইহার ধ্বংস হয় না।" ১৮।

"আত্মা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। মহৎ হইতেও মহত্তর; ইহা প্রাণী-হৃদয়ে লুক্কায়িত। যে ব্যক্তি কামনা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিধাতার কৃপায় আত্মার মহত্ব দেখিযা থাকেন।" ২০।

"তিনি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেও দূরে সঞ্চরণ করেন, শয়ান হইয়াও সমুদয় স্থলে গিয়া থাকেন। আমি ভিন্ন কে সেই ঈশ্বরকে চিনিতে সক্ষম, যিনি পূর্ণানন্দ ও অপূর্ণানন্দ উভয়ই।" ২১।

"বেদ দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারা আত্মলাভ হয় না। আত্মা যাঁহাকে মনোনীত করেন, তিনিই আত্মলাভে কৃতকার্য্য হন। আত্মা তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন।" ২৩।

"কিন্তু যে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, যে স্থির ও বশীভূত হয় নাই, যাহার মনের স্থিরতা নাই, সে জ্ঞান দ্বারাও আত্ম-লাভে সমর্থ হয় না।" ২৪।

"কোন মানবই ঊর্দ্ধাধোগামী শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবিত থাকে না। আমরা আর কিছু দ্বারা জীবিত রহিয়াছি, যাহাতে এই দুইটীই একত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।" ৫ম, ৫।

"আমি তোমাকে এই সকল গূঢ় রহস্য——অনন্ত ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি, এবং মৃত্যুব পর আত্মার কি ঘটে, তাহাও বলিতেছি।" ৬।

"কেহ কেহ জীবন্ত প্রাণী রূপে আবার জন্ম গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ

তাহাদের কর্ম্মানুসারে এবং তাহাদের জ্ঞানানুসারে প্রস্তরাদিতে প্রবেশ করে।" ৭।

"আমরা নিদ্রিত হইলেও যে প্রধান পুরুষ আমাদের মধ্যে জাগিয়া থাকেন, যিনি এক সুদৃশ্যের পর অপর সুদৃশ্য সংগঠিত করেন, তিনিই উজ্জ্বল বলিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া ও অবিনশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার উপর স্থাপিত রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করে না।" ৮।

"অগ্নি যেমন এক হইলেও বিভিন্ন সামগ্রী দাহন করাতে বিভিন্ন হয়, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মা বস্তুবিশেষে প্রবেশভেদে বিভিন্ন হইয়াছেন এবং পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করিতেছেন"। ৯।

"জগৎচক্ষু সূর্য্য যেমন মালিন্য-দোষ-দুষ্ট চর্ম্ম চক্ষুতে দৃষ্ট হইলে মলিন হন না, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মা জগৎ হইতে পৃথক হওয়ায় জগতের শোকদুঃখে আক্রান্ত হন না"। ১১।

"কেবল একমাত্র নিত্য ভাবুক আছেন, তিনি অনিত্যভাবই ভাবিতেছেন; তিনি একক হইলেও অনেকের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। যে সকল জ্ঞানী জীবাত্মার মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনন্ত শান্তির অধিকারী হইয়াছেন।"

"সমস্ত জগতের যে কিছুই হউক, একবার ব্রাহ্মণ হইতে বিচ্যুত হইলে সেই ব্রাহ্মণের শ্বাসেই উহারা কম্পিত হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ নিষ্কোশিত অসির ন্যায় তাঁহাদের অতিশয় ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন"। ৬ষ্ঠ, ২।

"তাঁহাকে (ব্রাহ্মণকে) বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আস্তিক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার ধারণা করিতে পারে না"। ১২।

"যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়, তখন নশ্বর অবিনশ্বর হন এবং ব্রাহ্মণ লাভ করেন"। ১৪।

"ইহ জগতে যখন হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, তখনই মরণশীল অমর হন—এই খানে আমার উপদেশ সমাপ্ত হইল"। ১৫।

উপনিষদের ধর্ম্ম।

অনেকে উপনিষদের উপদেশ গুলিকে সম্ভবতঃ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিবেন না। যথারীতি সজ্জিত না হইলেও এই সমুদয় উপদেশ তাঁহাদের নিকট দর্শনশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা ভাষার যে, কেমন দাস হইয়া চলি, তাহা ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র, এই উভয়ের মধ্যে একটী প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে। বিষয় ও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে এই প্রভেদ-কল্পনার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, যে সমস্ত বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব আছে, সেই সেই বিষয়ের সহিত দর্শনশাস্ত্রেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে, অধিক কি তৎসমুদয় হইতে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তিও হইয়াছে।

ধর্ম্ম যদি তাহার জীবনী শক্তির জন্য অন্তবানের মধ্যে এবং বাহিরে অনন্তের অনুভূতির অপেক্ষা করে, তাহা হইলে দর্শনবেত্তা ভিন্ন আর কে এই অনুভূতিব বৈধতানির্ণয়ে সক্ষম হইবেন? মনুষ্য যে ক্ষমতায় আপনাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ বিষয় পরিগ্রহ করেন, এবং যুক্তি দ্বারা সেই সীমাবদ্ধ ভাব কল্পনায় পরিণত করিয়া তুলেন, দর্শনবেত্তা ভিন্ন আর কে সেই ক্ষমতা নির্ণয় করিবেন? ইন্দ্রিয় ও যুক্তি, এই উভয়ে বিরোধী হইলেও মনুষ্যের যে, অনন্তেব অস্তিত্ব স্বীকারের অধিকার রহিয়াছে, দর্শনবেত্তা ভিন্ন এ কথা আর কে বলিবে? আমরা যদি দর্শন শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করি, তাহা হইলে ধর্ম্ম পতিত হইবে, আমরা যদি ধর্ম্ম হইতে দর্শনশাস্ত্র বিযুক্ত করি, তাহা হইলে দর্শন বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

প্রাচীণ ব্রাহ্মণগণ সাত্বিক ও বৈষয়িক গ্রন্থের নির্ব্বাচন-বিষয়ে এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল যে, পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রচারিত এই মতের সমর্থনবিষয়ে আমাদের অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ অপেক্ষাও সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষদকে তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে বিমুখ হন নাই। উপনিষৎ তাঁহাদের স্মৃতি, তাঁহাদের মহাকাব্য ও তাঁহাদের আধুনিক পুরাণের শ্রেণীভুক্ত না হইয়া শ্রুতি-

ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্রকে স্তোত্র ও হোমাদির ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করিতেন।

একমত অন্য মতের বিরোধী হইলেও উপনিষদে যাহার উল্লেখ আছে, তাহা সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মূল বিষয়সম্বন্ধে যে সকল আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ আছে, তৎসমুদয় আপন আপন মত সমর্থন জন্য উপনিষদের কোন না কোন অংশের আশ্রয় লইয়াছে।

বৈদিক ধর্ম্মের পরিপুষ্টি।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের পরিণাম সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিশেষ ধীরতার সহিত আলোচনা করা উচিত হইতেছে।

সংহিতা যে, কালক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন এই সংহিতাতেই দেখা যায়। যদিও পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, এই সকল চিন্তার ক্রমোন্নতির সময় নিরূপণের চেষ্টা অনাবশ্যক, তথাপি উক্ত প্রস্তাবসমূহে আমি এই ক্রমোন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করিতে ক্রটী করি নাই। সময় বিশেষে যে, প্রখর ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে যে, সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ হন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বার্‌ক্লি যে, ধর্ম্মনিষ্ঠ কবি ওয়াট্‌সের সমকালিক হইয়াও সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন হিন্দু দর্শনবেত্তাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইব না।

প্রাচীন বৈদিক কালের সমালোচনার পর আমরা এমন বলিতে পারি যে, অদিতির স্তোত্র অপেক্ষা উষা ও সূর্য্যের স্তোত্র প্রাচীন এবং অদিতির স্তোত্র আবার প্রজাপতির স্তোত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। কবি যে কবিতায় "স্বয়ং শ্বাসহীন হইলে ও একমাত্র শ্বাসবান্," প্রভৃতি কথা বলিতেছেন, তাহা যে, আবার এই সকলের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও আমাদের অনুচিত হয় না।

বেদের স্তোত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে উহার ক্রমোৎকর্ষ সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। সময়নির্ণায়ক তালিকার আলোচনা অপেক্ষা এই ক্রমোৎকর্ষের আলোচনা করাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ। অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্ত স্তোত্রই সংহিতা শেষ হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। খ্রিষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সংহিতা শেষ হইয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয়, কেহই প্রতিবাদ করিবেন না।

ব্রাহ্মণ-রচনার পূর্ব্বে সংহিতার রচনা শেষ হইয়াছে। স্তোত্র ও ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা যথাবিধি প্রাচীন যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভে সমর্থ হইবেন। যে যে দেবতার উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের অধিকাংশই স্তোত্রে প্রশংসিত হইয়াছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ দেবত্বের সূক্ষ্ম কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছেন।

ইহার পর আরণ্যক। ব্রাহ্মণের শেষে থাকাতেই ইহা আধুনিক নয়, ইহার প্রকৃতি দেখিলেও ইহাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মণ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূত্রে যাগযজ্ঞের যেরূপ আড়ম্বর বর্ণিত আছে, সেইরূপ আড়ম্বর ব্যতিরেকে কেবল মানসিক চেষ্টা দ্বারা কিরূপে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, তাহা প্রদর্শন করাই আরণ্যকের প্রধান উদ্দেশ্য। যাজ্ঞিক মনে মনে যজ্ঞটী ভাবিবেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় মনে মনে অনুশীলন করিবেন। এইরূপ করিলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, তাঁহারও সেই ফল লাভ হইবে।

সর্ব্ব শেষে উপনিষৎ। এই উপনিষদের উদ্দেশ্য কি? কর্ম্মকাণ্ডের অসার্থকতা ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন, পরিণামে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ের উপর দোষারোপকরণ, দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও তাঁহাদের উচ্চ ও গর্ব্বিত প্রকৃতি অস্বীকারকরণ এবং প্রকৃত ও বিশ্বজনীন আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে, মুক্তিলাভ অসম্ভব, যেথানে শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই স্থান ব্যতীত যে, শান্তি লাভ দুর্ঘট, তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানই উপনিষদের প্রধান্য উদ্দেশ্য।

কিরূপে এই চিন্তার প্রবাহ সমাগত হইয়াছে, কিরূপে একটী আর একটীর অনুসরণ করিয়াছে, এবং যাঁহারা তৎসমুদয় বিকাশ করিয়াছেন, কিরূপেই বা তাঁহারা কেবল সত্যের প্রেমে প্রেমিক হইয়া, সত্য লাভ মানসে মানব-সাধ্য চেষ্টার একশেষ করিয়াছেন, তাহাই এই কয়েকটী প্রস্তাবে আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে অনেক যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, আপনারাও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এপ্রকার পরস্পরবিসংবাদিত ও বিবিধ মতসম্বলিত ধর্ম্ম কিরূপে সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল ? যাঁহারা দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং যাঁহারা উহা স্বীকার করিতেন না, যাঁহারা যাগযজ্ঞে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন, যাঁহারা উহা ভণ্ডামি মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহারা কিরূপে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক হইয়া একত্র বাস করিতেন? কিরূপে পরস্পরের মত-বিরোধী গ্রন্থাবলী অভ্রান্ত, পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রদত্ত বলিয়া পরিগণিত হইত ?

যেখানে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন দেখা যায়, সেখানে সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল, কালসহকারে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে এখনও ঠিক এইরূপ আছে। চেষ্টা করিয়া ইহা বুঝিলে আমাদের জ্ঞানলাভ হইলেও হইতে পারে।

চারি জাতি।

ভারতের প্রাচীন ভাষা ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে সকলে এইরূপ উল্লেখ করিতেন যে, ইহাঁরা একদল পুরোহিতমাত্র। ইহারা ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া অন্যান্য জাতিকে আপনাদের অধিগত পবিত্র জ্ঞানে বঞ্চিত রাখেন। এইরূপে মূর্খ লোকদিগের উপর ইহারা আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার পর এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। চারি জাতি মধ্যে কেবল শূদ্রেরাই বেদ পাঠ করিতে পারিত না। কিন্তু বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বেদালোচনা অকর্ত্তব্য না হইয়া বরং অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে

পরিগণিত ছিল। সকলেরই বেদপাঠে অধিকার ছিল, কেবল ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যাপনার অধিকারী ছিলেন।

ব্রাহ্মণদের কখনও এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, নীচ বর্ণ কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করুক, আর আমরা কেবল উপনিষৎ লইয়াই থাকি। প্রত্যুত এরূপ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, উপনিষৎ প্রথম বর্ণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই, দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এখন জাতিভেদ-প্রণালীতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, বৈদিক কালে সে রকম জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। বেদে যেরূপ জাতিভেদ-প্রথা দেখা যায়, মনুর জাতিভেদ-প্রথা হইতে তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন, বর্ত্ত-মান সময়ের প্রথার সহিত উহার আরও অধিক প্রভেদ দেখাযায়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে প্রথমতঃ আর্য্য ও শূদ্র, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন শ্রেণী লইয়া আর্য্য-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছিল। এই তিন জাতির যে যে কার্য্য, কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল, অন্যান্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির করণীয়ের সহিত তৎসমুদয়ের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

চারি আশ্রম।

চারিজাতি অপেক্ষা চারি আশ্রম বৈদিক সমাজের একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে চারিটী (১), ক্ষত্রিয়কে তিনটী, বৈশ্যকে একটী এবং শূদ্রকে ঐ চারিটীর কোন একটী যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিমাত্রেরই শৈশবা-বস্থা হইতে সমস্ত জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারিত ছিল। মানব-স্বভাব সহজে কোন নিয়মের বশীভূত না হইলেও এই নির্দ্ধারিত নিয়-মানুসারে যে, অধিকাংশ কার্য্য হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন

১। আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

কারণ নাই। যখন কোন আর্য্যের সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তখন হইতেই এমন কি তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তদীয় পিতা মাতাকে নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এই সকল সংস্কার না হইলে ভূমিষ্ঠ সন্তান সমাজের অর্থাৎ আপনাদের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিধি-সিদ্ধ লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। পঞ্চবিংশ কথন কথন তদপেক্ষাও অধিক সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। কেবল শূদ্রগণ এই সংস্কারের অধিকারী ছিল না (১)। পক্ষান্তরে আর্য্যেরা এই সকল সংস্কারের অনুষ্ঠান না করিলে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না।

প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য।

আর্য্য সন্তানের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকের সপ্তম বৎসর হইতে একাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রথম আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে (২)। তখন তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ গৃহ হইতে গুরু-সন্নিধানে গমন করিতে হয়। একটী বা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বেদের নাম ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি ব্রহ্মচারী অর্থাৎ বেদ-শিষ্য বলিয়া উক্ত হন। বেদ পাঠ করিতে ন্যূনকল্পে বার বৎসর ও ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আটচল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইত (৩)। গুরু-গৃহে বাস-কালে তরুণবয়স্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। তিনি প্রতি দিন দুই বার অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত-সময়ে সন্ধ্যো-

---

১। যম লিখিত নিয়মানুসারে শূদ্রের উপনয়ন পর্য্যন্ত হইতে পারিত। কিন্তু শূদ্র বেদপাঠের অধিকারী ছিল না।

২। আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি, ১০১ পৃষ্ঠা। আপস্তম্বসূত্র, ১ম, ১, ১৮, ব্রাহ্মণ বসন্তকালে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে, বৈশ্য শরৎকালে উপনীত হইবে। ব্রাহ্মণ অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয় একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্য দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইবে।

৩। আপস্তম্ব সূত্র, ১ম, ২, ১২, উপনীত ছাত্রকে গুরুগৃহে ৪৮বৎসর (যদি সমস্ত বেদ পাঠ করিতে হয়), ৩৬বৎসর, ২৪বৎসর এবং ১৮বৎসর থাকিতে হইবে। ন্যূনকল্পে ১২বৎসর না থাকিলে হইবে না।

পাসনা করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তিনি এই ভিক্ষা-লব্ধ সমস্ত সামগ্রীই গুরুর হস্তে আনিয়া দিবেন। গুরু যাহা খাইতে দেন, তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পাইবেন না। তাঁহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ্ আহরণ, হোমস্থান পরিষ্কারকরণ এবং দিবা রাত্রি গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইবে। এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে গুরু তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিবেন। এই বেদ যাহাতে কণ্ঠস্থ হয় এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে পারেন, গুরু তাঁহাকে তদ্বিষয়ের উপযোগী শিক্ষা দিতে ক্রটী করিবেন না। তিনি উপাধ্যায়ের নিকটেও অতিরিক্ত পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল গুরু বা আচার্য্যের নিকটেই তাঁহার উপনয়ন হইবে (১)।

পাঠাবসানে সমুচিত গুরু-দক্ষিণা দিয়া ছাত্র যখন পিতৃ-গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি "স্নাতক" (২) বা "সমাবৃত" নামে উক্ত হন। আমরা এই অবস্থায় বলিয়া থাকি, ছাত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা বিবাহ না করিয়া চিরজীবন গুরু-গৃহে বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পাঠাবসানে একবারেই সন্ন্যাসী হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে আর্য্য যুবককে উনিশ বা বাইশ (৩) বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হয় (৪)।

১। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রে ইহার সবিস্তর বিবরণ পাওয়া যাইবে।

২। ছাত্র যে সময়ের মধ্যে গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হন, কেবল সেই সময়ে তাঁহাকে "স্নাতক", বলা যায় না, প্রত্যুত তিনি আজীবন এই নামের অধিকারী থাকেন।—"আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি," ১৩১ পৃষ্ঠা।

৩। ছাত্র সপ্তম বর্ষে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন; অন্ততঃ বার বৎসর তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়; ইহার পর কাহারও কাহারও মতে মহানাম্নী ও অন্যান্য ব্রত পাঠে আর তিন বৎসর যায়। অশ্বালায়ন গৃহ্য সূত্র, ১ম, ২২,৩, দেখ।

৪। মনুর মতে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোকের ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত; কিন্তু নিয়মানুসারে পুরুষ ২৪ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোক ৮ বৎসর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় আশ্রম, গার্হস্থ্য।

দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে তিনি গৃহস্থ বা গৃহমেধী বলিয়া উক্ত হন। এই সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়। স্ত্রী মনোনীতকরণ ও বিবাহের সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, এ সময়ে ধর্ম্মানুশীলনই তাঁহার পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। এ সময়ে তিনি বৈদিক স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীত হইয়াছে; এই পবিত্র গ্রন্থের নিয়মানুসারে তিনি সমুদয় যাগ যজ্ঞে অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কোন কোন আরণ্যক ও উপনিষৎও (১) অভ্যাস করিয়াছেন। যদি তিনি এই পবিত্র গ্রন্থ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণ প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় আশ্রম তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রম অতিক্রম না করিলে কেহই এই উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। এইটীই গৃহস্থাশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহার অন্যথাও ঘটিত (২)। পরিণীত হইলে গৃহস্থকে নিম্নলিখিত পাঁচটী ব্রত পালন করিতে হইত:—

(১) বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন।
(২) পিতৃলোকের তর্পণ।
(৩) দেবলোকের তর্পণ।
(৪) জীবের আহার দান।
(৫) অতিথি সৎকার।

গৃহ্য সূত্রে গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্য যেরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা

১। আপস্তম্বসূত্র, ১১শ, ২, ৫; ১।

২। বেদান্ত সূত্রে—(৩য়, ৪) চারি আশ্রমের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এসম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ,'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। ইহার পর উল্লেখ আছে, "যদি বেতরথা ব্রহ্মচার্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"

অধিকতর সম্পূর্ণ ও অধিকতর সুন্দর নিয়ম আর হইতে পারে না। ইহা কাল্পনিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কাল্পনিক হইলেও এরূপ নিয়ম আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন ভারতবাসিদের এইরূপ একটী ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই ঋণগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তিনি ঋষিগণের নিকট ঋণী, দ্বিতীয়তঃ দেবগণের সমক্ষে ঋণী, তৃতীয়তঃ পিতৃলোকের নিকট ঋণী (১)। ছাত্ররূপে সাবধানে বেদ অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঋষিগণের ঋণ পরিশোধ করেন। গৃহস্থ হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে দেবতাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। ইহাব পর তিনি পিতৃলোকের তর্পণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতামাতার ঋণ হইতে মুক্ত হন।

এই তিন ঋণ পরিশোধ হইলে মানব ইহ জগতের বন্ধন-মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন।

ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যমাত্রেই এই সমস্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত ক্ষমতা থাকিলে তিনি অন্যান্য যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি দৈনিক ও কতকগুলি পাক্ষিক যজ্ঞ। অপর-গুলিব সহিত তিন ঋতু, শস্য-সংগ্রহের সময়, এবং অৰ্দ্ধ বর্ষ ও পূর্ণ বর্ষের সংশ্রব দেখা যায়। এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে পুরোহিতগণের সহায়তা গ্রহণ কবিতে হইত। অনেক সময়ে এই সকল যজ্ঞ বহুব্যয়-সাধ্য হইয়া উঠিত। পুরোহিতগণ কেবল আর্য্যগণের মঙ্গলার্থেই এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়েই, ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞ-সম্পাদনের অধি-কারী ছিলেন, ইহাতে যে পুণ্য ছিল, তাহাও ব্রাহ্মণেরা লাভ করিতেন। অশ্বমেধ ও রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণেব মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হইত।

১। মনু ৬ষ্ঠ, ৩৫, "যখন মনুষ্য ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি মোক্ষ-লাভে মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু এই সকল ঋণ পরিশোধ না কবিয়া মুক্তির অন্বেষণ করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হইবে। যথানিয়মে বেদাধ্যয়নের পব তিনি পুত্রোৎ-পাদন ও সাধ্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান কবিবেন। অতঃপর তাঁহাকে নিত্য-সুখে মনোনিবেশ করিতে হইবে"।

শূদ্রেরা আদৌ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের অধিকারী ছিল না। শেষে কোন কোন স্থলে ইহার অন্যথা দেখা যায়। কিন্তু তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে পবিত্র স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারিত না।

খ্রিষ্ট-পূর্ব্ব সহস্র বৎসর হইতে পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন অবস্থা যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণের জীবন কঠোরব্রতময় ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রত্যেক বৎসরের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অতি দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিতে হইত। এই সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলে তিনি আপনাকে ইহলোকে নিন্দনীয় ও অপরাধী এবং পরলোকে দণ্ডনীয় মনে করিতেন। সাবধানে উপাসনা ও যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া তিনি কেবল ইহ লোকে সুখ-শান্তি-পূর্ণ দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করিতেন না, পরলোকেও অনন্ত সুখের অধিকারী হইবেন বলিয়া, মনে করিতেন।

তৃতীয় আশ্রম, বানপ্রস্থ।

এই তৃতীয় আশ্রম প্রাচীন ভারতবাসিদের জীবনের একটী অত্যাবশ্যক প্রধান ঘটনা। যখন গৃহস্বামীর কেশ শ্বেত হইত, কিংবা যখন তিনি পুত্রের পুত্র দেখিয়া সুখী হইতেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার সংসার পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিতেন। তাঁহাকে এই সময়ে "বানপ্রস্থ" বলা যাইত। তাঁহার স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে তাঁহার অনুগমন করিতে পারিতেন। এই আশ্রম ও বনবাস-সংসৃষ্ট অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। পণ্ডিতগণ এতৎপ্রসঙ্গে স্থানীয় ও সমসাময়িক ব্যবহার-প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন, কি ভারতীয় সমাজের ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করা কঠিন। যেখানে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনগমন অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত, সেই খানেই উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সহিত যে, এই নিয়মের সংশ্রব ছিল, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। স্বামীর সহিত বনে গমন স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে আবার গার্হস্থ্য

বন্দোবস্তেরও অনেক প্রভেদ ঘটিত। যাহাহউক, এই সকল প্রভেদ থাকাতেও নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি বনে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিবাদে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতেন। তিনি কিছুকাল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থাশ্রমের অনুরূপ ছিল না। বানপ্রস্থকে মানসিক অনুষ্ঠান মাত্র করিতে হইত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই মনে মনে স্মরণ করিতেন। এইরূপ করিলেই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফল লাভ হইত। কিছুকাল পরে এই অনুষ্ঠানও পরিসমাপ্ত হইত। বানপ্রস্থ ব্যক্তি তখন নানাবিধ তপ করিতে আরম্ভ করিতেন। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া বা পরলোকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক ও অনিষ্টজনক, বানপ্রস্থ ব্যক্তির এইরূপ ধারণা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিত এবং পরিশেষে আত্মানুসন্ধান, অর্থাৎ অনন্ত আত্মার সহিত আপনার সম্বন্ধ অবধারণ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইত।

আরণ্য জীবনের সহিত অনেক বিষয়ের সংশ্রব আছে। এই বিষয়গুলি ভারতের ইতিহাস-পাঠকের বিশেষ আমোদজনক। আমরা তৎসমুদয়ের আলোচনায় বিরত থাকিলাম।

এস্থলে কেবল দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তৃতীয় আশ্রমের পর চতুর্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম দেখা যায়। এই অবস্থায় তিনি জন-সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে আপনাকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করেন। পণ্ডিতগণ সন্ন্যাসীর "ভিক্ষুক" "যতি," "পরিব্রাজক," "মুনি" প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। প্রথম তিন আশ্রমের লোকেরা পরজীবনে স্বকৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করিতেন (ত্রয়ঃ পুণ্যালোকলাভঃ) সন্ন্যাসী সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত অমরত্বের অভিলাষী হইতেন (একোঽমৃতত্বভাক্)। অরণ্যবাসীরা পরিষদ-ভক্ত থাকিতেন, সন্ন্যাসীরা জগতের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতেন না। সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের মধ্যে আদৌ এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও সকল স্থলে এতদুভয়ের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ করা সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ, যে তৃতীয় আশ্রম ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের একটী প্রধান বিষয়, মনুসংহিতা,

রামায়ণ ও মহাভারতে যাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পরিশেষে বৌদ্ধ-মতের অধিকতর সমর্থন করিত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা উঠাইয়া দেন (১), এই বৌদ্ধমতকে (২) প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম-সঙ্গত আরণ্য জীবনের সম্প্রসারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা লোক দিগকে একে একে এইরূপ নানা আশ্রমে প্রবর্ত্তিত করিতে থাকেন এবং যতদিন ব্রাহ্মণ যথানিয়মে ছাত্রের ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে বনবাসের স্বাধীনতা বা নির্জ্জন প্রদেশের সুখশান্তি লাভ করিতে পারা যায় না, এইরূপ ভাবেন, ততদিন তাঁহার শাস্ত্রানুগত মত নিতান্ত সরল থাকে। মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ১৭৫ অধ্যায়ে) পিতা পুত্রের কথোপকথনে এই বিষয়টী স্পষ্ট বুঝা যায়। পিতা প্রাচীনগণের উপদেশ অনুসরণ করিবার জন্য পুত্রকে কহিতেছেন, প্রথমে যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিবে, তৎপরে বিবাহ করিয়া পুত্রমুখ দেখিবে, পরে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। এবং সর্ব্বশেষে বনে যাইয়া মুনি হইতে চেষ্টা করিবে। পুত্র পিতার এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম, কন্যা, পুত্র ও যাগযজ্ঞ সমস্তই অনাবশ্যক অধিকন্তু অনিষ্টকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি কহিতেছেন, "পল্লিবাসীর সুখ-সম্ভোগ মৃত্যুর দংষ্ট্রা মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রে অরণ্যই দেবতাদের আবাস-স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পল্লিবাসীর সুখ-সম্ভোগ তাহার বন্ধন রজ্জুস্বরূপ। জ্ঞানী লোকে উহা ছেদন করিয়া থাকেন কিন্তু অজ্ঞানীরা ছেদন করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের নির্জ্জনবাস, সমদর্শিতা, সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, ন্যায়পরতা ও সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বিরতির ন্যায় আর ধন নাই। হে ব্রাহ্মণ, যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন ধন, কিংবা আত্মীয়-বর্গ অথবা স্ত্রী দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? হৃদয়-নিহিত আত্মার অন্বেষণ কর। তোমার পিতাও পিতামহেরা কোথায় গিয়াছেন?"

১। নারদ কহিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাদ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথিসৎকারে গোহত্যা, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মাংসাহার ও সন্ন্যাসগ্রহণ কলিযুগে নিষিদ্ধ। আদিত্য পুরাণেও এইমতের পোষকতা দেখাযায়।

২। আপস্তম্ব সূত্রের (১ম, ৬, ১৮, ৩১) টীকা দেখ।

এই উক্তি কবিকল্পনা-সম্ভূত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভারতের প্রাচীন আর্য্যজীবনের প্রকৃত অবস্থা বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এই অরণ্য বাস যে, কাল্পনিক নহে, তাহা কেবল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য হইতে কেন, গ্রীক লেখকগণ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। গ্রীকেরা জনকোলাহল-পূর্ণ নগর ও পল্লীর পার্শ্বস্থ ধ্যান-নিমগ্ন জ্ঞানিগণের আশ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই অরণ্য-বাসকে মনুষ্য-জীবনের সম্বন্ধে একটী নূতন কল্পনা বলিয়া মনে করেন। চতুর্থ শতাব্দীর খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসিদের জীবনের সহিত এই আরণ্য জীবনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসিদের পর্ব্বত-গুহা প্রভৃতি আশ্রয়-স্থান অপেক্ষা ভারতের আশ্রম গুলি অধিকতর জ্ঞানোন্নত ও অধিকতর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিল। সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাস স্বীকারের বিষয় খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধগণ হইতে শিখিয়াছিলেন কি না, বৌদ্ধ ও রোমান কাথলিকদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে, অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায় (যেমন মঠ, বিহার, অক্ষমালা, পুরোহিতের ক্রিয়া-কলাপ) তাহা এক সময়ে ঘটিয়াছে, কি না, এসকল প্রশ্নের আজ পর্য্যন্ত কোন সুন্দর মীমাংসা হয় নাই। খ্রিষ্টীয় উদাসীন সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিলে, কেবল ভারতবাসিদিগকে একমাত্র সভ্যজাতি বলিয়া বোধ হয়। এই ভারত-বাসীরা বুঝিয়াছিলেন যে, মানব-জীবনের এমন এক সময় আছে, যখন তরুণবয়স্ক দিগের উপর সংসার-ভার অর্পণ পূর্ব্বক ইহলোক ও পরলোকের চিন্তাতে মগ্ন হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। ভারত-বাসিগণই কেবল জীবনের এই গূঢ় তত্ত্বের মূল্য বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অতি অল্প পরিশ্রমেই পৃথিবী হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদিত হয়, এদিকে জলবায়ুর গুণে অরণ্য-বাস প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে। আর্য্যগণ এই অরণ্যবাসের যে সকল নাম দিয়াছেন, আদৌ তাহাতে আনন্দ বা সুখ বুঝাইত। কিন্তু ইউরোপে এরূপ কোন সুবিধা ছিল না; ইউরোপের স্থবিরগণ গৃহে থাকিয়া তরুণ-বয়স্ক-দিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভবিষ্যবংশীয়দিগের

সৎকার্য্য প্রবলতার বেগ নিরুদ্ধ করিতেও ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু ভারতের স্থবিরগণ পৌত্রমুখ দেখিলেই অকাতরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নীরবে, নির্জ্জনে, সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

আরণ্য জীবন।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে, আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানে ন্যূন ছিলেন, আমাদের এমন মনে করা উচিত নহে। আমাদের ন্যায় তাঁহারাও জানিতেন যে, অরণ্যে বাস করিলেও লোকের মন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কালীময় হইতে পারে। আমাদের ন্যায় তাঁহারাও ইহা বুঝিতেন যে, সমাজের জনতা ও গোলযোগের মধ্যেও মানব-হৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম বিরাজমান থাকিতে পারে, সেই আশ্রমে মানবের-প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানও লাভ হইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উল্লেখ আছে (৩য়, ৬৬)—"বানপ্রস্থ হইলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের প্রকৃত চর্চ্চা করিলেই কেবল ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব আপনার পক্ষে যাহা কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, অন্যের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে না।"

মনুতেও ঠিক এই ভাব দেখা যায় (৬ষ্ঠ, ৬৬) "মনুষ্য যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী হইয়া যথানিয়মে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে। কোনরূপ বাহ্য চিহ্ন ধারণ না করিলেও হয়, বাহ্য চিহ্ন ধারণকে কখনই কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। মহাভারতে এই ভাবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়ঃ—

"হে ভারত। সংযমী লোকের অরণ্য-বাসের প্রয়োজন কি? এবং অসংযমীরইবা অরণ্যের আবশ্যকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণ্য, সেই স্থানই আশ্রম" (১)।

১। শান্তিপর্ব্ব, ৫৯৬১,

দান্তস্যকিমরণ্যেন তথাদান্তস্য ভারত।

যত্রৈব নিবসেদ্ দান্তস্তদরণ্যং স চাশ্রমঃ॥

"মুনি যদি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গৃহে বাস করেন, আর চির দিন যদি শুদ্ধাচারী ও দয়াশীল থাকেন, তাহা হইলেই তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন" (১)।

"আত্মা পবিত্র না হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, মুণ্ডন, বল্কল ও অজিন পরিধান, ব্রতপালন, অভিষেচন, অগ্নিহোত্র, বনে বাস ও শরীরশোষণ, সমস্তই নিষ্ফল" (২)।

কাল সহকারে ক্রমেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি অতঃপর এই সকল ভাবই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়লাভে সহায়তা করে। বৌদ্ধগণ ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা বাহ্য চিহ্ন-ধারণ নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত ধর্ম্মপদনামক গ্রন্থের এক স্থানে (সংখ্যা ১৪১, ১৪২) দেখা যায়;—

"যে মানব অভিলাষকে জয় করিতে পারে নাই, উলঙ্গভাবে অবস্থিতি, জটাভার, ধরাশয়ন, উপবাস, ভস্মলেপন ও নিশ্চলভাবে অবস্থান, কিছুতেই তাঁহাকে পবিত্র করিতে পারে না।"

"যিনি পরিচ্ছদপ্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়াও শান্ত, সংযত, অনুদ্ধত, ইন্দ্রিয়-বিকার-শূন্য এবং হিংসা-রহিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।"

ঠিক আমাদের ন্যায় প্রাচীন ভাবুকদের মনেও ক্রমাগত এই সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কবিতায় ও মহাকাব্যে এই ভাব মনোহারিণী শোভা পবিগ্রহ করিয়াছে। মহাভারতোক্ত (৩) জনক রাজা ও স্থুলভার

(১) বনপর্ব্ব, ১০৪৫০,

তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ।
যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

(২) বনপর্ব্ব. ১৩৪৪৫,

ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিনসম্বেষ্টং ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্॥
অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যাস্থ্যর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ।"

(৩) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২০ অধ্যায়।

কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করিলেই ইহার সৌন্দর্য্য বুঝা যাইবে। সুলভা পরমসুন্দরী কামিনীর বেশ ধারণ করিয়া জনকের প্রতি এই বলিয়া দোষা-রোপ করিতেছে যে, তিনি জগতের না হইয়াও জগতে বাস করিতেছেন এবং রাজা হইয়াও ঋষি হইবেন, মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিতেছেন। তাহাতে জনক রাজা এই বলিয়া গৌরব করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার রাজধানী সমস্ত মিথিলানগরী ভস্মসাৎ হয়, তাহা হইলেও তাঁহার কোন সামগ্রীই বিনষ্ট হইবে না (১)।

তথাপি প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থা অতিবাহিত হইবার পর মানুষ যখন পঞ্চাশৎ বর্ষে উপনীত হয়, অর্থাৎ আমরা সাংসারিক কার্য্যে আসক্তি প্রযুক্ত যাহাকে জীবনের অতি উৎকৃষ্ট সময় বলিয়া মনে করি, তাহা যখন শেষ হয়, তখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মানুষের সুখ-শান্তিতে এবং তপস্যা দ্বারা অভ্যন্তরে, বহির্ভাগে ও সম্মুখ-ভাগে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার জন্মে।

যাহা হউক, এই দুই প্রথা দ্বারা প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সভ্যতা ও মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ হইত কি না, এস্থলে তাহার কোন সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কোন নূতন ও অপরিচিত বিষয় দেখিয়া আমরা যাহাতে উহার উপর দোষারোপ না করি, আর যাহা আমা-দের পরিচিত, কেবল তাহারই গৌরবে প্রবৃত্ত না হই, আমাদের তাহাই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। ইউরোপের স্থবিরগণ নিঃসন্দেহ অনেক উপ-কার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব, তাঁহাদের প্রভুত্ব যে, অনেক সময়ে তরুণবয়স্ক যুবক-হৃদয়ের উদার সঙ্কল্প নষ্ট করিত, ইতিহাস তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছে। নবীনেরা প্রাচীনদিগকে নির্ব্বোধ ভাবেন এবং প্রাচীনেরা নবীনদিগকেও এইরূপ নির্ব্বোধ বলিয়া জানেন, এই যে একটী কথা আছে, তাহা মিথ্যা না হইতে পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞদের মানসিক ভাবের নবীনত্ব ও মানসিক তেজের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে, তাঁহাদের ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাও কি এইরূপ সত্য নহে?

---

(১) ধর্ম্মপদ ১১৫ পৃঃ।

এই বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম ইচ্ছাবিরুদ্ধ বনবাস মাত্র ছিল না। ইহা আর্য্যদিগের একটী পবিত্র অধিকারের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাঁহারা যথানিয়মে ছাত্র ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই, তাহারা এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মানব-হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় রিপু দমন জন্য প্রথম দুই অবস্থায় শিক্ষা লাভ করা অতি আবশ্যক। মানব-জীবনের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়ে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা অতি অল্প ছিল। ছাত্র যেমন পাঠাভ্যাসে নিয়ত থাকিতেন, সেইরূপ তিনি দেবতায় বিশ্বাস করিতেন, দেবতার উপাসনা করিতেন এবং দেবতার উদ্দেশে বলি দিতেন। বেদ ছাত্রের পরম পবিত্র গ্রন্থ ছিল। ইহা অকৃত্রিম, দেবদত্ত বলিয়া ভারতীয় সাহিত্যে যেরূপ সমাদরে সংরক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ সেরূপ সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায় না।

মানব তৃতীয়াশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র এই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেন। তিনি এই আশ্রমে থাকিয়া কিছু দিন বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান এবং স্তোত্র পাঠ ও বেদোচ্চারণ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু উপনিষদোক্ত অনন্ত আত্মাতে মনোনিবেশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি এই আত্মানুসন্ধানে যতই মনোনিবেশ করিতেন অহংকারে মত্ত থাকিয়া, যে সকল বস্তু আপনার বলিয়া ভাবিতেন, তৎসমুদয় যতই পরিহার করিতে পারিতেন এবং স্বীয় অচিরস্থায়ী বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া যতই অনন্ত আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হইতেন, ততই নিয়ম, আচার, জাতি ও বাহ্য ধর্ম্মের বন্ধন সকল তাঁহার নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিত। বেদজ্ঞান এখন তাঁহার নিকট সামান্য জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। যাগ যজ্ঞ সকল বাধা স্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং প্রাচীন দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি কেবল নাম মাত্র বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তখন আত্মা ও ব্রাহ্মণ (অন্তরাত্মা ও বাহ্যাত্মা) কেবল এই দুইটী মাত্র থাকে। তখন তিনি এই সকল বাক্যে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান প্রকাশ করেন, 'তত্ত্বম্,' তুমিই এই, তোমাতেই তুমি, যখন সকল বস্তু কিছু কালের জন্য তোমার বলিয়া বোধ হয়, তখন যে আত্মজ্ঞান থাকে, তাহা অন্তর্হিত হইলে অনন্ত আত্মা লাভ হয়। যখন সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হয়,

তখন তোমার প্রকৃত আত্মা অনন্ত আত্মায় মিশিয়া যায়। তোমার শরীরস্থ আত্মাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ(৫)। জন্মমৃত্যু হেতু কিছুকাল তুমি উহার অপরিচিত

(৫) আমি "ব্রাহ্মণ" শব্দের পরিবর্তে "আত্মন্" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। যদিও ব্রাহ্মণ শব্দের ক্রমোৎকর্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি উহার প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেই যেন এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বুঝায়, যাহা হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয় কি, তাহাতে এখনও আমার সংশয় আছে।

ব্রাহ্মণ বৃহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের মতে বৃহ্ ধাতুর অর্থ স্থাপন বা নির্ম্মাণ করা, চেষ্টা করা, বৃদ্ধি পাওয়া। এই তিনটী অর্থ সঙ্কুচিত করিয়া একটী করিলে "ঠেলন" হয়। ইহা অকর্ম্মক রূপে ব্যবহৃত হইলে উদ্ভূত হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া বুঝায় এবং সকর্ম্মক রূপে ব্যবহৃত হইলে উৎপাদিত করা, স্থাপন করা বুঝাইয়া থাকে।

প্রাচীনেরা ব্রাহ্মণ শব্দের যে সকল অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সহিত এই সকল অর্থের তাদৃশ সংশ্রব নাই। যাস্ক ব্রাহ্মণের অর্থ খাদ্য কিংবা ধন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য এই সকল অর্থের সহিত আর কয়েকটী যোগ করিয়া দিয়াছেন, যথা, স্তোত্র, প্রশংসাস্তোত্র, যজ্ঞ, বৃহৎ। অধ্যাপক রথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের প্রথম অর্থ (১) ধর্ম্মসঙ্গত ধ্যান, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা, ঐশ্বরিক উপাসনায় প্রত্যেক ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য, (২) পবিত্র নিয়ম, (৩) পবিত্র বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য, (৪) পবিত্র জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, ঐশ্বরিক জ্ঞান, (৫) পবিত্র জীবন, সাধুতা, (৬) ঐশ্বরিক জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ বিষয়, নিরাকার ঈশ্বর, এক অদ্বিতীয়, (৭) ধর্ম্মযাজক। পক্ষান্তরে হোগ সাহেব কহেন, ব্রাহ্মণের আদিম অর্থ, কুশনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী, তিনি বেন্‌ফির ন্যায় পারসীকদিগের যজ্ঞ বিশেষের দ্রব্যের সহিত ইহার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এই যজ্ঞ বৈদিক সোম যাগের অনুরূপ। তিনি অনুমান করেন, ব্রাহ্মণের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া শুভ। স্তোত্রের উপর যজ্ঞের শুভাশুভ নির্ভর করাতে স্তোত্রসমুদয়ও ব্রাহ্মণ নামে উক্ত হয়।

কিন্তু আমি এই সকল অর্থেও পরিতৃপ্ত হই নাই। ব্রাহ্মণ শব্দের উৎপত্তি ও উন্নতির কথা না বলিয়া আমি উহার আর একটী অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছি। বৃহ্ ধাতুর অর্থ শব্দকরা, কথা বলা। কথা উদ্ভূত হইয়া উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর প্রধান উদ্দিষ্ট বিষয়। ঈশ্বর কথা দ্বারা স্তুত হন। লাতিনের শব্দ-বিশেষের ধাতুতেও এইরূপ অর্থ দেখা যায়। ভারতবর্ষীয়েরা বৃহ ও ব্রহ্মের আদিম অর্থ কতদূর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলা দুর্ঘট। তাঁহারা এক দেবতাকেই বৃহস্পতি ও বাচস্পতি নামে নির্দ্দেশ করিতেন। বৃহদারণ্যকে (১ম, ৩, ২০) উল্লেখ আছে, 'এষ উ এব বৃহস্পতি বাগবৈ বৃহতী, তস্য এব পতিঃ তস্মাৎ উ বৃহস্পতি, এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ, বাগ বৈ ব্রহ্মা, তস্য এব পতিঃ, তস্মাৎ উ ব্রহ্মণস্পতিঃ। এই স্থলে

থাক। কিন্তু যখন তুমি তৎসমীপে প্রত্যাগত হও, তখনই তাহার পরিচিত হইয়া উঠ।

উপসংহার।

আমরা যে সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছিলাম, এইখানে তাহার শেষ হইল। যে "অনন্ত," আদৌ পর্ব্বত, নদী, সূর্য্য, আকাশ, উষা, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি প্রভৃতির অন্তরালে দৃষ্ট হইত, এইখানে সেই "অনন্ত" আপনার উচ্চতম ও পবিত্রতম মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইল। ভারতবাসীর জ্ঞান ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহারা কহিয়াছেন, আমরা কি তাহাকে বর্ণন বা অবধারণ করিতে পারি? ইহার উত্তর স্থলে তাঁহারা নিজেই বলিয়াছেন, "না"। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, সমস্তই "না না"। তিনি ইহা নন, তিনি উহা নন, তিনি স্রষ্টা নন, পিতা নন, সূর্য্য নন, আকাশ নন, নদী বা পর্ব্বতও নন। আমরা তাঁহাকে যাহাই বলি না কেন, তিনি তাহার কিছুই নহেন। আমরা তাঁহার অবধারণা বা তাঁহার নাম-নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা একবার যদি তাঁহাকে পাই, তাহা হইলে কোনও ক্রমে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। তখন আমরা শান্তির ক্রোড়ে লালিত, আমরা বন্ধন-মুক্ত ও আমরা সুখী হই। মৃত্যু আসিয়া যত দিনে তাঁহাদিগকে বিযুক্ত না করিত, ততদিন তাঁহারা সহিষ্ণু হইয়া কালাতিপাত করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের বার্দ্ধক্যকাল বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা করিতেন না বটে কিন্তু আত্মঘাতী হওয়া মহা পাপ বলিয়া মনে করিতেন(১)।

বাক্‌শব্দের সহিত বৃহতী (বৃহ) ও ব্রহ্মের একত্ব দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধি পাওয়া অর্থ-বোধক বৃহ ধাতু হইতে বহিঃ (তৃণ, তৃণপুঞ্জ) শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, ব্রাহ্মণ শব্দ শেষে বিশ্ব, আত্মা, পরমাত্মা অর্থ-দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

(১) মনু (৬ষ্ঠ,৪৫) কহিয়াছেন, মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়, বাঁচিবারও ইচ্ছা করা উচিত নয়, বেতনভুক্ ভৃত্য যেমন ভৃতির অপেক্ষায় থাকে, সেইরূপ নিয়মিত সময়ের অপেক্ষায় থাকিবে।

তাঁহারা পৃথিবীতে অনন্ত জীবন লাভ করিতেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, পুনর্জন্ম কিংবা মৃত্যু আর তাঁহাদিগকে অনন্ত আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

তথাপি তাঁহারা আপনাদের আত্মার বিধ্বংসে বিশ্বাস করিতেন না। ইন্দ্র যখন সহিষ্ণু হইয়া প্রজাপতির নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করিতেছিলেন, তখন তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করুন। ইন্দ্র প্রথমে জল-পতিত ছায়াতে আত্মার অনুসন্ধান করেন, পরে লোকের তন্দ্রাবস্থায় এবং পরিশেষে লোক যখন গাঢ় নিদ্রাভিভূত, তখন তাহাতে আত্মার অন্বেষণ করিতে থাকেন, কিন্তু ইহাতে তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া কহেন, "না ইহা আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু নিদ্রিত ব্যক্তি জানিতে পারে না যে, সে আমি, কিংবা সে কোন পাদার্থের সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। আমি ইহাতে কোন উপকার দেখিতেছি না। তাঁহার গুরু এ বিষয়ে কি উত্তর দিয়াছিলেন? গুরু কহিয়াছিলেন, "এই শরীর মরণ-ধর্ম্মশীল, ইহা সর্ব্বদাই মৃত্যুর আয়ত্ত থাকে, কিন্তু এই নশ্বর শরীরই আত্মার বাসগৃহ, এই আত্মা অমর ও অশরীরী। এই শরীর আমি এবং আমিই এই শরীর, যত দিন এই জ্ঞান থাকে, ততদিন আত্মা সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় না; কিন্তু যখন আমি শরীর হইতে পৃথক্, আত্মার এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন কি সুখ, কি দুঃখ, কিছুই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"এই আত্মা—সর্ব্বোত্তম পুরুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, ইহা পুনরায় আপনাতেই ফিরিয়া আইসে। ইহা কেবল দর্শকরূপে থাকিয়া আনন্দিত হয়, হাসে, খেলা করে, শরীর যে ইহার উৎপত্তিস্থান, তাহা ইহার মনে থাকে না। ইহা চক্ষুর আত্মা, চক্ষু কেবল যন্ত্রমাত্র, যিনি জানেন, আমি ইহা বলিব, আমি ইহা শুনিব, আমি ইহা ভাবিব, তিনিই আত্মা, জিহ্বা, কর্ণ এবং মন কেবল যন্ত্রমাত্র। মন তাঁহার স্বর্গীয় চক্ষু, এই চক্ষু দ্বারা আত্মা সমুদয় সুন্দর বস্তু দেখিয়া আনন্দিত হন।"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, নির্ব্বাণ-লাভ বনবাসীদের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। আত্মা বিমুক্ত হইয়াও পূর্ব্বের

ন্যায় বিদ্যমান থাকিবে। আমরা আপনাদিগকে যাহা বলিয়া ভাবিতাম, তাহা আর থাকিলাম না, আপনাদিগকে যাহা বলিয়া জানি, আমরা তাহাই হইলাম। যেমন কোন রাজপুত্র হীনবংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপালিত হইলে হীন-বংশোদ্ভব বলিয়াই পরিচিত হন, কিন্তু কোন বন্ধুর মুখে আপনার প্রকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিলে তিনি কে তাহা জানিতে পারেন, এবং রাজপুত্ররূপে পরি-গৃহীত হইয়া পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হন, আমাদের ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। যত দিন আমরা আমাদের আত্মাকে চিনিতে না পারি, ততদিন আমরা আপনাদিগকে যাহা বলিয়া ভাবি, তাহাই থাকি। কিন্তু আমরা যথার্থতঃ কি, ইহা কোন বন্ধু যখন দয়া করিয়া আমাদিগকে বলেন, তখন আমরা নিমেষ মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হই, আত্মার নিকট উপনীত হই, এবং আত্মাকে অবগত হই। রাজ-বালক যেমন নিজ পিতাকে চিনিয়া স্বয়ং রাজা হন, সেইরূপ আমরাও আত্ম-পরিচয় পাইয়া আমাদের আত্মা হইয়া উঠি।

ধর্ম্মচিন্তার অবস্থা।

যে ধর্ম্ম সরল বাল্য-ভাবপূর্ণ উপাসনা হইতে অবস্থার পর অবস্থা অতি-ক্রম করিয়া পরিশেষে সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক ভাবে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনা করিলাম। বৈদিক স্তোত্রের অধিকাংশে বৈদিক ধর্ম্মের বাল্যাবস্থা, ব্রাহ্মণ-বর্ণিত যজ্ঞাদি, গার্হস্থ্য ও নৈতিক ব্যবস্থাদিতে মধ্যাবস্থা এবং উপনিষদে বৃদ্ধাবস্থা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী যদি ব্রাহ্মণ আয়ত্ত করিয়াই বাল্য-ভাবপূর্ণ স্তোত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন এবং পরিশেষে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের সার্থকতা ও দেবগণের প্রকৃত শক্তি অস্বীকার করিয়া যদি একমাত্র উপনিষদের উন্নত ধর্ম্মে আদর দেখাইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সেরূপ কিছুই হয় নাই। ভারতে যে ধর্ম্মভাব প্রথমে পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং পুরুষানুক্রমে পবিত্র বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বৈদিক ধর্ম্মের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, এই তিন কালে যে সমস্ত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তৎ-সমুদয় যথাক্রমে মানব জীবনের তিন অবস্থার সহায়তা করিতেছিল।

ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে, সুপবিত্র বেদে কেবল ধর্ম্মচিন্তার নানা অবস্থা বিবৃত হয় নাই, অধিকন্তু উহাতে পরস্পর-বিরোধী মতসকলও সংরক্ষিত হইয়াছে। বেদের স্তোত্র-সমূহে যাঁহারা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণে সর্ব্বজীবেশ্বর প্রজাপতির বিষয় পাঠ করিলে আর আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিতে পারি না। ইহার পর উপনিষদে যখন ব্রাহ্মণ সমস্ত বিষয়ের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ব্যক্তিগত আত্মা অনন্ত আত্মার কণা মাত্র বলিয়া অবধারিত হইল, তখন বৈদিক দেবগণের আর দেবত্ব রহিল না।

শত শত এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই প্রাচীন ধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কখনও কখনও ইহার আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও পুনবায় ইহা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনার পূর্ব্ব-প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, ইহা যেমন সময়োচিত তেমনি কালোপযোগী। অনেক নূতন ও বিসদৃশ বিষয় আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। অদ্যাপি অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে লৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অদ্যাপি এখন অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, যে পরিবারে সুকুমারমতি বালকগণ বেদ পাঠ করিতেছে, তাঁহাদের পিতা প্রতিদিন আপনার পবিত্র কর্ত্তব্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতেছেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের পিতামহ পল্লীবাসী হইয়াও কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাদর দেখাইতেছেন এবং বৈদিক দেবতার নাম বৃথা মনে করিতেছেন। বেদান্তই এক্ষণে তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, তিনি এই বেদান্তেই শান্তির অন্বেষণ করিতেছেন।

ইহাঁদের তিন পুরুষই নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিয়া থাকেন। পিতামহ অধিকতর জ্ঞানী হইলেও পুত্র পৌত্রের প্রতি অবজ্ঞা দেখান না, কিংবা তাহাদিগকে ভণ্ডাচারী বলিয়াও সন্দেহ করেন না। তিনি জানেন যে, ইহার পর তাহাদেরও মুক্তির সময় আসিবে। এজন্য তিনি এমন ইচ্ছা করেন না যে, তাহারা এই মুক্তির জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকুক। পুত্র কঠোর ব্রত-পালনে বাধ্য হইলেও পিতার স্বাধীনতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন না। যেহেতু তিনি জানেন যে, তাঁহার পিতাকেও এক সময়ে এই কঠোর ব্রত পালন করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মের আলোচনায় আমাদের যে সকল জ্ঞান লাভ হয়, এস্থলে কি তাহার

কিছুই নাই? যখন আমরা দেখি, যাঁহারা ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন, তাঁহারা অগ্নির উপাসকদের সহিত একত্র থাকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যখন আমরা দেখি, যাঁহারা প্রজাপাতির আরাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর দেবগণের উপাসকদের প্রতি কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই, যখন আমরা দেখি যাঁহারা আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া পরমাত্মার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সমুদয় দেবতাকে নাম মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহারা এই পূর্ব্বোপাসিত দেবগণের নিন্দাবাদে উন্মুখ হন নাই, তখন আমরা অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী ও সুসভ্য হইলেও কি তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই শিখিতে পারি না?

আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, সকল বিষয়েই আমাদের কেবল ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করা উচিত এবং তাঁহাদের ধর্ম্মগত বিশ্বাসের অনুমোদনীয় চারিটী আশ্রমও আমাদের সমাজে প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। আমাদের আধুনিক জীবন উক্তরূপ কঠোর নিয়মের বশীভূত হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসের অধিকারী হইবার আশায় কেহই এখন যাগ যজ্ঞ ও কঠোর ব্রত-পালনের কষ্ট স্বীকার করিবেন না। প্রাচীন ভারতে যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আমাদের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গৌরব বাড়িয়াছে। এ সমাজে ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থাপকদিগের ব্যবস্থা পরিগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে আমরা যে সকল ব্যবস্থার কথা জানি, তৎসমুদয় কিরূপে প্রতিপালিত হইত, তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের এই কঠোর ব্যবস্থার বন্ধনও ছিন্ন হইয়াছিল। যেহেতু, ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণকে সামাজিক বন্ধন অতিক্রম করিবারও অধিকার দিয়াছে। বৌদ্ধেরা ইচ্ছা করিলেই অরণ্যে যাইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এই বলিয়া বৌদ্ধদিগের উপর একটী গুরুতর দোষের আরোপ করেন যে, তাঁহারা প্রব্রজিত, তাহারা নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে ব্যবস্থা-বন্ধন ছেদন করে এবং প্রাচীন নিয়মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত থাকে।

যদিও আমরা ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের এই ক্রমোন্নত জীবনাতিপাত-পদ্ধতির অনুকরণ করা' উচিত বোধ করি না, যদিও ইদানীন্তন সময়ে সাংসারিক কার্য্যে বিরক্তি জন্মিলে আমাদিগকে অরণ্য আশ্রয় করিতে হয় না এবং যদিও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কখনও কখনও সংসারে থাকিয়াই আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষাকৃত গৌরব-জনক বোধ করি, তথাপি আমরা প্রাচীন ভারতের অরণ্য-বাসীদের নিকট হইতে বহুমূল্য উপদেশ পাইতে পারি। এই উপদেশের বলে আমরা আমাদের জীবনের বাহিরে, অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে অবলোকন করিতে সমর্থ হই, এই উপদেশের বলে, আমরা ক্ষমা, করুণা ও সমবেদনা লাভ করিতে পারি, বনবাসী না হইয়া নগরবাসী হইলেও এই উপদেশের বলে আমরা কিরূপে প্রতিবাসীদের সহিত একতা ও কিরূপে প্রভেদ রাখিতে হয়, তাহা শিখিতে পারি, যাহারা আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতে অবজ্ঞা দেখায়, এই উপদেশের বলে আমরা তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে পারি এবং যাহাদের বিশ্বাস, যাহাদের আশা, যাহাদের ভাবনা, এমন কি যাহাদের নৈতিক মত আমাদের হইতে বিভিন্ন, আমরা এই উপদেশের বলে সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাহাদিগকে অবজ্ঞা কবিতে বিরত থাকি। ফলতঃ যে জীবনে মানুষ, "মানুষ কি" তাহা বুঝিয়াছেন, জীবন কি তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং অনন্ত ও অসীমের সমক্ষে মৌনাবলম্বন কবিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সেই জীবনই প্রকৃত আরণ্য জীবন ও সেই জীবনই অরণ্যবাসী প্রকৃত জ্ঞানিগণের উপযোগী।

মানব-মনের এই অবস্থাকে নিন্দা করা অতি সহজ; নিন্দাবাদ উদ্বোধনের উপযোগী শব্দ বিন্যাস করিতেও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কেহ কেহ এই অবস্থাকে অন্তঃসার-বিহীন তাচ্ছীল্য প্রদর্শন মাত্র কহেন, কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী এবং শৈশবাদি তিন কালের জন্য জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সাধুতার বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আবার সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এই বিভিন্নতা তাঁহারা অধিকতর অসাধু বলিতেও সঙ্কুচিত হন না।

যাঁহারা এইরূপ নিন্দাবাদের পক্ষপাতী, আমি তাঁহাদিগকে, সংসারে যাহা হইয়া থাকে, যাহা আমাদের চারি দিকে সর্ব্বদা ঘটিতেছে, একবার তাহার আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। পাদরি বারক্লি, কিংবা নিউটনের ধর্ম্ম আর সামান্য কৃষক-বালকের ধর্ম্ম কি এক? এই প্রশ্নের উত্তরস্থলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন অংশে এক, কিন্তু অধিকাংশস্থলে এক নহে। ইংলণ্ডের লোক যদি বলিত, মানসিক উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, তাহা হইলে মাথ্যু আর্ণোল্ডের ন্যায় জ্ঞানী পুরুষের কথা কখনও আদৃত হইত না; পাদরি বারক্লিও নিরক্ষর জড়ভাবাপন্ন কৃষক-বালকের সহিত একত্র উপাসনা করিতে অসম্মত হইতেন না। কিন্তু এই বিখ্যাত দার্শনিক ঈশ্বর শব্দে যাহা বুঝিতেন, সামান্য কৃষকবালকও যে তাহাই বুঝিত, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।

কিন্তু অপরের কথা না বলিয়া আমাদের নিজের বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ছাড়িয়া আমরা বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে যে অবস্থা অতিক্রম করি, তাহাই ধরা যাউক। কোনও সহৃদয় এরূপ বলিতে পারেন না যে, বাল্যকালে তাঁহার যেরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল যৌবনে ঠিক সেইরূপ আছে, এবং প্রৌঢ়কালে যেরূপ ছিল, বার্দ্ধক্যেও ঠিক সেইরূপ আছে। বাল্য-বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস এই বলিয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করা অতি সহজ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমরা বাল্যবিশ্বাসমূলক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই; কিন্তু ইহা জানিবার পূর্ব্বে আমরা বালকত্ব-সুলভ বিষয়গুলিও পরিত্যাগ করিতে শিখি। উদীয়মান সূর্য্যে যে আভা বিকশিত হয়, অস্তমিত সূর্য্যেও সেই আভা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যভাগে সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যকে প্রাভাতিক লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে সায়ন্তন-শ্রী পরিগ্রহ করিতে হয়। মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে এই প্রকার ধর্ম্মগত বিভিন্নতা আছে কি না, তাহা আর আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের ন্যায় অকপটে যথার্থ বিষয় স্বীকার করি কি না, অর্থগত বৈষম্য সত্ত্বেও যাঁহারা আমাদের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে এক শব্দ ব্যবহার

করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে এবং যাঁহারা সেরূপ করেন না, তাঁহাদের সঙ্গেইবা আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ ?

ইহার পর এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সকলেরই এক শব্দ ব্যবহার করায় বা না করায়, স্বর্গীয়ের প্রতি এক নাম প্রয়োগ করায় বা না করায় কোন ইতরবিশেষ আছে কি না ? অগ্নি ও প্রজাপতি নামের কি একই কার্য্য-কারিতা ? বাল নাম যেমন, জিহোবা কি তেমনি ভাল ? উৎকর্ষ বিষয়ে অহুরমজ্দাও ও আল্লা নাম কি সমান ? ঈশ্বরের গুণ-বিষয়ে আমরা অতি অজ্ঞ হইলেও তাঁহাতে যে সকল গুণ আরোপিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কি অযৌক্তিক ও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না ? ঈশ্বরের উপাসনায় আমরা অজ্ঞ হইলেও বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতির কোন কোন বিষয় কি পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য নহে ?

এই সকল প্রশ্নের কতকগুলি উত্তর আছে। সকলে সেই সকল উত্তরের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না করিলেও তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন না। যথা:——

"জগদীশ্বর ব্যক্তিবিশেষের সমাদর করেন না; কিন্তু সমুদয় জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চলেন, তিনিই তাঁহার প্রিয়।"

"যাঁহারা আমাকে 'প্রভু' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বর্গে যাইবেন না। কিন্তু যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন, তাঁহারাই স্বর্গে যাইবেন"।

উক্ত রূপ প্রমাণ যদি পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ না হয়, তাহাহইলে একটী সাদৃশ্য লইয়া দেখা যাউক। এই সাদৃশ্য ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইয়া অনেক স্থলে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জনে সহায়তা করিয়াছে। মনে করুন, ঈশ্বর পিতা, ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সন্তান।

পুত্র প্রথমে পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কোন অপরিচিত ও অস্পষ্ট নামে ডাকে, তাহা হইলে পিতা কি তাহাতে কিছু মনে করেন ? আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে, অস্পষ্ট বাল-ভাষিত উচ্চারিত হয়, আমরা কি তাহা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করি না ? ইহা

অপেক্ষা অধিকতর সুমিষ্ট, অধিকতর শ্রুতিসুখাবহ আর কোন্ নাম আছে?

অধিকন্তু একটী শিশু যদি আমাদিগকে এক নাম ও আর একটী শিশু যদি আর এক নামে ডাকে, তাহা হইলে আমরা কি তাহাদের নিন্দা করি? এক নামেই ডাকিতে হইবে বলিয়া কি আমরা জিদ করিয়া থাকি? আমরা কি ইচ্ছা করি না যে, বালকেরা তাহাদের আপনাদের বাল-সুলভ ভাবে আমাদিগকে ডাকুক?

নাম সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এখন চিন্তার সম্বন্ধে কতদূর, দেখা যাউক। বালকেরা যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং যখন মাতা পিতার সম্বন্ধে আপন আপন ধারণা সংগঠিত করিতে থাকে, তখন তাহাদের কমনীয় হৃদয়ে যদি এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাহাদের জনকজননী সকলই করিতে পারেন, সমস্তই দিতে পারেন, এমন কি আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত ধরিয়া দিতে সমর্থ হন, তাহারা কোন অপরাধ করিলেও তাহা ক্ষমা করেন, তাহা হইলে পিতা কি বালকের এই সকল কল্পনায় মনোযোগ দেন? তিনি কি নিয়তই তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে থাকেন? সন্তান পিতাকে যদি কঠোর-প্রকৃতি বলিয়া মনে করে, পিতা কি তাহাতে ক্রুদ্ধ হন? মাতাকে যদি অধিকতর দয়াবতী, অধিকতর প্রসন্ন এমনি শিশু বলিয়া ভাবে, মাতা কি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন? শিশু সন্তান জনকজননীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহাদের নিজের অভিপ্রায়ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যত দিন তাহারা আপন আপন বিচিত্র বাল্যভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদিগকে অসঙ্কুচিতচিত্তে বিশ্বাস করে এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসে, তত দিন আমরা সেই সরল বিশ্বাস ও সেই অকৃত্রিম ভালবাসা অপেক্ষা তাহাদের নিকট আর কি অধিক চাহিতে পারি?

এখন পূজা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত হইতেছে। কোন কোন পূজায় বৃষ বধ করা হইত। "অনন্তের তৃপ্তি সাধন জন্য বৃষবধ করা উচিত" এই অপ্রিয় মতে আমরা কখনও আস্থা দেখাইতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ মাতাই বা তাহার পুত্রের মুখ-বিনিঃসৃত ও পুত্রের অপবিত্র হস্ত-প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন? তিনি যদিও উহা

না খাইতে পারেন, তথাপি তিনি কি এমন ইচ্ছা করেন না যে, পুত্র জানুক, তিনি উহা খাইয়াছেন এবং খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন? যত দিন শিশুর বিশুদ্ধ ও সরলান্তঃকরণ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই সমস্ত অকপট ভাব সমুত্থিত হইবে, তত দিন আমরা তাহাদের ভ্রমকে অপরাধ বলিয়া মনে করিব না। শিশুরা যে সকল কথা ভালরূপে বুঝে না, তাহারও উল্লেখ করে, যাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাও বলিয়া থাকে, না বুঝিয়া অপরের প্রতি নির্দ্দয় ভাবেও কথা বলে।

এই সমস্ত কেবল সাদৃশ্য মাত্র। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে এত অন্তর যে, পিতা পুত্রের মধ্যগত অন্তরকে মাপ করিয়াও এ অন্তর মাপিয়া উঠা যায় না। আমরা এ বিষয় অধিক ক্ষণ ভাবিতে পারি না বটে, কিন্তু কিছু ক্ষণ ভাবিবার পরই বোধ হয় যে, আমরা স্বর্গীয়ের সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ ভাবিতেছি এবং পরজীবনে আমরা যেরূপ আশা করিতেছি, সেরূপ সম্বন্ধ ও সেরূপ আশা যেন আর নাই। আমাদের বাল্য-প্রকৃতি, আমাদের মানবীয় জ্ঞান, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিকৃতি-পূজাবিষয়িণী চিন্তা, সমস্তই যেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

আমাদের জানা উচিত যে, মানব-প্রকৃতি স্বর্গীয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণে এক খানি অতি অনুপযুক্ত দর্পণ মাত্র। কিন্তু এই অপরিষ্কৃত দর্পণ না ভাঙ্গিয়া বরং উহাকে যথোচিত উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে, আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। এই দর্পণ অযোগ্য ও অস্বচ্ছ হইলেও আমাদের নিকটে উহাই সুযোগ্য ও স্বচ্ছ। ক্ষণ কালের জন্য উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেও আমরা ভ্রমে নিপতিত হইতে পারি না।

যত ক্ষণ সাদৃশ্য ও সম্ভাবনার কথা কহা যায়, তত ক্ষণ আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অদৃষ্ট ও অজ্ঞাতের সহিত যে সমস্ত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, মানব-প্রকৃতির দৌর্ব্বল্য ও দৃষ্টি-ক্ষীণতা সত্ত্বেও তাহাই সম্ভাবিত ও সম্পূর্ণ বোধ-গম্য হইতে পারে। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা ভবিষ্যতের ঘটনাবলি যেরূপ সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলিয়া কল্পনা করিবেন, উহা কার্য্যতঃ সেইরূপ সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হইবে। তাঁহারা মনে করিতেন তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা ইহ জগতে বদ্ধ, তাঁহারা জগৎসম্ভূত বস্তুই প্রাপ্ত

হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে উচ্চকল্পনায় ও উচ্চ আশায় নিয়োজিত করিতে পারিবেন, তাঁহারাই আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠতর জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থ হইবেন।

যদি আমরা এমন মনে না করি যে, অজ্ঞাত ও অদৃশ্যের সহিত যে সমস্ত সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে বা পরলোকের সম্বন্ধে যেরূপ আশা করা গিয়াছে, তৎসমুদয় ঠিক সেইরূপ সম্পূর্ণ হইবে না, তাহাহইলে কোন্ যুক্তিবলে আমরা বিশ্বাস করিব যে, দুর্ব্বল মন যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহা অপেক্ষাও পরিণাম মন্দ হইবে? যাহা কিছু আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এরূপ বিশ্বাসকেই প্রকৃত বিশ্বাস বলা যায়। অনেক স্থলে ও অনেক ধর্ম্মে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় প্রাচীন এবং নূতন ষ্টেটমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোথাও এই বিশ্বাস অধিকতর সরল ভাবে ও অধিকতর দৃঢ়রূপে পরিব্যক্ত হয় নাই। যথাঃ——

"হে ঈশ্বর! জগতের আদি হইতে এপর্য্যন্ত যাঁহারা আপনার উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারা আপনি ব্যতীত আর কোনও বিষয় শ্রবণ করেন না, বা কিছুই দর্শন করেন না।"

"ঈশ্বর তাঁহার প্রেমিকদের জন্য যাহা সৃজন করিয়াছেন, মানবেরা চক্ষে তাহা কখন দেখে নাই, কর্ণে কখন তাহা শুনে নাই এবং হৃদয়ে কখনও অনুভব করে নাই।"

আমরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি। মানুষ মানুষের ধারণা করিতেই সক্ষম, তদপেক্ষা আর উচ্চতর ধারণা করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া তিনি আর এক পদ যাইতে পারেন এবং বলিতে পারেন যে, পরে যাহা আছে, তাহা ভিন্নরূপ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান হইতে কম অসম্পূর্ণ হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা মন্দ হইতে পারে না। বর্ত্তমান যে মন্দ, ইহা মনুষ্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে মন্দ হইবে, ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে দেখা যায় না। যে পরিণামবাদ নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহা যদি আমাদিগকে কিছু শিখাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা হইতে ইহাই শিখিয়াছি যে, ভবিষ্যৎ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উত্তম হইবে এবং মনুষ্য উন্নতির উচ্চতর সোপানে ক্রমে আরোহণ করিবে।

ঈশ্বর যদি আমাদিগকে আত্ম-পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে মানবাকারে আবির্ভূত হইতে হইত। ঈশ্বর হইতে মানবের দূরতা যত অধিকই হউক না কেন, জগতে মনুষ্য হইতে আর কেহই ঈশ্বরের অধিক নিকটবর্ত্তী নহে। মানুষ যেমন শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে থাকে, স্বর্গীয়ের সম্বন্ধে ধারণাও সেইরূপ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের দোলা হইতে বার্দ্ধক্যের চিতা পর্য্যন্তও এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ধর্ম্ম আমাদের ন্যায় বর্দ্ধনশীল নহে, আমাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহার জীবনীশক্তি পরিস্ফুট হয় না, তাহা মৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নির্দ্ধারিত ও অপরিবর্ত্তনশীল একীভাবকে জীবনের লক্ষণ না বলিয়া মৃত্যুর লক্ষণই বলা গিয়া থাকে। যে ধর্ম্ম জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, যুবা কি বৃদ্ধ হউক, সকলেরই একমাত্র বন্ধন-স্বরূপ হইবে, সে ধর্ম্ম সাধারণের অধিগম্য উচ্চ, গভীর, প্রশস্ত, সর্ব্ব বিশ্বাস, সর্ব্ব আশা ও সর্ব্ব সহিষ্ণুতাময় হওয়া চাই। যতই ইহা বৃদ্ধি পাইবে, ততই ইহার অন্তঃ-শক্তি প্রবল হইবে। এই প্রবলতা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহার সংস্পর্শ মধুর হইতে থাকিবে।

এ কথার দৃষ্টান্ত স্থল খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাতে যে উচ্চতর মত বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা ইহুদী সূত্রধরগণ, রোমক জনসাধারণ ও গ্রীক দার্শনিকগণ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। এই ধর্ম্ম পৃথিবীর উৎকৃষ্ট প্রদেশ সমুদয় অধিকার করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মত যদি প্রথম হইতেই সঙ্কীর্ণ করিবার চেষ্টা না করা হইত, যদি বিশ্বাস ও প্রেমের স্থলে সঙ্কীর্ণ মত প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণ খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতেন না এবং তাহা হইলে এই বিশ্বময় প্রেম ও জগৎময় দয়া-যুক্ত ধর্ম্ম উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িত না।

পূর্ব্ব বিষয়ের আলোচনা।

যে পথে আমাদের সপ্ত সিন্ধুর তট-নিবাসী আর্য্য পিতৃপুরুষেরা অনন্ত, অদৃশ্য ও স্বর্গীয়ের অন্বেষণে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই পথে তাঁহাদের সহিত আমরাও একবার বেড়াইয়া আসিয়াছি। আর একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

হিন্দু আর্য্যগণ প্রথমেই জড়োপাসনায় প্রবৃত্ত হন নাই। আমরা যেখানে জড়োপাসনার আশা করি,সেই থানেই দেখিতে পাই যে,জড়োপাসনা আরও পরে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের আদিম ধর্ম্মভাবোৎপত্তিতে ইহার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ যেরূপ পাটলবর্ণ প্রস্তরের মধ্যে দ্বিতীয় যুগের স্তরনিহিত চূর্ণোপল স্থান পায় না, জড়োপাসনাও সেই রূপ উহাতে স্থান পায় নাই।

আদিম প্রকটীকরণ বলিলে যাহা বুঝায়, আমরা তাঁহাদের কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহার চিহ্ন মাত্রও দর্শন করি নাই। সকলই স্বাভাবিক ও বোধ-গম্য এবং ঐ ভাবে দেখিতে গেলে প্রকৃতই ঈশ্বর-প্রচারিত। বুদ্ধি ও যুক্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, কেবল ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা এই বিষয় স্থির করার প্রয়োজন দেখা যায় না। তাহা করিলেও আমাদের যে সকল প্রতিপক্ষ অন্যত্র আমাদের কথায় সায় দেন, তাঁহারা তাহার অনুমোদন করিবেন না। ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা, আর অজ্ঞাতকে অল্পজ্ঞাত বিষয় দ্বারা প্রকাশ করা সমান কথা। প্রকৃত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার অনন্তের অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুতরাং প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট আমরা অধিক কিছু দাবি করি নাই। আমাদের দাবি আমাদের নিজের কাছে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের যুক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের অবধারণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি যাহা আমরা পাইয়াছি, কোন শত্রু তাহা লইয়া কলহ করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত মানবের আর কি আছে? আরও কিছু আছে, এরূপ কল্পনা করিয়া মানবের কোনও লাভ নাই।

আমরা দেখিয়াছি, যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কোন সীমাবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান আমাদিগের নিকট আনিয়া দেয়, তখন অসম্পূর্ণ সীমাবিশিষ্ট

অর্থাৎ সীমাযুক্ত হইলেও এখনও যেন উহাতে অভাব আছে, এমন একটী ধারণা আনিয়া উপস্থিত করে। অনন্তের মধ্যে অন্তবানের, অদৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যের, অনৈসর্গিকের মধ্যে নৈসর্গিকের ও বিশ্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ-লোকের সুপ্রচারই উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

অসীমের সহিত ইন্দ্রিয়ের এই স্থায়ী সম্বন্ধই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রথম উত্তেজনার উৎপত্তি করে। ইহাকেই ভাষায় বোধের ও জ্ঞানের অতীত "কিছু" বলা গিয়া থাকে।

এই খানেই ধর্ম্মের প্রকৃত মূল স্থাপিত হইয়াছে। জড়বাদের গৌণবাদের, প্রাণবাদের, সাকারবাদের, সকলের পূর্ব্বে উহারই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয়। মানব কি জন্য ইন্দ্রিয়-গোচর সীমাযুক্ত পদার্থের জ্ঞানেই সন্তুষ্ট নহে এবং কেনইবা তাঁহার মনে এই ধারণার আবির্ভাব হয় যে, স্পর্শ, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতির অগ্রাহ্য—যাহাকে শক্তি, আত্মা বা ঈশ্বর কহা যায়, জগতে এমন কিছু আছে অথবা থাকিতে পারে।

বৈদিক সাহিত্য-সৌধের ভগ্নাবশেষ খনন করিতে করিতে যখন আমরা ঐ দৃঢ় পাষাণ-সমীপে উপনীত হইয়াছি, তখন ঐ পাষাণোপরি গঠিত প্রাচীন স্তম্ভ এবং আধুনিক সময়ের ধর্ম্ম-মন্দিরের খিলান ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি আবিষ্কার করিবার জন্য আরও খনন করিয়াছি। অন্তবানের বাহিরে অবশ্য কিছু আছে, মানব-মনে একবার এইরূপ ধারণার সূত্রপাত হইলে হিন্দুগণ কিপ্রকার প্রকৃতির সর্ব্বাংশেই—প্রথমে অর্দ্ধস্পৃশ্য, পরে অস্পৃশ্য অবশেষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য পদার্থে উহা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন এবং উহাকে আয়ত্ত ও উহার নামকরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

যখন অর্দ্ধস্পৃশ্য পদার্থের সম্বন্ধে মানব বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উহা তাঁহার ইন্দ্রিয়ের আংশিক আয়ত্তের মধ্যে, তখনও উহা ছিল।

আবার অস্পৃশ্য পদার্থের বিষয়ে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জানাইল যে, উহা অনায়ত্ত বা কদাচিৎ আয়ত্তাধীন, তখনও উহা ছিল।

এইরূপে অস্পৃশ্য, অর্দ্ধস্পৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ-পূর্ণ এক নূতন জগৎ সৃষ্ট হইল। মনুষ্যের কার্য্যক্ষমতার অনুরূপ উহাদের কার্য্যক্ষমতা ও তদনুযায়ি নামাদিও কল্পিত হইল।

এই সকল নামের যে দুই একটী অদৃশ্য পদার্থের প্রতি আরোপিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে সাধারণ সংজ্ঞা হইয়া দাঁড়াইল। যথা;—অসুর (জীবিত বস্তু), দেব (উজ্জ্বল বস্তু), দেবাসুর (জীবিত দেবগণ)* অমর্ত্ত্য (অমরগণ)। গ্রীক, রোমক প্রভৃতি দেবগণেরও এইরূপ সংজ্ঞা দেখা যায়।

ইহার পর দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্মবিষয়ক সূক্ষ্মতর ধারণাগুলি অপরাপর ধারণার ন্যায় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সুলভ অনুভূতি হইতে উদ্ভূত। নীতি, ধর্ম্ম, অসীমত্ব ও অমরত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিও এইরূপে উৎপাদিত হইয়াছে।

এইখানে দেখা যায়, মানবের মনে কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে "মৃত্যু" "শ্রদ্ধা" ও "ঐশোন্মেষ" প্রভৃতির ধারণা হয় এবং কেমনে সেই ধারণা ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আর কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে ভাল হইত।

বিরোধী মত যাহাই হউক না কেন, মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে চিন্তা ও অনুভূতির আবির্ভাব হয়, তৎসমুদয়ের মূলে ভারতবর্ষেও আদিম ধর্ম্মতত্ত্বের উপকরণ পাওয়া গিয়া থাকে। মৃত্যু যাহাদিগকে আমাদিগহইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, পরলোকে তাহাদের সহিত আমাদের সম্মিলন হইবে, এই বিশ্বাস ধর্ম্মের অবলম্বস্বরূপ হয়। আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও পরলোকসম্বন্ধে এইরূপ আশা ও কল্পনা ছিল।

শেষে বুঝান গিয়াছে যে, কেমন করিয়া ইষ্টেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া একেশ্বরবাদে গিয়া উপনীত হইয়াছে।

ইহার পর প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন দেবতারা কেবল কতকগুলি কল্পিত নাম বৈ আর কিছুই নহে। এরূপ আবিষ্ক্রিয়ায় যদিও কোন কোন স্থলে নাস্তিকতা বা একপ্রকার বৌদ্ধভাব বুঝায়, তথাপি অনেকের পক্ষে ইহা এক নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়াছে এবং একমাত্র অদ্বিতীয়ে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে। এই একমাত্র অদ্বিতীয় যে, কেবল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পদার্থের অতীত, তাহা নহে। ইহা আমাদের সীমাবিশিষ্ট অহং-এর অতীত, পরমাত্মা।

* ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮২, ৫।

এইখানে ভারতীয় ধর্ম্ম-ভিত্তি ও পূজা বলি প্রভৃতির মূল সম্বন্ধে একপ্রকার তৃপ্ত হইয়া আমরা এতদ্বিষয়ক গবেষণায় ক্ষান্ত হইয়াছি।

এস্থলে সকলকেই বলা যাইতেছে, ভারতীয় ধর্ম্ম যেরূপে গঠিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই ঠিক ঐ ভাবে গঠিত হইয়াছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। উপসংহারে এবিষয়ে আরও দুই একটী কথা বলিতেছি।

যেখানে ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও পূজা আছে, সেই খানেই কোন কোন বিষয়ে একভাব দৃষ্ট হইবে, কেন না সকল মানবের হৃদয় এক প্রকার।

আপাততঃ আমাদের একথার অতিরিক্ত কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমি আশা করি, এমন একদিন আসিবে, যে দিনে আমরা মানবজাতির ধর্ম্মের নিভৃততম প্রদেশে যাইতে পারিব। আমি আজ যে বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছি, আশা করি ভবিষ্যতে আমা অপেক্ষা ভাল লোকে সে বিষয় সবিস্তর বিবৃত করিবেন। আর ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের এখন কেবল যে আশা ও যে বীজ মাত্র আছে, সুসময়ে সেই আশা সুসিদ্ধ ও সেই বীজ হইতে প্রচুর শস্য হইবে।

যখন সেই শস্য-সংগ্রহের সময় উপস্থিত হইবে, যখন সর্ব্বজগতের ধর্ম্মের ভিত্তি মুক্ত ও উদ্ধৃত হইবে, কে জানে যে, আর এক বার নানা ধর্ম্মবাদিগণ তাঁহাদের যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্টতর, পবিত্রতর, প্রাচীনতর ও যথার্থতর বিষয় পাইবার আশায় ভূগর্ভস্থ শবরক্ষণ-স্থানের ন্যায় বা প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের নিম্নদেশ-স্থিত লুক্কায়িত প্রদেশের ন্যায় সেই ভিত্তিতে আশ্রয় চাহিবেন না। যাঁহারা বাল্য-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁদিগকে বংশাবলি, অলৌকিক বিষয়, দেবমায়া প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁরা এখনও আপনাদের মন হইতে বালক-সুলভ বিশ্বাস দূর করিতে পারেন নাই।

হিন্দু দেব-মন্দিরে, বৌদ্ধ বিহারে, মুসলমানের মস্‌জিদে, ইহুদীর পূজা-গৃহ ও খ্রিষ্টীয় গির্জ্জায় যাহা প্রচারিত বা পূজিত হয়, তাহা অনেক দূরে ফেলিয়া আসিলেও শ্রদ্ধাবান্‌ মাত্রেই উল্লিখিত নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ স্থানের মধ্যে তাঁহার জীবনের এক অমূল্য নিধি—যাহা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন—লইয়া অবতরণ করিবেন।

হিন্দুগণের ইহলোকে অবিশ্বাস, ও পরোলোকে অসংদিগ্ধ বিশ্বাস;

বৌদ্ধের নিত্য নিয়মের সম্বন্ধে অনুভূতি, তৎবশবর্ত্তিতা এবং দয়া ও শীলতা;

মুসলমানের আর কিছু না থাকিলেও শান্তভাব;

ইহুদীর মন্দ ও ভাল দিনের মধ্যে, যিনি ন্যায়-প্রিয়, যাঁহার নাম "অহম্" (আমি), এমন ঈশ্বরে আসক্তি;

খ্রিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহাতে আস্থা। এবিষয়ে যাঁহার সন্দেহ আছে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রেম কেমন সুন্দর, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া তাঁহারে ডাক, অসীম বল, অদৃশ্য বল, অমর বা পিতা বল, শ্রেষ্ঠ আত্মা বা সকলের বাহিরে, সকলের মধ্যে, যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল। তাহাদের দয়া ও প্রেম মানবে, জীবে ও মৃত ব্যক্তিতে সুপ্রকাশিত। এ প্রেম জীবন্ত ও অবিনশ্বর।

কিন্তু সেই শান্তি-পূর্ণ ভূগর্ভ-নিহিত লুক্কায়িত স্থান যাহা আজিও ক্ষুদ্র ও অন্ধকারময়, যেখানে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র নানা লোকের কোলাহল-বিদ্বেষী, নানা আলোক-বিদ্বেষী এবং নানা মত-বিদ্বেষী ব্যক্তি গমন করেন, কে জানে সময়ে সেই স্থান সুপ্রশস্ত ও আলোক-সমুজ্জল হইবে না এবং অতীত কালের ঐ নিভৃত নিবাস ভবিষ্যতের দেব-মন্দির হইবে না।

সম্পূর্ণ।

সংবাদপত্র-সম্পাদক ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির অভিপ্রায়।

মালাবারির নিকট বোম্বাইর গবর্ণরের ১৮৮২ অব্দের ২৩এ অক্টোবর তারিখের পত্র (গবর্ণরের সদয় অনুজ্ঞা অনুসারে উদ্ধৃত)—

"আপনি যে মহৎকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, গবর্ণর তাহার আবশ্যকতা ও উৎকর্ষ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করিতেছেন, আপনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন।"

শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ অনারেবল হণ্টর সাহেব ৩১এ অক্টোবর বোম্বাইর কনবোকেশন-হলে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে মালাবারির উপস্থিত কার্য্যের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

এখন বোম্বাইতে আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইতেছে। আপনাদের একজন নগরবাসী ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি বিশেষ আমোদিত হইয়াছি। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থ পশ্চিম ভারতবর্ষের ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। আমার বিশ্বাস, তিন এই কার্য্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। বর্ত্তমান সময়ে এই দেশে জ্ঞানের অভাব পূরণে ইহা অপেক্ষা যে, যোগ্যতর কাজ নাই, তাহাতেও আমার বিশ্বাস আছে। বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া, 'যখন আমি এই বিষয়ের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি, তখন জানিতে পারিলাম, অনুবাদকের কোন দোষে নয়, কেবল উপযুক্ত অর্থের অভাবে উপস্থিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে না। সাহিত্য আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়া উচিত, এবিষয়ে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই, আমি তাঁহাদেরও শ্রেণীভুক্ত। যখন আমি এখানে দেখিতেছি যে, পর-প্রদত্ত অর্থে দৃঢ়তর ও শিক্ষার উৎকর্ষের পরিচায়ক চিহ্ন সকল নির্ম্মিত হইয়াছে,

তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রস্তর এবং পিত্তল অপেক্ষাও অধিকতর স্থায়ী সাহিত্য-সংক্রান্ত মহৎ-কার্য্য সম্পাদনে এইরূপ অর্থের অভাব হইবে না।

ইহার পর অহমদাবাদে আর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতায় ডাক্তার হণ্টর সাহেব এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

আমি ইচ্ছা করি, সভা মালাবারিকৃত মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতার উৎকৃষ্ট অনুবাদের প্রতি মনোযোগ দিবেন। একজন পণ্ডিত এইরূপ একটী অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমি আশা করি, তিনি গুজরাটী এবং অন্যান্য দেশীয় সভা হইতে সাহায্য পাইবেন।

"ডাক্তার হণ্টর সাহেবকে বোম্বাইএতে যে সকল অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তৎসমুদয়ের উত্তরস্থলে হণ্টর সাহেব বিখ্যাত পারসী গ্রন্থকার বি, এম্, মালাবারি সাহিত্যজগতে যে একটী অত্যাবশ্যক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করেন * * * ডাক্তার হণ্টর যথার্থই বিবেচনা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং মালাবারির প্রশংসনীয় কার্য্যে যে, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে * * সুতরাং মালা-বারিকে কৃতকার্য্য করিতে হইলে যথোচিত সাহায্য করা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের যে সকল পাঠক মালাবারির কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে, মালাবারি তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছেন"।—ষ্টেটস্ম্যান।

হিন্দুপেট্রিয়ট হণ্টর সাহেবের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখি-য়াছেন :—

বেশ বলা হইয়াছে। অর্থাভাবে মালাবারির মহৎ সঙ্কল্প বিফল হইলে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর হইবে।

পারী নগরীর অধ্যাপক ডারমেষ্টেটর ১৮৮৩ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি

রিবিউক্রিটিক্ নামক সংবাদ পত্রে এক প্রবন্ধ লিখেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশের প্রকৃত অনুবাদ দেওয়া গেল :—

মালাবারির উদ্ভাবনা সাহিত্যবিষয়েই আছে। তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মধ্যে সভ্যতা ও আধুনিক ভাবসকলের ব্যাখ্যা-কারক হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং প্রথম হইতেই গদ্য ,পদ্য লিখন, অনুবাদ, ইংরাজী ও গুজরাটী সংবাদপত্র প্রভৃতি নানারূপে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাথমিক কবিতা-সমূহ দশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়, এখন তাঁহার বয়স আটাইশ বৎসর। প্রায় দুই বৎসর গত হইল, তিনি ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিতেছেন। এই পত্রিকা শীঘ্রই দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। যদিও ইহাতে সাপ্তাহিক সংবাদ অপেক্ষা তৎসমুদয়ের উপর সমালোচনাই অধিক পরিমাণে থাকে, তথাপি এই পত্রিকায় যে ইউরোপীয় পাঠকদিগের কিছু পড়িবার নাই, এমন নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং ইহা ওজস্বিতা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। মালাবারি একজন কবি। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সকল যে, তাঁহাকে কেবল প্রধান পারসিক কবি বলেন, এরূপ নয়, তাঁহারা তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ব প্রধান গুজরাটী কবি বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। মালাবারি ইংরাজি ও গুজরাটী এই উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিয়াছেন।

গত দুই বৎসর হইতে মলাবারি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ও সাহস আবশ্যক করে। এই কার্য্যে তাঁহার কৃতকার্য্য হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যে সকল বিষয়ের সঙ্কলনে ইউরোপীয়েরা এখন ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব সকল জানিতেছেন, মালাবারি প্রচলিত ভাষায় তৎসমুদয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি মোক্ষমূলরের ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ নওরজি এম্, মোবেদজিনের সাহায্যে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া এই মহৎকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, তামিল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে। মালাবারির এই কার্য্য যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের সমর্পণ। "যদি এই অনুবাদ সাংসারিক যন্ত্রণায় বিকৃত-চিত্ত কোন আর্য্য ভ্রাতাকে শান্তি দান

করে, যদি ইহা তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পূর্ব্ব পুরুষদিগের মহৎকার্য্য সমূহ স্মরণ করাইয়া দিতে পারে, যদি ইহাতে তিনি জীবাত্মার চিন্তা দ্বারা পরমাত্মায় মনঃসংযোগ করিতে পারেন, যদি ইহা দ্বারা পরমানন্দ এবং সৎ, অনাদি, অনন্ত অমর, পরমাত্মা হৃদয়ে ধারণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হন ; যিনি আর্য্য বিশ্বাস ও আর্য্য ভাষা, মানবীয় ইতিহাসের এই দুইটী প্রধান বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই তুলনা-রহিত জর্ম্মণ আর্য্য মুনি মোক্ষমূলরের অভিজ্ঞতাতে যদি তিনি কোন উপায়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে।” যাহাতে সর্ব্বসাধারণে এই মহৎ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মালাবারি তাঁহার সংকল্প ও উদ্দেশ্য বুঝাইতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবিশ্রান্ত উৎসাহের আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল সংবাদ পত্রই তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিতে অধিকার দিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহাকে ১,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদের অধিকাংশ খরচ বোম্বাই হইতে চাঁদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সকলেই মনোযোগের সহিত তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নয় যে, এই উদ্যম প্রচলিত ভাষা সমূহকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে সাহায্য করিবে। এইরূপে প্রচলিত ভাষা সমূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার ও বিদেশীয় ইংরেজি ভাষার কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। আমরা এই সাহিত্য সম্বন্ধীয় আন্দোলনের নিকট মস্তক অবনত করিতেছি। ইহাতে আধুনিক ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় উন্নতির পক্ষে সুফল ফলিবে। যে তরুণ যুবক এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমরা এই দূরস্থ ফরাসীভূমি হইতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছি।—জেমস্ ডারমেষ্টের।

আমরা বোম্বাইর সংবাদপত্র সমূহ পাঠে জানিয়াছি যে, মালাবারির “হিবার্ট বক্তৃতার মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ” কয়েক দিন হইল প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহা বরদার গুইকুমারকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মালাবারি গুইকুমারকে একখানি অতি সুন্দর উৎসর্গ-পত্র লিখিয়াছেন। বরদা রাজ্যের প্রজা এই পারসিক গ্রন্থকার তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বরদার মহারাজ ইঁহার প্রশংসিত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।—অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট, ১৮৮৩।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ যে, মালাবারি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বইখানি উত্তমরূপ ছাপান হইয়াছে এবং ইহাতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ মোক্ষমূলরের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের উকীল গোবিন্দ বাসুদেব কনিতকর বি, এ, এল, এল্ বি কর্তৃক অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মহারাষ্ট্রীয় রাজা বরদার গুইকুমারকে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহা উচিতই হইয়াছে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, বরদার রাজা মুক্তহস্তে মালাবারির সঙ্কল্পিত বিষয়ে সাহায্য করিবেন। যুবক গুইকুমারের প্রতি, বিশেষতঃ তাঁহার শিক্ষা ও সাধুতার অনুরাগ ও তাঁহার জাতীয় উন্নতির ইচ্ছার উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি যে, মালাবারির ন্যায় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের সাহিত্যসম্বন্ধীয় ও জাতীয় মহৎ সঙ্কল্প সাধনে যথেষ্ট উৎসাহ দিবেন, তাহাতে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মালাবারি গুইকুমারের প্রজা বলিয়া তাঁহার উপর বিশেষ দাওয়া করিতে পারেন।—হিন্দু পেট্রিয়ট, কলিকাতা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের জগৎবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিষয়ক হিবার্ট বক্তৃতা বেহরামজি এম্ মালাবারি কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং তাহা অতি সুন্দর ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মহারাষ্ট্রীয়

রাজা গুইকুমারের নাম উৎসর্গ করা হইয়াছে। মালাবারির বরদা রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই গ্রন্থ মহারাজ গুইকুমারকে প্রদান করিয়াছেন। দাতা এবং তাঁহার প্রদত্ত বস্তুটী বরদা রাজ্যের পক্ষে প্রকৃত গৌরবের বিষয়। আমরা ভরসা করি, মালাবারির সঙ্কল্পিত বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করার জন্য তাঁহাকে বরদার রাজ-কোষ হইতে বিশেষরূপ সাহায্য করা হইবে।—ইণ্ডিয়ান মিরর, কলিকাতা, ৪ ঠা সেপ্‌টেম্বর, ১৮৮৩।

এই অবিশ্রান্ত ভ্রমণকারী মালাবারি পীড়া হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্রই এবার বোম্বাই হইতে মধ্য ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিয়াছেন। কোন মাননীয় পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, "তিনি ইন্দোর, ধার এবং রাত্‌লামের মধ্যদিয়া যাত্রা করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রদেশের রাজধানীতে তাঁহাকে রাজবাটীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বোম্বাই নগরে ২০ এ তারিখের পূর্ব্বে তাঁহাকে পঁহুছিতে হইবে বলিয়া, তিনি এইরূপ সম্মানপ্রদ নিমন্ত্রণ সকল গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন"। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, উক্ত রাজগণ মালাবারির স্বদেশ-হিতৈষিতা ও উৎসাহের যথেষ্ট পুরস্কার করিবেন। মালাবারি যে, অধ্যাপক মোক্ষমূলরের ব্যাখ্যা-কারক হইয়াছেন, এটী মোক্ষমূলরের পক্ষে যথার্থই সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। বোম্বাইতে কি এমন কেহই নাই, যিনি মালাবারির কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য একবারে অবসর দিতে পারেন? এইরূপ শীঘ্র শীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া অবশ্যই বহু ব্যয়-সাধ্য। অধিকন্তু জুন মাসে মধ্যভারতবর্ষ ভ্রমণ করা এই কথাটী মনে হইলেই, যাঁহাদের বাড়ীতে থাকা অভ্যাস, তাঁহারা ভীত হন। কিন্তু মালাবারির দৃঢ় শরীরে সকলই যেন সহ্য পায়। "অথ" স্বাক্ষরিত ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্পিত বিষয়ের প্রতি যে মহৎ আসক্তি হয়, তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। যদি ভারতবর্ষে মালাবারির ন্যায় আরও লোক থাকিত, তাহা হইলে যে কয়েক জন অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে আমাদের দেশের গুরুতর সাহিত্য-

বিষয়ক ভার ন্যস্ত আছে, তাহা অনেক পরিমাণে লঘু হইত।—হিন্দুপেট্রিয়ট্, কলিকাতা, ২৫এ জুন, ১৮৮৩।

ধারের মহারাজের প্রাইবেট সেক্রেটারির লিখিত পত্র।

ধার রাজবাটী
১৩ই জুন, ১৮৮৩।

মহাশয়,

আমি মহারাজের অনুমতিক্রমে আপনাকে জানাইতেছি যে, এবৎসর রাজ কোষ হইতে অনেক টাকা খরচ হওয়ায় মহারাজ আপনার এই মহৎ ও স্বদেশ-হিতকর কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই নিঃস্বার্থ বিষয়ে আপনি যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদের সাহায্য স্বরূপ মহারাজ ৫০০৲ টাকা দান করিলেন এবং ঐ অনুবাদের পঁচিশ খানির গ্রাহক হইলেন।

ভবিষ্যতেও এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন এরূপও মহারাজের ইচ্ছা আছে। তিনি আশা করেন যে, তাঁহার স্বশ্রেণীস্থ রাজগণ ও স্বদেশের পুনরুজ্জীবনে যাঁহাদের বাস্তবিক ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে যথোচিত সহায়তা করিবেন।

বি, এম্, বেডেকর
ধারের মহারাজের প্রাইবেট্ সেক্রেটারি।

শ্রীমৎ তক্ত্যসাহেবও মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদের সাহায্য স্বরূপ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং অনুবাদিত গ্রন্থের দশ খানির গ্রাহক হইয়াছেন।

ইন্দোরের মহারাজ ও রতলামের মহারাজও প্রত্যেকে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বেঃরামজি মালাবারি তাঁহার আপনার প্রেসিডেন্সি বোম্বাইতে যেরূপ

পরিজ্ঞাত, এ প্রদেশের সেরূপ নন। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। তিনি একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন পারসিক যুবক। তিনি কবি ও বিজ্ঞ লেখক। ইংরেজি ও গুজরাটী উভয় ভাষাতেই তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি বোম্বাই নগরস্থ ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের সম্পাদক। অন্যান্য গুজরাটী কাগজেও তিনি লিখিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহা দ্বারা পশ্চিম প্রেসিডেন্সির দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের উন্নতির সাহায্য হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ছয় ভাষাতে ভট্ট মোক্ষমুলরের ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তিনি সম্প্রতি আমাদের নগরে আগমন করিয়াছেন। মালাবারি নিজেই গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, তামিল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমরা অবগত হইয়াছি, বাঙ্গলায় অনুবাদের ভার শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের উপর সমর্পিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদের দেশীয়গণ বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোক্ষমূলরের উৎকৃষ্ট হিবার্ট বক্তৃতা ভারতবর্ষের প্রধান ছয়টী ভাষায় অনুবাদ করিতে মালাবারিকে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট, ২০এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

আমরা আহ্লাদ সহকারে মালাবারিকে আমাদের প্রদেশে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। কবিরূপে সংবাদপত্রসম্পাদকরূপে এবং সাহিত্যজ্ঞরূপে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয় লিখিয়াই তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই নগরস্থ ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক অতি সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সম্পাদক। এই সংবাদপত্র হইতে অনেক সময়ে আমরা অনেক বিষয় উদ্ধৃত করিয়া থাকি। মালাবারি একজন সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্রতী উন্নত পারসিক যুবক। তিনি ভারতবর্ষীয় ভাষায় মোক্ষমুলারের বক্তৃতা সমূহ অনুবাদের জন্য যে মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাই ইহার প্রমাণ।

ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৭এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

সাধারণ-কার্য্যে ব্রতী আর এক জন লোক আমাদের এখানে আসিয়াছেন। মালাবারি যে, কেবল সাধারণ কার্য্যেই ব্যাপৃত তাহা নয়, তিনি এক জন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁহার দেশীয় ভাষায় লিখিত কবিতা-সমূহ পশ্চিম প্রেসিডেন্সির উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরূপে গণ্য হইয়াছে। তাঁহার ইংরেজি কবিতা সমূহ পাঠ করিয়া ইংরেজ কবি ও পণ্ডিতগণ আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। এই উভয় বিষয়েই প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভাবুকরূপে আপনাকে প্রকাশ করাই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাহিত্যে তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভা আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরেই তাঁহার যশ বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের সহযোগী ইংরেজি ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন। রসিকতায় ও বিদ্রূপেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তাঁহার তীব্র অথচ ভাবপূর্ণ বাক্যসমূহ দেশে প্রচলিত হইতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহেই আমাদের সহযোগীর সম্পাদকীয় স্তম্ভসকল সুপাঠ্য বিষয়ে পূর্ণ থাকে। মালাবারির সর্ব্ব প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি মনোগত ভাবে ও অভ্যাসে প্রকৃত হিন্দু। সর্ব্ব সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিজের অর্থ ও শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয় করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। মালাবারির বর্ত্তমান কার্য্যটি অতি বিস্তৃত। তিনি ভট্ট মোক্ষমূলরের ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সর্ব্বত্র আদৃত হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মোক্ষমূলর যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গুলিই সর্ব্ব প্রধান। বেদান্ত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে।

আমরা আমাদের দেশের সকলকেই বিশেষতঃ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগকে মালাবারির এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশীয় রাজাদিগের ধন ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও সাহিত্য, এই উভয়ের জন্যই ভারতবন্ধুদিগের এই হিতকর বিষয়টির সাহায্য করা উচিত। এক বাঙ্গলাদেশেই মালাবারির আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

মালাবারি কর্ত্তৃক গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত অধ্যাপক মোক্ষমুলরের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ সাদরে গৃহীত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে আপন ব্যয়েই এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি ও তামিল অনুবাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কোন কোন অনুবাদ অনেক দূর পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই কার্য্য যেরূপ বহুকষ্টসাধ্য সেইরূপ বহুব্যয়সাধ্য। মালাবারি যে, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট নিঃস্বার্থপরতা প্রকাশ পাইয়াছে। মালাবারি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত লোক ও ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে বিশেষ পরিজ্ঞাত। এই সংবাদপত্রখানি অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। ইংলিসম্যান, ২৯এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

মালাবারি ভারতবর্ষীয় ভাষায় হিবার্ট বক্তৃতাসকল অনুবাদ করার যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এই কার্য্যটীতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এইরূপ কার্য্যে পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বেও অনেক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যটী অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া তাঁহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। ডিনষ্ট্যানলি, ডাক্তর মার্টিনো, ডাক্তর কার্পেণ্টর প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রবর্ত্তনায় মোক্ষমূলর যে বক্তৃতা দ্বারা হিবার্টফণ্ডের সূচনা করেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা ইউরোপে কিরূপ সাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিছু দিন পরেই এই বক্তৃতা গুলি সংশোধিত হইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচ্য বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার আদর্শ স্বরূপ সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। এই হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অতি অল্প দিন পরেই ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু মালাবারির পূর্ব্বে আর কোন ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় উহা অনুবাদ করিতে প্রয়াস পান নাই। মালাবারি স্বভাবতঃ প্রতিভাশালী ও সুশিক্ষিত বলিয়া

বিখ্যাত। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য চিন্তা ও জ্ঞানের ফলসমূহ ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার সম্পূর্ণ উৎসাহ আছে। মোক্ষমূলরের ন্যায় ব্যক্তির বক্তৃতা ভারতবর্ষীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে ভারতবর্ষে সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে সবিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা দেশীয় ভাষা সমূহ পরিপুষ্ট হইবে এবং প্রাচীন জ্ঞানিগণ মানসিক উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে উদ্দীপিত হইবে। দেশীয় ভাষার সম্বন্ধে এরূপ আশাপ্রদ কার্য্যেব সূচনা আর আমবা কখনও দেখিতে পাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বসাধারণকে ও যাঁহাবা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে মালাবাবির সাহায্য করিতে অনুরোধ কবি। মোক্ষমূলবের অনুমতি লইয়াই মালাবারি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থের অনুবাদ সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ স্যার উইলিয়ম মুইর এইরূপ কয়েক খানি গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে যেরূপ সাহায্য কবিয়াছিলেন, উপস্থিত বিষয়েও সেইরূপ সাহায্য করা উচিত।—ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্, ৩০এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলরেব হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করার যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকারক হইবে। ইহাতে দেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইবে এবং জাতীয় ধর্ম্মের যথাযথ ব্যাখ্যা ইদানীন্তন শিক্ষা-জ্যোতি-বিহীন লোকদিগের আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্যটী অতি মহৎ ও কষ্টপ্রদ। নানাপ্রকাব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াও এই পারসিক কবি, পণ্ডিত ও পত্রিকা-সম্পাদক যে, এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহা তাঁহাব পক্ষে সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়।

মালাবারি এই বক্তৃতাসমূহ গুজরাটী ভাষায় নিজেই অনুবাদ করিয়াছেন। সঙ্কল্পিত ব্রতসাধনে তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব-শক্তি তাঁহাকে দেশ বিদেশে বিখ্যাত করিয়াছে। তিনি যে এক্ষণে সেই বিদ্যা ও কবিত্ব অতি মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।

এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আমরা আশা করি যে, সর্ব্বসাধারণ ও ভারত বর্ষীয় শাসনকর্ত্তারা এই শ্রমজনক কার্য্য যে, কত মূল্যবান তাহা বুঝিবেন।

এস্থলে মালাবারি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা উপযুক্ত মনে করি। যেরূপ দক্ষতার সহিত ও স্বাধীন ভাবে এই পত্রিকা খানি চালান হয়, ইহার লেখা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তাহাতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশীয় পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।—ষ্টেটস্‌ম্যান, ৩০এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

বোম্বাই নগরস্থ প্রসিদ্ধ কবি ও পত্রিকা-সম্পাদক মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলারের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা জানাইবার আশায় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। মালাবারি অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেও মনস্থ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের রাজধানীতে আমরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইব। প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকের ও সমাজ-নেতার যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, মালাবারির তাহা সকলই আছে। তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যটী অতি গুরুতর। কিন্তু মালাবারি যেরূপ অধ্যবসায়-শালী তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সদ্মান্তঃকরণে তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন।—লাহোর ট্রিবিউন, ১লা এপ্রেল, ১৮৮২।

মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচর করার জন্য দুই সপ্তাহ হইল তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। তথাকার প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র সমূহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মালাবারি তাঁহার সঙ্কল্পিত বিষয়ে সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইবেন। এই কবি ও সংবাদপত্র-সম্পাদকের জন্যই আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের সম্পাদকের সহিত পিয়োস-

ফিষ্টের মতভেদ আছে। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের কোন প্রকার ঈর্ষা নাই। সমুদয় প্রশংসনীয় কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।— থিওসফিষ্ট, এপ্রেল, ১৮৮২।

একটী জাতীয় কার্য্য।—যদিও মালাবারির সঙ্কল্পিত বিষয়টী বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা ভবিষ্যবংশীয় দিগের বিশেষরূপ আদৃত হইবে, তথাপি আমাদের আশা ছিল, আমাদের সময়ের যে সকল উন্নতিশীল ব্যক্তি সাহিত্যের উন্নতিসাধন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই কার্য্যে মালাবারিকে বিশেষ-রূপে সাহায্য করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা বোম্বাই হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা বড় ভাল নয়। মালাবারি প্রায় ছয় মাস হইল, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া যান। কিন্তু সে সময় বড় ভাল ছিল না। প্রধান রাজ-পুরুষগণ ও অন্যান্য বড়লোকদিগের প্রধান দশজন কলিকাতা হইতে প্রস্থান করার গোলমালে ছিলেন। স্যার আস্‌লি ইডেন সাহেবের হঠাৎ কর্ম্মত্যাগেও মালাবারির সাহায্য-প্রাপ্তির পক্ষে অনেকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। কারণ তখন ইডেন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য ও ইডেন সাহেবকে বিদায় দিবার সময়ে যে সব আমোদ প্রমোদ করা হয়, তাহার নিমিত্ত অনেক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মোক্ষমূলরের উৎসাহী ব্যাখ্যাকারক বঙ্গদেশ হইতে ৭০০০৲ টাকা মাত্র চাহিয়াছিলেন। এই টাকা এ প্রদেশের অনেক ধনী লোক একাই দিতে পারেন। কিন্তু তিনি কেবল দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা পাইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার কষ্টসাধ্য যাতায়াতের খরচটা কোনরূপে পোষাইয়া গিয়াছে। তিনি তৎপরে বাঁকিপুর, বারাণসী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাত্রা করেন। জয়পুরে তাঁহার সঙ্কল্প ব্যাখ্যা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন; এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাইএ ফিরিয়া আসিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। মালাবারি লিখিয়াছেন, 'আমি অনেক গুজরাটী রাজাদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি এবং অনেকের নিকট পত্রও লিখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই

আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ই শীঘ্র শীঘ্র স্থির করেন না। বোধ হয়, কিরূপে কোন একটী বিষয় স্থির করিতে হয়, তাহা তাঁহাবা জানেন না। এখন আমাকে হয়ত সাহায্যেব আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ আশার আশায় দিন কাটাইতে হইবে। আমি বিরক্ত হইয়া শেষে উক্ত রাজাদিগের নিকট হইতে সাহায্যের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

আমাদের বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক। কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিজের দেশে ভবিষ্যৎবক্তা হইতে পারেন না। তাহার সঙ্কলিত বিষয় যে, উপযুক্তরূপে আদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। মালাবারির বন্ধুগণ এই প্রদেশে সর্ব্বসাধারণকে এ বিষয়ে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা ও বেহারের রাজগণ ও জমিদারগণ এই বিষয়ে সাহায্য করা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহা এখন বুঝিতে পারিবেন। জয়পুরের রাজাও বিশেষ আনুকূল্য করিতে পারেন। রাজ-পুতনার অন্যান্য রাজারাও বোধ হয় তাঁহার অনুসরণ করিবেন। বরদার যুবক মহারাজা রাজার উপযুক্ত দান করিয়া পশ্চিম ও মধ্যভারতবর্ষের অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগকে একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, এরূপ আমাদের ভরসা আছে। তাহার পর পঞ্জাব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; ইহার মধ্যে দুই প্রদেশের গবর্ণরগণ মালাবারির এই দেশহিতকর কার্য্যেব মূল্য সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। ত্রিবাঙ্কোর, বিজিয়নগ্রাম ও তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের মহারাজারাও এই কার্য্যের গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারেন।

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি এই দেশ-হিতকর কার্য্যে সাহায্য করা উপযুক্ত বোধ করেন না? সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ইচ্ছা আছে, তাহাতে এই বিষয়টী তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। দেশীয় রাজারা মালা-বারির এই কার্য্যে যে, বড় মনোযোগ দেন নাই, তাহার একটী কারণ এই বোধ হয় যে, পলিটিকাল আফিসরগণ তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেন নাই। আমাদের বন্ধু লর্ড রিপণের গবর্ণমেণ্টের নিকট

বিশেষ পরিচিত। আমরা আশা করি যে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পথ পরিষ্কারের জন্য কিছু করিবেন। এই উৎসাহী সংস্কারক নানারূপ বিঘ্ন বিপত্তিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, উন্নতিশীল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। মালাবারি এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, নানা প্রকার কর্ত্তব্যকার্য্যের ভারে তাঁহার স্বাস্থ্য-হানি হইয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের এ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মালাবারির ন্যায় কেহই দেশীয়দিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকতর উপযুক্ত নন।—ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

বোম্বাইর সর্ব্বপ্রধান পারসিক কবি মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতাগুলি সংস্কৃতে এবং ভারতবর্ষীয় চলিত ভাষায় অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। আমরা দেখি যে, পশ্চিম প্রেসিডেন্সির সকল সংবাদপত্রেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছে। সংস্কৃত অনুবাদের ভার অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মসের যুবক সহযোগী গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাবসমূহ ভারতবর্ষীয় প্রচলিত ভাষাতে ব্যক্ত হইতে পারে কি না, এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে সংস্কৃত অনুবাদের জন্য বিশেষ ব্যগ্র বলিয়া বোধ হয়। মালাবারি যে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আহ্লাদ প্রকাশ করি। তিনি সাময়িক চিহ্ন সমূহ যথার্থতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চার উন্নতি আবশ্যক। মোক্ষমূলরের গ্রন্থ দ্বারা উহা যেরূপ সম্পাদিত হইবে, অন্য কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থ দ্বারা সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি মালাবারি কেবল হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, মোক্ষমূলরের ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও চিপস্ ফ্রম এ জরমান ওয়াকসপ গ্রন্থের কিয়দংশ অনুবাদ করিবেন। বঙ্গদেশে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থ সমূহ বিশেষরূপ আদৃত হইবে। যদি তৎসমুদয় অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় কিছুই নাই।—লিবারেল, ২রা এপ্রেল, ১৮৮২।

মালাবারি নিজেই এই বক্তৃতা সমূহ গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত, বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, ও তামিল ভাষায় অনুবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমুলর মালাবারিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহার সঙ্কলিত বিষয়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এই সংকল্পটী অতি প্রশংসনীয় এবং মালাবারি এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এরূপ মত অনেক সংবাদপত্রই প্রকাশ করিয়াছেন। —পাইওনিয়র, ৫ই মে, ১৮৮২।

আমরা শুনিয়াছি, অধ্যাপক মোক্ষমুলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ সংস্কৃতে ও ভারতবর্ষীয় অন্য পাঁচ ভাষাতে অনুবাদ করার জন্য মালাবারি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য্যটী অতি গুরুতর। কিন্তু অনুবাদকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য এবং তৎকর্তৃক উক্ত বক্তৃতার গুজরাটী ভাষায় অনুবাদের বিষয় বিবেচনা করিলে তিনি যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মালাবারি একজন কবি ও প্রতিভাশালী বিদ্বান্ লোক। ইউরোপের ও তাঁহার নিজ দেশের বর্ত্তমান ভাব সমূহ তাঁহার বিশেরূপ জানা আছে।

আকাডেমি (লণ্ডন), ১০ই জুন, ১৮৮২।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মালাবারি বঙ্গদেশ হইতে উৎসাহ পাইয়া মোক্ষমুলরের হিবার্ট বক্তৃতা গুলি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা অনুবাদও মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সংস্কৃত, (কাহারও কাহারও মতে যাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়) হিন্দি ও তামিল অনুবাদ পরে বাহির হইবে। মালাবারির সঙ্কলিত বিষয়টীর বিশেষ আবশ্যকতা এই যে, ইহা দ্বারা তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি জানিতে পারিবেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলর তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা করিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

ভাবুকগণ অন্তঃকরণের সহিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। মালাবারি অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত লোকের সহানুভূতি পাইয়াছেন। বর্ত্তমান বিষয়টীতে কৃতকার্য্য হইলে মালাবারি দেশীয় ভাষাতে ও দেশীয় ভাষা হইতে, অনুবাদ প্রকাশের জন্য একটী সভা স্থাপন করিবেন। কল্পনাটী অতি উচ্চ। কিন্তু যদি দেশীয় রাজা ও জমীদারগণ সাহায্য করেন. (তাঁহাদের এ বিষয়ে সাহায্য করাও উচিত) তবে কি জন্য যে, ইহা সফল হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া অতি সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত মালাবারি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। প্রধান প্রধান দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ গুজরাটী অনুবাদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে বলেন অনুবাদের কোন কোন স্থল অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও অনুবাদটী যে অতি উত্তম হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। উপক্রমণিকার অধ্যায় কয়েকটী অতি উত্তম গুজরাটী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ওজস্বিতায় ও লালিত্যে ইহা তুলনারহিত। কোন সমালোচকের মতে লেখকের ভাষা, গুজরাটী ভাষার যত দূর উৎকর্ষ হইতে পারে, ততদূর হইয়াছে।—টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, জুন. ১৮৮২।

যে কার্য্যটীতে মালাবারি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ ও সকল শ্রেণীর লোকেরই সাহায্যের উপযুক্ত। ভারতবর্ষীয় ভাষায় যে হিবার্ট বক্তৃতাগুলির অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক মোক্ষমূলরের লিখিত। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় এই বক্তৃতায় আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকেই মালাবারির এই কার্য্যটীর অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। কিছু কাল হইল, মালাবারি জয়পুরে গিয়া-

ছিলেন, তথাকার সকলেই তাঁহার সঙ্কল্প বুঝাইয়া দিবার জন্য একটী বক্তৃতা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এরূপ আশা করা যাইতে পারে, জয়পুরের মহারাজ এই কার্য্য সম্পাদনে জন্য মালাবারিকে বিশেষ সাহায্য করিবেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীও সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও এক হাজার টাকা দিয়াছেন। এই অনুবাদে দেশীয় সাহিত্য বিশেষরূপ পুষ্ট হইবে এবং আমাদের দেশীয় লোকগণ ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মত জানিতে পারিবেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে মালাবারিকে বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, এজন্য আমরা আশা করি যে, দেশীয় রাজগণ তাঁহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিবেন।—নেটিব্ অপিনিয়ন জুন, ১৮৮২।

মালাবারি, ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় জয়পুরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট যে বক্তৃতা করেন, তাহার যথাযথ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। মালাবারি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন অনেকেই তাঁহার আলাপ করার ক্ষমতায় মোহিত হইয়াছেন। ইঁহারা বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও বিশেষ প্রবল। যে সমস্ত ভাষায় তিনি জয়পুরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তাহার নিকট বিদেশীয় ভাষা। তাঁহাকে এরূপ লোকদিগের নিকটে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল, যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতার উপর কোন না কোনরূপ সমালোচনা না করিয়াই থাকিতে পারিতেন না। অন্য একটী কারণেও গত শুক্রবারের বক্তৃতাটী সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইডেন্ সাহেবকে বিদায় দেওয়ার গোলমালে তাঁহার সঙ্কল্পিত বিষয় যে, বঙ্গদেশে আদৃত হয় নাই, তাহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি সংপ্রতি আরও উচ্চ বিষয়ের সঙ্কল্প করিয়াছেন। অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য এই সকল লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদিও এখন তিনি তাঁহার কার্য্যস্থান বোম্বাইতে গিয়াছেন, তথাপি তিনি যে পুনরায় দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত সাহায্য সংগ্রহপূর্ব্বক দিগ্‌বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বস্থানে প্রত্যাগত হইবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা সেই দিনের জন্য প্রার্থনা করি।

ইণ্ডিয়ান মিরর, ১১ই মে, ১৮৮২।

৫২।২, পার্ক ষ্ট্রীট্ কলিকাতা, ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

আপনি মোক্ষমূলরের বক্তৃতা সমূহ অনুবাদের বিষয় আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আমি বিবেচনা করি যে, ভারতবর্ষীয় ভাষাতে এই সকল বক্তৃতার অনুবাদ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইবে।

আমি আশা করি, যে সকল ব্যক্তিগণ শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন এবং এই সকল বক্তৃতা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এই কার্য্যে আপনাকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত করিবেন।

আপনার গুজরাটী অনুবাদ হইতে ভবিষ্যতে অন্যান্য অনুবাদও করা যাইতে পারিবে। এইরূপে উহা নিঃসন্দেহ সকলের পক্ষেই সাহায্যকর হইবে।

আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র আগ্রহের সহিত এই বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি একাই এক শ। আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষের এই অংশে আপনাকে সাহায্য করিতে তাঁহার মত উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

যদি এই পত্র প্রকাশ করিলে আপনার কোনরূপ উপকার হইতে পারে, এরূপ বিবেচনা করেন, তবে ইহা প্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে যে, আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে, এই পত্র তাহার সাক্ষী।

আপনার

জে. জিব্‌স্।

কমল কুটীর, অপর সর্কুলার রোড্, ২৯ এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম নই, নচেৎ আপনার পত্রের উত্তর শীঘ্রই দিতাম। আপনার অভীষ্ট কার্য্যের আবশ্যকতা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি কৃতকার্য হউন, এই আমার ইচ্ছা। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। প্রাচ্য সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবসমূহ এক শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতাগুলি ও অন্যান্য গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় ভাষায় বিশেষতঃ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া আপনি দেশের বিশেষ উপকার করিবেন, এবং দেশের সকল লোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। এই কার্য্যে আপনাকে বহু ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে

আশা করি, সর্ব্বসাধারণে এবিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য করিবেন। আমার ভরসা আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজারা ইহাতে মনোযোগ দিবেন ও যথোচিত সাহায্য করিবেন। সঙ্কলিত বিষয়টী নিশ্চয়ই বহু সাহায্যের অপেক্ষা করে। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজ অন্তঃকরণের সহিত ইহাতে সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না। যদি বিবেচনা করেন যে, আমার পত্র আমার বন্ধুদিগের, দেশীয় রাজা সমূহের ও প্রেসিডেন্সি নগর সকলের সর্ব্ব সাধারণের মন এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনার গ্রন্থে, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, এই পত্রের সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন।

আপনার
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

৮ নং মাণিকতলা, ১১ই এপ্রেল, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছে। তৎসমুদয় দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে আমাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে। আপনার সঙ্কলিত বিষয়টী অতি প্রশংসনীয় ও সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহের যোগ্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি। অর্থসম্বন্ধে ও অনুবাদ-কার্য্যে আপনাকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু আপনার অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে আপনি সেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবেন। আপনি কৃতকার্য্য হউন, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

আপনার
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ইউনাইটেড্ সার্ব্বিস ক্লব, কলিকাতা, ২২এ মার্চ্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

যদি আমার পরিচিত কোন ভদ্রলোকের সহিত আপনি দেখা করিতে চান, তাহা হইলে আমি আহ্লাদসহকারে আপনাকে আপনার পরিচয়-জ্ঞাপক পত্র দিব। যাহা হউক, আপনার নিজের প্রতিপত্তিই আপনাকে সকল স্থানে পরিচিত করিবে। আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। আমার লেখায় তদপেক্ষা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আপনার
ডব্লিউ, ডব্লিউ, হণ্টর।